রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ
ও
রম্যাঁ রলাঁ

শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণভারত

প্রকাশক ঃ
শ্রীটি. এন. বেঙ্কটরামণ
প্রেসিডেন্ট, বোর্ড অফ ট্রাস্টীস্
শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই

প্রকাশ ঃ ২১শে এপ্রিল, ১৯৬২

মুদ্রক ঃ
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশান

গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

পরমাত্ম নিকেতন
গ্রাম—ফুলচক
পোঃ—নোতুক, মেদিনীপুর

পূর্ণিমা সরকার
ফ্ল্যাট কিউ-৩ বিদ্যাসাগর নিকেতন
সল্ট লেক, কলিকাতা-৬৪

উৎসর্গ

"দিন হয়ে গেল, গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয়দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

আমার
জীবনের
দুঃখসুখের সঙ্গিনীকে।

সূচিপত্র

এক

রম্যাঁ রলাঁর ভারত-ভাবনা একালে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁর ভারত-ভাবনার পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ববন্ধনে, গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীরচনার প্রেরণায়, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের সমর্থনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে এবং আধুনিক ভারতের বড়ো-ছোটো বহু রাজনৈতিক নেতার, অগণিত ভারতীয় প্রবীণ ও নবীন বুদ্ধিজীবীর সাহচর্যে নিরন্তর সাগ্রহ আলাপচারিতে, অসংখ্য চিঠিপত্রে।

জীবনের অন্তিম পর্বে রম্যাঁ রলাঁ তাঁর আত্মজীবনীতে একটি মর্মস্পর্শী অধ্যায় যোগ করে গিয়েছেন। তাতে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনের কর্ম ও প্রেরণার সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে স্বদেশের সংকীর্ণ সীমান্ত অতিক্রম করলেও পাশ্চাত্য বা ইউরোপের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর *জাঁ-ক্রিসতফ* উপন্যাসে ক্রিসতফের বন্ধু অলিভিয়ে ১৯০৯ সালে বলেছিল:

> পশ্চিম জ্বলছে......দ্রুত..........অতি দ্রুত দেখতে পাচ্ছি অন্য আলো জ্বলে উঠছে প্রাচ্যের গভীর থেকে।

কিন্তু পশ্চিমের শক্তিতে, অহংকারে স্ফীত ক্রিসতফ প্রতিবাদ করে উঠেছিল:

> রাখো তোমার প্রাচ্যের কথা। *পশ্চিম তার শেষ কথা বলেনি*, তুমি কি ভাবো, আমি হাল ছেড়ে দেবো?. অনেক শতাব্দী ধরে বলার কথা আছে তার।[১]

রম্যাঁ রলাঁ লিখেছেন, তাঁর *ব্যুইসনার্‌দাঁ*-য় ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রিসতফের কথোপকথনে তরুণ কালিদাস নাগ "ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের" কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর এই আত্মীয়তা কেমন করে গড়ে উঠেছিল তা রলাঁ বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর এই গ্রন্থে কি অন্য কোনো গ্রন্থে তিনি ভারতের কথা ভাবেননি।[২] এই আত্মীয়তা প্রত্যক্ষভাবে কোনো অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে আসেনি। একোল্ নর্মাল-এ ছাত্রাবস্থায় তিনি বের্‌গেইঞ এবং ব্যুর্নুফ-এর অনুবাদের পাতাগুলোই শুধু উলটে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ছাপ ফেলেছিল বলে মনে করতে পারেন না। অনেক কাল পরে

বজ্রাহত দাঁতঁ (Danton foudroyé, 1898) নাটকের প্রথম খসড়াটির পৃষ্ঠায় "দেবতারা স্বর্গে পরস্পরকে সংহার করেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মার বিরুদ্ধে লড়াই করেন।"—এই পঙ্ক্তিটির সঙ্গে ব্যুর্নুফ অনূদিত *ভাগবতপুরাণ*-এর একটি শ্লোক টুকে রাখা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

> এইসব গ্রন্থ ও চিন্তাকে আমি বিচার করেছিলাম শিল্পীর দৃষ্টিতে। আমাকে প্রবল আবেগে বেঁধে রেখেছিল ইউরোপের প্রতিভারা এবং আমার অন্তরের দৈত্যের নিজস্ব যন্ত্রণা; উদগ্র ছিলাম তাকে জানতে, অবশেষে তাকে বাগ মানাতে। এশিয়ার কথা আমি মোটেই ভাবিনি।[৩]

রলাঁ উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর *দাঁ লা মেজঁ*-তে (১৯০৭) চোখে পড়বে, বইয়ের তাক থেকে অলিভিয়ে "ভারতীয় কবিদের একখানা বই তুলে নিয়ে "দেবতা কৃষ্ণের মহিমান্বিত বাণী" (la apostrophe du dieu Krichna) পড়তে শুরু করতেই ক্রিসতফ তার হাত থেকে বইটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই তা পড়েছিল। অলিভিয়ে পড়েছিল *ভগবদ্গীতা*-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭-৩৮ শ্লোক, ক্রিসতফ তৃতীয় অধ্যায়ের ২২-২৪ শ্লোক।[৪] তাছাড়াও, ১৯০৮ সালে কাজেৎ পাদুকে রলাঁ লিখেছিলেন, "স্থলে জলে বাতাসে জানাতে : এশিয়া, রঁম্যা রলাঁ তোমাকে নমস্কার করে।" তিনি আরও লিখেছিলেন :

> হয়তো একদিন আমি সেখানে যাবো, এ জীবনে নয়তো অন্য জীবনে; আর স্থল জল বাতাস আমাকে প্রত্যভিবাদন জানাবে। (me rendront mon salut)। সেখানে আমি মোটেই অপরিচিত হবো না।[৫]

এমনও বলা হয় যে, *শকুন্তলা* পড়ে মুগ্ধ তরুণ রলাঁ ১৮৮৭ সালে নাট্যকাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন।[৬] তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রম্যাঁ রলাঁর সচেতন গভীর ভারত-এশিয়া-মনস্কতার পর্ব শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে, তাঁর অতি-পরিণত বয়সে, যখন তিনি প্রায় পঞ্চাশে পা দিয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল, রলাঁ আর্থিক দিক দিয়ে নিশ্চিত হয়ে, বিপুল খ্যাতিতে, তৃপ্ত মনে মার্কিন প্রণয়িনীর সান্নিধ্যে সুইট্জারল্যান্ডে অবসর কাটাচ্ছিলেন; আর্ক ডিউকের হত্যাকান্ডের সংবাদে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি।[৭] কিন্তু সেই হত্যাকান্ডকে অজুহাত করেই ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ

শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাচ্য-ভূখন্ডও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। যুদ্ধের তান্ডবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদীদের রণহুঙ্কার। বিস্মিত ব্যথিত রলাঁ দেখতে পেয়েছিলেন, যাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বাস করতেন, মুষ্টিমেয় জনা কয়েক ছাড়া, ইউরোপের প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীই জাতীয়তাবাদের বন্যায় ভেসে গিয়েছেন, যাঁর যাঁর স্বদেশের সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তিনি সবচেয়ে বেদনাবোধ করেছিলেন গির্জা ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের আচরণে। তারাও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের উগ্র সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

প্রথম থেকেই রলাঁ ছিলেন যুদ্ধের সর্বাত্মক বিরোধী। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাতে-গোনা জন কয়েক বুদ্ধিজীবী ছাড়া তাঁর সঙ্গী তখন আর কেউ ছিল না।[৮] তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রায় সকলেই যুদ্ধে সমাবিষ্ট হয়েছিলেন। যুদ্ধরত দেশগুলোর মুক্তমতি মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ তখন আর সম্ভব ছিল না। রলাঁ তখন নিঃসঙ্গ, স্বদেশ থেকে বিছিন্ন। তবু তিনি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর সম্বল ছিল শুধু তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি আর নৈতিক মনোবল। তাই নিয়েই তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম দিকেই জার্মানি ধ্বংস করেছিল বেলজিয়ামকে। ২৯ অগাস্ট খবর এসেছিল লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। সেই দিনেই রলাঁ খোলা চিঠি লিখেছিলেন জার্মানির মানবতাবাদী লেখক গেরহার্ট হাউপ্টমানকে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন :

> আপনারা মালিন-এ কামান দেখেছেন, ব্র্যুবাঁ-তে আগুন ধরিয়েছেন। পবিত্র শহর লুভ্যাঁ তার শিল্প, তার বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য নিয়ে, এখন একটা ছাইয়ের গাদা! কিন্তু আপনারা কী হয়ে গেলেন, কোন নামে আপনাদের ডাকবো বলে মনে করেন.....? *আপনারা গ্যয়টের পুত্র-প্রপৌত্র, নাকি আতিল্লার?*[৯]

কয়েকদিন পরেই কামানের মুখে বিধ্বস্ত হয়েছিল র‍্যাঁসের ক্যাথেড্রাল। বেদনায় ক্ষোভে রলাঁ লিখেছিলেন *প্রো আরিস* জার্মানির বুদ্ধিজীবীদের ধিক্কার দিয়ে। জার্মান লেখক আগেন্স উলফ্ ঘোষণা করেছিলেন : " ল্যুভ্যাঁর ছাই ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"[১০] টমাস মান গর্বভরে লিখেছিলেন : "বর্তমান যুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধে জার্মান কুলতুর-এর যুদ্ধ। সমরবাদ ছাড়া

জার্মান চিন্তার অন্য আর কোনো আদর্শ নেই।"[১১] তারপরেই ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল রলাঁর প্রবন্ধ ও *দেস্যু দা লা মেলে* (হানাহানির ঊর্ধ্বে)।[১২]

প্রবন্ধটি লেখার সময়েই মার্ন-এর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন রলাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শার্ল প্যেগী।[১৩] এই প্রবন্ধে রলাঁ ইউরোপীয় যুযুধান শক্তিগুলোকে অভিযুক্ত করেছিলেন এই বলে যে, তারা যুদ্ধের আবর্তে এশিয়ার দেশগুলোকেও টেনে এনেছে নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে। "সভ্যতার অভিভাবক পশ্চিমের তিনটি বৃহৎ জাতি নিজেদের ধ্বংস করার জন্যে উদ্‌গ্রীব; নিজেদের বাঁচাতে তারা ডাক দিচ্ছে কসাক, তুর্কি, জাপানী, সুদানী, সেনেগালী, মরক্কোবাসী, মিশরী, শিখ, সিপাহী.......মেরুপ্রান্ত ও অক্ষরেখার বর্বরদের, সমস্ত বর্ণের মানুষদের।" এই প্রবন্ধে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, প্রতিটি দেশের দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, কবি-সাহিত্যিকরা যুদ্ধের জন্যে কেমন ভাবে অপর দেশকে অভিযুক্ত করছেন। খ্রিষ্টধর্ম ও সমাজতন্ত্রের ভণ্ডামি ও ক্লীবতা সকল দেশেই প্রকট হয়ে উঠেছে। জার্মান সমাজতন্ত্রী ফরাসী সমাজতন্ত্রীর বুকে সঙিন বেঁধাচ্ছে; ইতালির সমাজতন্ত্রী শ্রমিকরা *লা মার্সেইজ* গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছে, যা স্ববিরোধিতা। অপর দেশের খ্রিষ্টানদের নিধনের জন্যে কার্ডিনাল, বিশপ, পাদরিরা গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করছে; কুড়ি হাজার ফরাসী পাদরি সৈন্যদলের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছে; জেসুইটরা জার্মান সৈন্যদলে যোগ দেবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সর্বত্র উন্মাদনার সংক্রমণ। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে রলাঁ শুভবুদ্ধি মানুষদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যুদ্ধোন্মত্তদের ফেরানো যাবে না। কিন্তু যুদ্ধ একদিন থামবেই, যুদ্ধরত দেশগুলোকে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তখন প্রথম কর্তব্য হবে যুদ্ধরত দেশগুলোকে নিয়ে একটা নৈতিক উচ্চ বিচারালয়, বিবেকের একটি ট্রাইবুনাল গড়ে তোলার চেষ্টা। প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা বর্জন করতে হবে। তার উদ্যোগ থাকবে ইউরোপ-আমেরিকার নিরপেক্ষ দেশগুলোর হাতে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান হেগের ট্রাইবুনালকে সম্পূর্ণ ও বাস্তব করে তুলবে। কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব বর্তাবে প্রতিটি দেশের লেখক, ধর্মীয় নেতা ও চিন্তাশীল মানুষ অর্থাৎ *এলিট*-দের উপরে। যুদ্ধ সত্ত্বেও চিন্তার বিশুদ্ধতার সঙ্গে কোনো আপস তাঁদের পক্ষে অপরাধ। "*জাতিবিদ্বেষের শিশুসুলভ অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব অথচ ভয়ংকর রাজনীতির পক্ষ সমর্থন*

করাটা লজ্জার ব্যাপার। মানুষ এবং মানবতা সমগ্র মানবাত্মার ঐকতান।"
রলাঁ শেষ করেছিলেন এই কথা বলে :

> আমি জানি যে আমার ভাবনা আজ শোনার সম্ভাবনা কম। যুদ্ধের জ্বর যে তরুণ ইউরোপকে পুড়িয়ে মারছে, তরুণ নেকড়ের মতো সে হাসবে। কিন্তু জ্বরের এই ঘোর যখন কমে যাবে, সে দেখবে সে নিহত এবং তার নরমাংসলোলুপ বীরত্বের জন্যে, সম্ভবত কম গর্বিত।
> তাছাড়া, কাউকে বোঝাবার জন্যে আমি বলছি না। আমি বলছি আমার বিবেককে সান্ত্বনা দেবার জন্যে.......এবং আমি জানি একই সঙ্গে আমি সান্ত্বনা দেবো সব দেশের অন্য আরও হাজার হাজার মানুষকে যারা বলতে পারছে না, কিংবা বলতে সাহস করছে না।[১৪]

এই প্রবন্ধে রলাঁ ইউরোপীয় যুদ্ধে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোকে জড়িত করার জন্যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবিরোধিতা বা যুদ্ধোত্তর পর্বে পুনর্নির্মাণের কাজে এশিয়াকে আহ্বান জানাননি। তাঁর মনের দিগন্ত তখনো ইউরোপকে অতিক্রম করে এশিয়ায় প্রসারিত হয়নি। তখনো পর্য্যন্ত তাঁর মধ্যে অহংকারী ক্রিসতফ জীবন্ত: "পশ্চিম তার শেষ কথা বলেনি।"

সেই সময় লন্ডন থেকে রলাঁকে একটি প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন আনন্দ কুমারস্বামী। প্রবন্ধটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন *নিউ এজ* পত্রিকায় (২৪ ডিসেম্বর, ১৯১৪)। প্রবন্ধটির নাম : *ভারতের জন্যে এক বিশ্বরাজনীতি*। তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন : একথা ভুল যে, "ভারত মিত্রশক্তির পক্ষে আছে।" নতুন করে ইউরোপ-বিভাগে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ভারতের কোনো সংশ্রব নেই। যেহেতু ভারতের জাতিগত আদর্শ বিপদগ্রস্ত হয়নি, সেই হেতু জার্মানি ও মিত্রশক্তির মতো মানবতার আদর্শ পবিত্যাগের অজুহাত ভারতের নেই। "আমরা যারা বিশ্বাস করি, মানুষকে আরও শিল্পী, আরও প্রেমময় এবং আরো প্রাজ্ঞ করে তোলা ছাড়া সভ্যতার আর কোনো লক্ষ্য নেই, আমাদের চিন্তার স্বাধীনতার আপস করাতে ইউরোপীয় চিন্তাশীলদের অজুহাত আমাদের নেই।" ইউরোপের এই যুদ্ধ তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংকট। এই সংকট খ্রিষ্ট ধর্মের " আনুগত্যহীনতা ও ভন্ডামি" চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। "যুদ্ধের পর ইউরোপ সৃষ্টিধর্মী একটি পর্বে পা দেবে, অথবা, অবশেষে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের সত্যগুলোকে এক

বহির্জীবনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। সেটা হবে উপনিষদ এবং বুদ্ধের পর ভারতের সামাজিক বির্বতনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো কিছু। সে কাজটি আংশিক হতে পারে না; সেখানে এশিয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। সমরবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, শিল্পযোজনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে অবলুপ্ত হবে এবং এশিয়ায় বেঁচে থাকবে,—তা হতে পারে না। তাই জগৎসভায় তার ভূমিকা নিতে হবে। এই মুহূর্তে হৃদয় ও মনের এক *সাংস্কৃতিক সংগ্রাম* (kulturekampf) চলছে, যা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে মানবতার সভ্যতা। এবং তাতে আমাদের ভারতীয়দেরও অংশগ্রহণ করতে হবে।" অবশেষে তিনি লিখেছিলেন :

> ইউরোপের ধর্ম কোন কর্ম সাধন করেছে? শান্তির সময়ে যেমন, যুদ্ধের সময়েই তেমনি, ইউরোপীয় সমাজের বর্তমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকেই অপরাধী করেছে। তার ধর্ম খন্ডকালের ধর্ম (la religion du temps).....খন্ডকালের ধর্মে ঈশ্বর, আমার নিকটতম জন এবং আমি মিলে হই তিন, আর অনন্ত কালের ধর্মে তারা শুধুই এক। এই অনন্ত কালের ধর্ম যা খাঁটি খ্রিষ্ট, লাওৎসে, উপনিষদ্‌এবং ভগবদ্গীতার ধর্ম,—এ ধর্ম ছাড়া শান্তিকে লাভ করতে পারা যায় না। সময় এসেছে যখন ইউরোপ নিজের মধ্যে এই অনন্ত ধর্মকে আবিষ্কার করবে।........আমি জানি না ইউরোপ সম্পূর্ণ একা সেই পথটি খুঁজে নিতে পারবে কি না, যা তাকে ওখানে নিয়ে যাবে; কিন্তু আমি জানি, আমাদের সাহায্য নিতে তার বেশি বিমুখতা নেই, খুব বেশি অহংকারও নেই, এবং আমরা যদি তার সঙ্গে নাও থাকি, তার বিরুদ্ধে যাবো না।.......আমাদের এক বিশ্বরাজনীতি আছে; এবং তাকে অনুসরণ করেই আমাদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করবো; এবং গভীরতম যা কিছু আছে, বিশেষ করে আমাদের দর্শন, আমাদের আবেগ, আমাদের সংগীত—সব কিছুই জগতকে দিতে হবে এই বিশ্বাসে যে, ভারতের যাই ঘটুক না কেন তার মূল্য সামান্য, যদি অবশ্য তার ফলগুলো উর্বর মাটিতে পড়ে।[১৫]

প্রবন্ধটি রলাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ক্রিসতফের ইউরোপীয় অহংবোধের মোহাবরণ অপসারণে

বহুলাংশে সাহায্য করেছিল। এশিয়া ও ভারতের সহযোগিতা ছাড়া ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পুনর্নির্মাণ যে সম্ভবই নয়, এই বোধটি তাঁর মনে দৃঢ়মূল হতে শুরু করেছিল। এই প্রবন্ধটির সূত্রে চিঠিপত্রের মাধ্যমে রলাঁর সঙ্গে আনন্দ কুমার-স্বামীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কুমারস্বামী তাঁকে পাঠিয়েছিলেন একখানি *ভগবদ্গীতা* এবং তাঁর লেখা *দ্য আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস অব্ ইন্ডিয়া এ্যান্ড সিলোন।*

রলাঁ বলেছেন, এই পর্বে ভারত তাঁর "জীবনের নবীকরণ" (renouveler) ঘটিয়েছে এবং আনন্দ কুমারস্বামীর গ্রন্থের মাধ্যমেই তার প্রথম "ইলেকট্রিক শক" অনুভব করেছিলেন।[১৬] তাঁর চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল মানবসংস্কৃতির এক নতুন ভূগোল। আবেগে উত্তেজনায় তিনি দিনপঞ্জীতে লিখেছেন:

> .....পৃষ্ঠাগুলো ওলটাতে ওলটাতে এক পরমানন্দ অনুভব করলাম। এই জগৎ এতো ঐশ্বর্যশালী, এতো সমৃদ্ধ! আমার বুকটা ফেটে পড়ে। একে ধারণ করার পক্ষে বুকটা এতো ছোটো!—যদি জীবনের দশ কি কুড়িটি বছর আমাকে দান করা হয়, তাহলে আমার জাতের চিন্তাকে আমি নিয়ে যেতে চাইবো পৃথিবীর সেই উচ্চ মালভূমিতে, যার চোখের দেখাও সে পায়নি।[১৭]

তারপর আরও দুবছর কেটে গিয়েছিল। মহাযুদ্ধের হত্যাকান্ড চলেছিল অব্যাহত ভাবে। রলাঁ আত্মনিয়োগ করেছিলেন জেনিভায় রেড ক্রসের যুদ্ধবন্দীদের আন্তর্জাতিক বিভাগের কাজে। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার। পুরস্কারের সমস্ত অর্থ দান করেছিলেন রেড ক্রসে ও বিভিন্ন কর্মে। এবং যুদ্ধবিরোধিতার জন্যে তিনি হয়েছিলেন স্বদেশে ও বিদেশে নিন্দিত, ধিক্কৃত, স্বদেশদ্রোহীরূপে চিহ্নিত। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্যে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল; বৃহৎ সংবাদপত্রগুলো তাঁর লেখা ছাপতে অস্বীকার করেছিল। নিঃসঙ্গ, স্বেচ্ছানির্বাসিত রলাঁ দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইউরোপের ধ্বংস, তার আত্মিক বিনষ্টি। তাঁর অবলম্বন ছিল মাত্র একটি দু'টি সুইস পত্রিকা। এমন সময় তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর। ১৯১৬ সালের ১৮জুন টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে

রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল নিউইয়র্কের *দা আউটলুক* পত্রিকায় ৯ অগাস্ট। সেটি পাঠ করে রলাঁ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন পশ্চিমী সভ্যতাকে। এবং রলাঁ তাঁর নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন সুদূর সমুদ্রপার থেকে ভেসে-আসা ভারতের এক ঋষির কণ্ঠস্বরে। তিনি লিখেছিলেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত প্রবন্ধটি ও *প্যপল্ আসাসিনে* (নিহত জনগণের উদ্দেশে), প্রবন্ধ শেষ করেছিলেন এই ক'টি কথায়:

> চিন্তার রানি, মানবতার পথ প্রদর্শিকা ইউরোপ, তোমাকে বিদায়! পথ হারিয়েছো তুমি, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছো কবরখানার দিকে। তোমার স্থান সেখানেই। তুমি শুয়ে থাকো—আর অন্যরা চালিয়ে নিয়ে যাক জগতকে।[১৮]

রলাঁ তাঁর এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং *জাপানের জনগণের উদ্দেশে ভারতের বাণী* শিরোনামে বক্তৃতাটি একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধটির সঙ্গে। রলাঁর ভাষায় : "এই প্রথম আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম এশিয়ার আলোকবাহী (porteur de la lumière d' Asie) রবীন্দ্রনাথের দিকে। এবং রবীন্দ্রনাথ ও এশিয়াও সে হাত ধরলেন।"[১৯] ভারতপন্থার অনুসন্ধানে এখানে থেকেই প্রকৃতপক্ষে রম্যাঁ রলাঁর যাত্রা শুরু। এবং যাত্রাপথে তিনি বিশ্বস্ত সঙ্গী, নির্ভুল পথপ্রদর্শক পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা দুজনেই একই পথের পথিক। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ করে রলাঁ পরবর্তী কালে লিখেছিলেন:

> ....তারপর থেকে আমার নৈতিক বিশ্ব (Univers moral) আলোকিত হয়ে উঠল। *প্রাচ্যে আত্মঘোষণা করলেন সূর্যদেব নতুন করে। ভারতের সত্যদ্রষ্টার (mage) বাণীতে এরই মধ্যে কী দীপ্তোজ্জ্বল ঊষা*; আমি শুধু তাঁর "নরখাদক প্রতিমার" (l'idole "cannibale") : ইউরোপের মিথ্যা রাজনৈতিক সভ্যতার পতনের ভবিষ্যদ্বাণীটুকুই উদ্ধৃত করেছিলাম! ভবিতব্য এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু নৃত্যপর শিবের পরমসুন্দর পদক্ষেপে যে ধ্বংস নেমে এসেছিল : *সেটা ছিল পুনরুজ্জীবন*................ রবীন্দ্রনাথের ঐকতানিক ভাষণ ধ্বংস-হওয়া

ইউরোপের উপরে প্রতিহিংসা বা তার প্রাধান্য বিস্তারের কীর্তন করেনি, কীর্তন করেছে (টোকিওর সেই একই বক্তৃতাতে) এশিয়াকে দিয়ে ইউরোপের এবং ইউরোপকে দিয়ে এশিয়াব পুনঃসৃষ্টির, মানুষের মহিমার জন্যে তাদের মিলনের সৌন্দর্যের। *আমিও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলাম, ফ্রান্স থেকে আমার পথ ধরে।*[২০]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রলাঁ সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতের প্রজ্ঞার বাণীরূপের, সত্যসুন্দর মঙ্গলের ধ্যানদৃষ্টির। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই দিনটি থেকেই। তাঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়েছে, একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে; দুজনে দুজনকে গভীরভাবে চিনেছেন, বুঝেছেন। তাঁদের আত্মিক নৈকট্য আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই রলাঁ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই জীবন্ত ভারতকে যার সঙ্গে তিনি নিকট আত্মীয়তা বোধ করেছেন। কেবল রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ কাহিনীই এক স্বতন্ত্র মহৎ কাহিনী।

ভারতের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাবোধের রহস্য ব্যাখা করতে গিয়ে রলাঁ বলেছেন, তাঁর এই উপলব্ধি হঠাৎ কোনো সাক্ষাৎকারের ফলে হয়নি, এ তাঁর আবাল্য চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক বিবর্তন। সচেতন ভাবে স্বতন্ত্র ভারতের কথা তিনি কোনোদিন ভাবেননি। বৌদ্ধধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করেনি। কারণ, সে ধর্ম যুক্তিবাদী প্রোটেস্টান্ট খ্রিষ্টধর্মের খুবই কাছাকাছি। তাতে তাঁর হৃদয় পুষ্ট হবার নয়। তার নির্বাণ লাভ ঘটে প্রেম-বিশ্বপ্রীতির (amour-charité) চেয়ে বেশি ভাবাবিষ্ট বুদ্ধিবাদে (intellectualisme extatique)। সে ধর্মের শুরুই তো এক নৈরাশ্যবাদ, জীবনের বেদনার মধ্যে এক প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস (credo), যা তাঁর *গলিক* মনের কাছে রুচিকর নয়। অনেকে তাঁকে নৈরাশ্যবাদী বলে অভিযোগ করেছেন, তার কারণ, নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি জগতের তিক্ত বেদনাকে দেখতে জানেন, এবং তাঁর মনকে তা পুষ্ট করেছে। কিন্তু তিনি দেখতে পান আনন্দকেও,—*"সৃষ্টিক্ষম বাসনার বিপুল আনন্দ, যা অভিক্ষেপ করে অস্তিত্বকে,—ঠিক যেমন এক অগ্নিপ্রবাহ, তারপর নিজেকে উৎসারিত-করা সূর্যের* হিরণ্ময় পাত্র (la coupe d'or du soleil),—*একেবারে তৃণগুল্মের অঙ্কুরশয্যা পর্যন্ত যা তার বীজের বিস্ফোরণ ঘটায়।........সেই আনন্দ, সেই*

বিশ্বজাগতিক আনন্দ, জীবনের সূর্য, যার আলোর ঝলক নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে সত্তার প্রতিটি বিন্দুতে।" অন্ধকারকে তিনি অস্বীকার করেননি। "এই যদি ভবিতব্য হয়, তাহলে গর্বিত ভাবে, বিনীতভাবে সৎ মানুষের মতোই বহন করতে হবে.......বেদনা ও আনন্দকে। কিন্তু একটাকে বাদ দিয়ে অপরটি নয়। কারণ তারা দুয়ে মিলেই ছন্দ, পূর্ণতা, সুষমা।" আনন্দ-বেদনার এই মহৎ সত্যকে রলাঁ ইউরোপেই সন্ধান করেছিলেন, এটাই ছিল তাঁর "আহার্য" (aliment)। তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন ছন্দকে। এবং ছন্দের মহানিয়মেই এমন হলো যে, পশ্চিমে তাঁর ক্ষুধানিবৃত্তির "আহার্য" যখন আর মিলছে না, তখনই খুলে গিয়েছিল প্রাচ্যের ভান্ডার। আর তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে নিজে নিজেই তিনি আবার সেই স্বপ্নে, নিজের ভাবনাতেই ফিরে এসেছেন, "যেন রাজপুত্র ফিরে এসেছে আবার-জয়-করা তার প্রাসাদেই।" রলাঁ লিখেছিলেন :

> ইউরোপের বাইরে আমি খুঁজতে যাইনি, ইউরোপের এতো অশান্ত, অপ্রকৃতিস্থ মন যেমনটি খুঁজছে আলাদীনের প্রদীপ কিংবা সলোমনের আংটি, কোনো এক যাদুকাঠি, যা মাদাম ব্লাভাট্স্কি কিংবা মঁসিয় শুরের (Schuré) মতো শিশুসুলভ দীক্ষিতদের সামনে খুলে দিয়েছে সৃষ্টিকারী সত্তার সোপান আর জগতের রহস্য! কোনো উদঘাটিত রহস্য নয়। নতুন কোনো প্রত্যাদেশ নয়। আমার নিজের মধ্যেই ছিল না এমন কিছুই আমি ভারত ও এশিয়ায় খুঁজিনি।.......নিভের্ন-এর বার্চগাছের পাতার মর্মরে আমি যে গান অস্ফুট ধ্বনিত হতে শুনেছি, আমার কাছে তা ফিরে এসেছিল পুবের বাতাসে বাহিত হয়ে, "আন্দোলিত সহস্রবাহু অরণ্যের ঐকতানের মধ্যে, যাকে পরিচালিত করেন নৃত্যগুরু নটরাজ।"[২১]

জীবনসায়াহ্নে অরবিন্দ ঘোষের *আর্য* পত্রিকায় *ঈশোপনিষদ্*-এর ব্যাখ্যা আবার পড়ে রলাঁর মনে হয়েছিল, কুড়ি বছর বয়সে তাঁর *ক্রেদো কিয়া ভেরুম*-এ তিনি যে ভাবনাকে আধো আধো ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় নামে, আরও পরিপক্ক, আরও সম্পূর্ণ সেই একই ভাবনা, একই সারবস্তু। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাঁর বাগানের যে কাঁচা ফল টিপে দেখতেন, রসাল টুকটুকে সেই ফলই তিনি যেন কুড়িয়ে

নিয়েছিলেন, রলাঁ সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন:

> ......এটা তাই *চিন্তার নতুন মহাদেশ আবিষ্কার নয়, আমার, আমাদের, প্রাচীন মহাদেশেরই বৃহতীকরণ*, ইউরোপ শুধু তার অঙ্গ, এ হচ্ছে সমগ্র দেহের বিকাশন, বহু শতাব্দীর অহংকারী বিস্মৃতি ও অ-জ্ঞানের ফলে যে দেহ নির্বোধের মতো ছিন্নাঙ্গ,—হেলেনিক অলিম্পাসের দেবতাদের চেয়ে এ দেহ আরও সুন্দর,—এ দেহ সুসমন্বিত "ইউরেশিয়া"।[২২]

ইউরেশিয়া—ইউরোপ ও এশিয়ার মেলবন্ধনই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিত্রাণের পথ আর রবীন্দ্রনাথ হবেন তার অবিসংবাদিত ঘটক, রলাঁর মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে থেকেই। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে তরুণ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন: " একেবারে বিশেষভাবে কয়েক বছর যাবৎ আমি অনুভব করছি, ইউরোপের ভাবনার সঙ্গে এশিয়ার ভাবনার মিলন ঘটানোর জরুরি প্রয়োজনটি। নিজের জন্যে কেউ আর একা একা যথেষ্ট নয়, এরা চিন্তার দুটি গোলার্ধ। এদের এক হতে হবে। এই হোক আগতপ্রায় যুগের মহৎ উদ্দেশ্য। যদি তরুণ হতাম, আমি নিজেই এতে নিজেকে উৎসর্গ করতাম। ভবিষ্যতের যে সভ্যতা মানবহৃদয়ের দুই অর্ধের মিলনকে বাস্তব করে তুলবে, আগে থেকেই তার সম্পূর্ণতার আশ্বাসে আমি তৃপ্ত। আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করি, কারণ, অনুভব করি, তাঁর মধ্যেই এখনই এই ঐকতান ঝঙ্কৃত হচ্ছে।"[২৩]

রম্যাঁ রলাঁ ইউরোপ-এশিয়ার চিন্তার মিলনের কার্যকর পন্থা অনুসন্ধান করছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি জানতেন না সেই পন্থার কথা, যা রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের শুরুতেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতেই তাঁর মনে জেগেছিল শান্তিনিকেতনে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র স্থাপনের ভাবনা। প্রথমে তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছিল বৃহত্তর এশিয়া, যেখানে ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনে জাপানে হাজার হাজার বছর ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প। তাঁর চোখে ভেসেছিল প্রাচীন বিশ্বসংস্কৃতির পুনর্জাগরণ; বিশ্বাস জন্মেছিল, মহাযুদ্ধের পর এশিয়ার উত্থানের মধ্যে দিয়েই জগতের উদ্ধারপর্ব শুরু হবে।[২৪] এই ভাবনার পরিণতিই বিশ্বভারতী—*যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্* এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল

মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই, ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইউরোপ-এশিয়ার চিন্তার সমাবেশ ঘটাবার উদ্দেশ্যে রলাঁর সাংস্কৃতিক প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল পরের বছরের ২৬ অগাস্ট। তাতে তিনি লিখেছিলেন: "......ইউরোপ নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নিজে আর যথেষ্ট নয়। তার চিন্তার প্রয়োজন আছে এশিয়ার চিন্তার, ঠিক যেমন এশিয়া লাভবান হয়েছে ইউরোপের চিন্তাকে আশ্রয় করে। এরা মানবতার মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধ। যদি একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, দেহের অপকর্ষ ঘটে।"[২৫]

ঠিক দু'বছর পরে, ১৯২১ সালের ১৯ এপ্রিল সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ "তথাকথিত" ভারতপ্রেমিক[২৬] ও স্বদেশপ্রেমিক ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রবল আগ্রহে নিজে নিজে খুঁজে মস্ত বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ির "একেবারে উপরতলায়", "অপ্রশস্ত সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে" রলাঁর বাসায় পৌঁছেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের সেই ঘটনাটি রলাঁ তার জীবনের অন্তিম পর্বেও শ্রদ্ধায়, বিনয়ে স্মরণ করেছেন।[২৭] তার দু'দিন পরের সাক্ষাৎকারে রলাঁ হাতে পেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রতি আনুকূল্যের জন্যে ছাপানো আবেদনপত্র, যার উদ্দেশ্য "এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে (সেমিটিক, আর্য, মঙ্গোল, প্রভৃতি) পুনর্মিলিত করা, তাদের সমন্বয় ঘটানো, তারই সঙ্গে যুক্ত করা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে, যা সে সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞানে, দর্শনে ও শিল্পে।" শেষ সাক্ষাৎকারে রলাঁ রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি শুনেছিলেন: তাঁর দেশে নিঃসন্দেহে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁকে শিল্পী বলে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও বোঝাপড়ায় বিশ্বাসী "তাঁরা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য, (সম্ভবত কেউই নেই)"। "তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ অতিমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা যা কিছু সহ্য করেছেন তার ফলে, ইউরোপের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতায় স্বেচ্ছায় সম্মত হবার পক্ষে জাতিবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁরা হাত বাড়িয়ে দিতে চান না। তাঁরা ভাবেন, তাঁদের সম্পর্কে ইউরোপের আছে শুধু বোঝার অক্ষমতা এবং অজ্ঞতা।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারেই (১৯ এপ্রিল) রম্যাঁ রলাঁর মনে হয়েছিল, "ইউরোপের চেয়ে এশিয়ায়—সবার উপরে ভারতের—নৈতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) দৃঢ়প্রত্যয়ী। তিনি

বলেছিলেন, ইউরোপ যেন এক দক্ষ কারিগর, একটা সুন্দর সংগীতযন্ত্র বানিয়েছে, কিন্তু সংগীত তার সাধ্যায়ত্ব নয়। সংগীত ভারতের ভাগে।.....ভারতের জনগণই আদর্শ শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করবে। (সে সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়), যাকে পৃথিবী বৃথাই লাভের চেষ্টা করছে। কেননা এটাই জাতির যথার্থ সারবস্তু। হিংসা দিয়ে হিংসাকে তিনি কখনো প্রতিরোধ করবেন না। তাঁর এই অ-প্রতিরোধ (non-résistance) যুগযুগব্যাপী শক্তি, যাতে প্রতিহত হয়ে প্রতিটি বহিরাক্রমণ ভেঙে পড়েছে, গান্ধীর মাধ্যমে যা সদ্য সদ্য সচেতন কর্মের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[২৯] এক বছর আগে গান্ধীর সংক্ষিপ্ত-জীবনকথা জানলেও, পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রযুক্ত সত্যাগ্রহের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই রলাঁর ভারত-ভাবনায় গান্ধীর উজ্জ্বল আবির্ভাব।[৩০] অহিংসা ও অ-প্রতিরোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়-দৃঢ় উক্তিকে রলাঁর কাছে ভারতপন্থার বাণী বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। অনন্তকালের ভারতের বার্তাবহ "কবির্নৃচক্ষুঃ" রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিলেন শাশ্বত নৈতিক ধর্মে বলীয়ান খন্ডকালের কর্মযোগী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী,—একজন ভারতের পূর্ব প্রান্তের, অপরজন পশ্চিম প্রান্তের, দুজনে মিলে পূর্ণাবয়ব ভারত,—যে ভারত হিংসাদীর্ণ পৃথিবীর আশার আলোক-স্তম্ভ।

রম্যাঁ রলাঁর চিন্তাজগতে গান্ধীর প্রবেশের গুরুতর কারণও ছিল। যুদ্ধের মধ্যেই ক্রমশ রলাঁ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে সামাজিক অবস্থার নবীকরণ, আমূল পরিবর্তন। কারণ, যুদ্ধ হয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে, সে নিজের শ্রেণীর স্বার্থে তার নিজের দেশের মানুষকে বলি দেয়। রলাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল লুনাচারস্কি প্রমুখ রুশ বলশেভিকদের, সে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন বামপন্থী সমাজতন্ত্রী আঁরি গ্যীলবো। তাঁর পত্রিকা *দ্যম্যাঁ*-তেই রলাঁ লিখেছিলেন তাঁর প্রবন্ধ ও *প্যপল আসাসিনে*। মার্কিন পত্রপত্রিকা এবং পারী থেকে প্রকাশিত যুদ্ধের আর্থ-রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ম. মরহার্ট এবং শার্ল জিদের অনুপ্রাণিত *সোসিয়েতে দেত্যুদ্ দক্যুমাঁতের্ এ ক্রিতিক স্যুর লা গ্যের*-এর বিশ্লেষণাত্মক পুস্তিকাদি রলাঁ সাগ্রহে পড়তেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন দেশে দেশে

সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে বিপ্লবের প্রকৃতি কী হবে?—তাই নিয়ে ছিল তাঁর উৎকণ্ঠা। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লব তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন, প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিও তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৩১] যুদ্ধোত্তর ইউরোপে জাতীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাতে তিনি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সর্বহারা শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের সংযোগ সাধন করতে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আনুগত্যে ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের বৃহত্তর অংশের ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তাবে তাঁর অসম্মতি ছিল না।[৩২] কিন্তু যতো দিন যেতে লাগল তাঁর পক্ষে বলশেভিক বিপ্লবীদের কর্মপন্থা সমর্থন করাটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। অক্টোবর বিপ্লব দাবি করেছিল বিপ্লবের স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে হিংসার সামগ্রিক প্রয়োগ। রলাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল: লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে উপায়ের প্রশ্নটি। লক্ষ্য খাঁটি হলেও, যে-কোনো উপায়ে সিদ্ধিলাভ করা যে নীতিসঙ্গত নয়, এই সত্যে রলাঁর ধ্রুববিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে সত্যিকার প্রগতির পক্ষে লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায়ের গুরুত্ব বেশি। বিপ্লবের সময়েই নৈতিকতাকে রক্ষা করা বেশি প্রয়োজন। বিপ্লবের যুগে সবই গলিত অবস্থায় থাকে, তাই জাতির মনে হিংসার অনৈতিকতা সহজেই আঁকা হয়ে যায়। রাশিয়ায় বিপ্লবীদের নির্মম দমননীতি, প্রতিপক্ষীয়দের প্রতি নির্যাতন, সর্বোপরি তিক্ত মনে গোর্কির রাশিয়া ত্যাগে রলাঁ অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক মাস পরেই শুরু হয়েছিল বিপ্লবের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব এবং হিংসার প্রশ্নে আঁরি বারব্যুসের সঙ্গে রলাঁর ঐতিহাসিক বিতর্ক।[৩৩]

বারব্যুস তাঁর *ক্লার্তে* পত্রিকায় রলাঁপন্থীদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক নৈতিক আদর্শবাদী অভিযোগ করে এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : সমাজবিপ্লবের মুখপাত্র শ্রমজীবী জনতা। সামাজিক অসাম্য সম্পর্কে তাদের যৌথ চিন্তাভাবনাই তাদের সংঘবদ্ধ করবে এবং হিংসার মাধ্যমে তারা এক "বিপ্লবী সামাজিক জ্যামিতির" (géométrie sociale révolutionnaire) নির্ভুল প্রয়োগ করবে। "*হিংসা অবশ্যই সাময়িক,*

অপরিহার্য এবং নিরপেক্ষ যন্ত্র। তাকে বিচার করতে হবে প্রয়োজনের দিক থেকে; হিংসার ইতিবাচক প্রয়োগ এই কারণে ন্যায়সঙ্গত যে, সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা সামাজিক অপরাধের উপরেই টিকে থাকে। হিংসা হচ্ছে এই সমাজব্যবস্থাকে নিরস্ত্র করার একমাত্র প্রাপ্তিসাধ্য সাধারণবুদ্ধির কৌশল এবং এই হিংসা দিয়েই আরও যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার সূত্রপাত করতে হবে।"[৩৪] কিন্তু রলাঁ এই তত্ত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলেন। রলাঁ-বারব্যুস বিতর্ক ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের বিতর্কে পরিণত হয়েছিল এবং রলাঁ এই বিতর্কেই হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগের বিকল্প হিশেবে সর্বপ্রথম উপস্থিত করেছিলেন গান্ধীর অহিংস অসহযোগকে। ফ্রান্স, তথা ইউরোপ, তখনো পর্যন্ত তার নাম শোনেনি। তাকে তিনি "*অনেক বেশি শক্তিশালী এক বিকল্প অস্ত্র*" (***une autre arme beaucoup plus puissante***) মনে করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, এই অস্ত্র দিয়েই মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করছেন। প্রতিরোধহীনতার অর্থে অ-প্রতিরোধ (Non-Résistance) নীতিকে গ্রহণ করতে রলাঁ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, "এ এক চরম প্রতিরোধ (Suprême Résistance), পাপাসক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তার ইচ্ছা পূরণ করে চলতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি।[৩৫] *এই সংগ্রামে দরকার হয় এমন শক্তি ও আত্মত্যাগের, এমন প্রেরণার, যা সকলের সঙ্গে একসঙ্গে মৃত্যুবরণের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নৈতিক শক্তির উৎস মানুষের,—সকল মানুষের হৃদয়।*

বিতর্ক চলেছিল কয়েক মাস ধরে। প্রতিপক্ষের অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণ মনোভাব, হিংসার প্রতি অত্যধিক বিশ্বাসে নৈরাশ্যপীড়িত, অশান্ত রলাঁ ঠিক এক বছর পরে পারী থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সুইট্জারল্যান্ডে, ভিলন্যভের নির্জন "সাধন ভবনে" (ermitage) ভিলা অলগায়। রলাঁ খুঁজতে শুরু করেছিলেন তাঁর কর্তব্যের পথ। তাঁর আত্মা, যাকে তিনি বলেছেন—"ইউরোপের আত্মা, পৃথিবীর আত্মা"—মানব সমাজের আর একটি সমগ্র যুগের সাংঘাতিক আলোড়নে তখন বিহ্বল। কিন্তু পারী থেকে বিচ্ছেদ তাঁকে বহির্বিশ্বের আরও কাছে এনেছিল। এখানে বসে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারি, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর "ভাবনার দিগন্তে গান্ধীর সুদূর

তারা ফুটে উঠেছিল।"[৩৬] এবং ইউরোপে সেই তারার আলোই তিনি ছড়িয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন।

সুইট্জারল্যান্ডের ভিলন্যভে রলাঁর উপস্থিতিকে ফের্নে-য় ১৭৬০ সালে ভলত্যারের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতভাবেই তুলনা করা চলে।[৩৭] ফের্নে-য় ভলত্যারের অতিথি হয়েছিলেন তদানীন্তন ইউরোপের সমস্ত দেশের সুধীবৃন্দ, তাই ভলত্যারকে বলা হয়েছে, "ইউরোপের সরাইখানার মালিক" (aubergiste de l' Europe)। সুদীর্ঘ কাল ভিলন্যভে রলাঁর অতিথি হয়েছিলেন ভারত তথা এশিয়ার গুণীজ্ঞানী রাজনীতিবিদরা। এমন কোনো ভারতীয় মনীষী, রাজনৈতিক নেতা বা উৎসাহী ছাত্রের দেখা মেলে না, যিনি ইউরোপে গেলে, একবার অন্তত রলাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। সুইট্জারল্যান্ডের ভিলন্যভে যাওয়াটা ভারতীয়দের কাছে তীর্থযাত্রার সমতুল্য হয়ে উঠেছিল।

রম্যাঁ রলাঁ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনকথা প্রথম শুনেছিলেন তরুণ দিলীপকুমার রায়ের মুখে ১৯২০ সালের অগাস্ট মাসে। ১৯১৯ সালের অসহযোগ আন্দোলন নিঃসন্দেহে তাঁকে গান্ধী সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তরুণ বয়সে রলাঁ গান্ধীর মতোই তলস্তয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন; যে বুয়র যুদ্ধে করমচাঁদ গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছিলেন এ্যাম্বুলেন্সবাহিনী গঠন করে, সেই বুয়র যুদ্ধই রলাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর তীব্র সমালোচনা করে *ল্য তঁ ভিঁয়েদ্রা* (সময় আসবে) নাটক লিখতে, যার উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন: "এই নাটক অভিযুক্ত করছে ইউরোপের কোনো দেশের জনগণকে নয়, ইউরোপকেই। আমি তাকে উৎসর্গ করলাম সভ্যতাকে। আর. আর., ফেব্রুয়ারি, ১৯০২।" প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যের নাগরিকের কর্তব্য হিশেবে গান্ধী ইংল্যান্ডের সৈন্যসংগ্রহে (৯,৮৫,০০০) সাহায্য করেছিলেন এবং *কাইজারি হিন্দ* পদক লাভ করেছিলেন; আর রলাঁ যুদ্ধবিরোধিতার জন্যে "স্বদেশদ্রোহী" আখ্যাত হয়েছিলেন। অথচ সেই গান্ধীই ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সত্যাগ্রহের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসে এমন এক দৃষ্টান্ত, বিপ্লবের এক নতুন বিকল্প উপস্থিত করেছিলেন, যাকে রলাঁর মনে হয়েছিল, হয়তো, বিশ্বজনীন আদর্শ রূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা যায়। দিলীপকুমার রায়, কালিদাস নাগ, মাদ্রাজের

প্রকাশক গনেশনের সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি গান্ধী সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহে মনোযোগী হয়েছিলেন। অনেক তথ্য তিনি পেয়েছিলেন পল রিশার, এন্ড্রুজ ও পিয়র্সনের কাছ থেকে। গান্ধীর রচনাবলি, গান্ধীসংক্রান্ত গ্রন্থাদি (বোন মাদলেনের সাহায্যে অনুবাদের মাধ্যমে) খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীর অহিংসা, অ-প্রতিরোধের আদর্শ ইউরোপের সামনে হাজির করবেন। সেই সময়েই *ইয়ং ইন্ডিয়া*-র কিছু প্রবন্ধের এক সংকলনের ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে রলাঁ প্রকাশক গনেশনকে লিখেছিলেন:

> ......এই মহামানবকে যে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেই সমস্ত শ্রদ্ধাটুকু নিয়ে আমি কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি তাঁকে যতোটা বুঝেছি, তিনি যতোটা আদর্শ-বাদী তার চেয়ে কম (আমার মতো) আন্তর্জাতিকতাবাদী। আমি তাঁর মধ্যে পাই অধ্যাত্মবাদী জাতীয়তাবাদের (nationalisme spiritualisé) সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে খাঁটি এক আদর্শ,—আজকের দিনের অদ্বিতীয় আদর্শ, এবং প্রকৃত ইউরোপের অহংবাদী ও জড়বাদী জাতীয়তাবাদগুলোর সামনে একে মডেল হিশেবে দাঁড় করানো উচিত। আমার আশা কোনো একদিন ইউরোপের কোনো সাময়িক পত্রে আমি তা করব......এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে তড়িঘড়ি মতামত দেওয়াটা আমার কর্মপদ্ধতির অতিশয় বিরুদ্ধ......[৩৮]

রলাঁর *মহাত্মা গান্ধী* প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি প্রবন্ধের আকারে ১৯২৩ সালের *য়্যুরোপ* পত্রিকায় ১৫ মার্চ, ১৫ এপ্রিল, ১৫ মে পরপর তিনটি সংখ্যায়; সংশোধিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আরও কয়েক মাস পরে। ক্ষুদ্রাকার এই গ্রন্থে রলাঁ গান্ধীর কর্ম, চিন্তা, আদর্শকে পশ্চিমের সামনে দৃঢ় প্রত্যয়ে তুলে ধরেছিলেন। গ্রন্থটির সাফল্য ঘটেছিল অপরিসীম। তিন বছরে প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চাশটি সংস্করণ, অনুবাদ হয়েছিল অসংখ্য ভাষায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নিষিদ্ধ হলেও, ইউরোপের সকল দেশেই, এমনকি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর, বিশেষত প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে, প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়েই রলাঁ 'মুক্তিদাতা (libérateur) মহাত্মা গান্ধীর নামটি ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। *মহাত্মা গান্ধী* পড়ে

এবং রলাঁর উপদেশে মাডলিন শ্লেডের মতো অভিজাত ইংরেজ ললনা গান্ধীর অতিঘনিষ্ঠ মীরা বেন হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে মহাত্মা গান্ধীকে রলাঁই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। *মহাত্মা গান্ধী* তাঁর "আধুনিক ভারতের তথ্যসমন্বিত প্রথম সমীক্ষা" (Une étude documentée sur l' Inde moderne) বলে রলাঁ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করলেও একথা জানাতে ভোলেননি যে, তিনি "তথাকথিত ভারত বিদ্যাবিদদের শিরঃপীড়ার কারণও" ঘটিয়েছিলেন; তিনি পুকুরে "হাঁসের দঙ্গলে ঢিল" ছুঁড়েছিলেন। বিশেষভাবে কুপিত হয়েছিলেন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি। *লেজাপেল দ্য লরিয়াঁ* শীর্ষক এশিয়াবিরোধী নিরীক্ষায় তিনি লিখেছিলেন:

> *ফিলোসত্রাতোস নগ্ন-সন্ন্যাসীদের ভারতকে যেমন এঁকেছিলেন, গান্ধীর ভারতকে তেমনি করে এঁকে রম্যাঁ রলাঁ ভারতকে মহিমান্বিত করার দাবি করলেও, তার ক্ষতি করেছেন।* রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছে, চীনে, জাপানে পশ্চিমের ক্রুটি ও অপরাধের নিন্দা করে এবং *তার বিপরীত স্বপ্ন-বিলাসী এক প্রাচ্যকে দাঁড় করিয়ে এশিয়া, ইউরোপ এবং তাঁর নিজের আদর্শের প্রতি অবিচার করেন।*[৩৯]

এশিয়া ও ইউরোপের সাংস্কৃতিক মিলনতত্ত্বের ঘোষিত শত্রু ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আঁরি মাসিস। তিনি যে-ফরাসী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তা ছিল ইউরোপে এশিয়ার ভাবধারার অনুপ্রবেশের প্রতি খড়্গহস্ত, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ অতিশয় আক্রমণাত্মক। রলাঁ ছিলেন তাঁর আক্রমণের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ১৯১৫ সালেই আঁরি মাসিস রলাঁর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন *রম্যাঁ রলাঁ কঁতর্ লা ফ্রাঁস*। মাসিসের মতে এশিয়ার ভাবধারার প্রভাব ফরাসী চিন্তা এবং আর্টের পক্ষে ভয়াবহ, আর তা প্রতিহত করা একান্ত জরুরি। ১৯২৭ সালে *দেফাঁস দ্য লক্সিদাঁ* (পশ্চিমের পক্ষ সমর্থন) গ্রন্থে তিনি স্পষ্টাপষ্টি লিখেছিলেন:

> পশ্চিমেই আমাদের খুঁজে নিতে হবে এবং নিন্দা করতে হবে সেইসব অবাস্তব চিন্তাশীল ব্যক্তি দের(ideologists), যাঁরা প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলে দেবার দাবি করেন, আমাদের পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। অন্যদিকে যখন বিচার করি এশিয়ায় তাঁদের মিত্র কারা, আমরা লক্ষ্য করি, প্রাচ্য দেশীয়দের মধ্যেই,

তাঁরা সকলেই গড়ে উঠেছেন পশ্চিমী সংস্কৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, কুমারস্বামী, এমন কি গান্ধী নিজেও, শিক্ষা লাভ করেছেন, ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে; তাঁরা অবিরাম আমাদের কবিদের, আমাদের দার্শনিকদের বচন আওড়ান, এবং তা আমাদের চিন্তাই—(তাঁরা বোঝাতে চান আমাদের চরমতম মূর্খামি)—যা তাঁরা আমাদের ফিরিয়ে দেন। এটা কেমন করে হয় যে, একটা বোঝাপড়ায় আসার অজুহাতে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের অজুহাতে, তাঁদের চিন্তা—পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের মিল অনুযায়ী—তারই সঙ্গে একমত, যা ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক? *এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা আমাদের ফাটলকে কাজে লাগাতে চান এবং সবচেয়ে কম আত্মিক প্রতিরোধের পন্থা খোঁজেন, যাতে নানা খন্ডে বিভাজনশীল পশ্চিমের দেহে ঢুকে পড়তে পারেন।*[৪০]

আঁরি মাসিসের এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধ লিখেছিলেন জি. কে. চেস্টারটন এবং তিনিও ছিলেন এই তত্ত্বের বড়ো প্রবক্তা। ফ্রান্সে রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলোতে, বিশেষ করে *মার্তঁ্যা*-য় শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক এশিয়াবিরোধী প্রচার। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল *লে জাপেল দ্য লরিয়াঁ*, যাতে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন সিলভ্যাঁ লেভি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আঁরি মাসিস ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল লাক্শিয়ঁ ফ্রঁসেইজ-এর উগ্র সমর্থক, পেতঁ্যা সরকারকে সমর্থনের জন্যে মুক্ত ফ্রান্সে যে প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং মাসিসের গুরু শার্ল মোরাস্ যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে নাৎসীদের গ্যাস-চেম্বারে ইহুদি সিলভ্যাঁ লেভির সমগ্র পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

রলাঁ তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন : *মহাত্মা গান্ধী—যিনি বিশ্বজনীন সত্তার সঙ্গে এক হয়েছেন*। তাঁকে তুলনা করেছিলেন অ্যাসিজির সন্ত ফ্রাঁসির সঙ্গে। (তুলনাটি প্রথম জেগেছিল পিয়র্সনের মনে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দর্শনেই।) ভূমিকাতে দ্বিতীয় স্তবকেই তিনি লিখেছিলেন:

এই হচ্ছে একটি মানুষ যিনি ৩০ কোটি মানুষকে বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করেছেন; যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছেন; এবং যিনি

মানুষের রাজনীতিতে দু'হাজার বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাসকে উপস্থিত করেছেন।[৪১]

গান্ধীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও রলাঁ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থটির প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী সেই আলোচনায় রলাঁ—ধর্মীয় বাতাবরণ, সংকীর্ণতা, নেতিবাদ, মানসিক স্বৈরতন্ত্র, উগ্রজাতীয়তাবাদ ইত্যাদি গান্ধীর নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ও অনীহার বিচার করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের মতামত, মনের খবর তিনি ভালো করেই জানতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্লেটো এবং গান্ধীকে সেন্ট পলের সঙ্গে তুলনা করে (এই তুলনায় এন্ড্রুজের সায় ছিল। গান্ধীকে এন্ড্রুজ পুরোপুরি সেন্ট পল মনে করতেন।[৪২]) মন্তব্যে লিখেছিলেন:

> আমার মতে গান্ধী রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বজনীন কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে। গান্ধী বিশ্বজনবাদী তাঁর ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে দিয়ে; গান্ধী প্রার্থনার মন্ডলিতে এবং দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মে কাউকে বাদ দেন না, ঠিক যেমন প্রথম খ্রিষ্টবাণীর প্রচারকরা ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে পার্থক্য করতেন না, কিন্তু উভয়ের উপরেই একই বাধ্যতা আরোপ করতেন। গান্ধী এটাই করতে প্রবল অভিলাষী এবং এখানেই গান্ধীর সংকীর্ণতা; সংকীর্ণতা হৃদয়ের নয়, তাঁর হৃদয় খ্রিষ্টের মতোই বৃহৎ, সংকীর্ণতা তাঁর তপশ্চর্যা ও ত্যাগের মূল নীতিতে (এবং এটা কষ্টকরও)। *গান্ধী মধ্যযুগের বিশ্বজনীন* (universalist)। *তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও, আমরা বুঝি ও সমর্থন করি রবীন্দ্রনাথকে।*[৪৩]

মহাত্মা গান্ধী-তে রলাঁ কেবল অহিংসা-নীতি ও আদর্শই ব্যাখ্যা করেননি, তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে, অহিংসা-নীতিই পৃথিবীর "উদ্ধারের" (Salut) একমাত্র পথ হতে পারে। অহিংসাকে তিনি ভারতের শাশ্বত বাণী বলেই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

> ......তাঁর (গান্ধীর) নীতি *অহিংসা* দু'হাজার বছরেরও বেশি ভারতের মানসে খোদাই হয়ে আছে। মহাবীর, বুদ্ধ এবং বিষ্ণুর উপাসনা একে লক্ষ লক্ষ আত্মার সারবস্তু করে তুলেছিল, গান্ধী এতে কেবল বীরের রক্ত সঞ্চালিত করেছেন। মারাত্মক আচ্ছন্নতায় ডুবে-থাকা অতীতের

বিশাল শক্তিদের তিনি ডাক দিয়েছেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরেই তাঁরা প্রাণ পেয়েছেন। তাঁর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নিজেদের। গান্ধী কথার চেয়েও বেশি; তিনি একটি দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর জাতির সত্তাকে মূর্ত করেছেন। *মহিমান্বিত তিনি, যিনি একটি জাতি, যাঁর মধ্যেই তাঁর জাতি সমাহিত এবং পুনরুত্থিত! কিন্তু এমন পুনরুত্থান কখনো আকস্মিক নয়।* ভারতের এই সারসত্তা তার মন্দির এবং তার অরণ্য থেকে যদি তরঙ্গায়িত হয়ে থাকে, তার কারণ জগতের কাছে সে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই পূর্বনির্দিষ্ট উত্তর, জগৎ যার প্রতীক্ষায় ছিল।[৪৪]

রলাঁ ইউরোপের সামাজিক বিপ্লবের সংগ্রামের সঙ্গে গান্ধীর এই ভাবাদর্শকে যুক্ত করার চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নতুন জগৎ সৃষ্টির জন্যে রুশবিপ্লবের অতিমানবিক প্রচেষ্টা। ভারতের সংগ্রামের সঙ্গে রাশিয়ার সংগ্রাম—গান্ধী ও লেনিন, "জল ও আগুনের" সমন্বয় সাধনের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে বিরোধিতাকে মনে হয়েছিল আপাত-বিরোধিতা। *ইয়ং ইন্ডিয়া*-র ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় (জুলাই ১৯২৪) তিনি লিখেছিলেন :

> বীরত্বপূর্ণ "অ-গ্রহণ" (Non-Acceptation), এবং যারা সমস্ত স্বৈরতন্ত্রের কংক্রিট, সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সিমেন্ট, সেইসব "চিরন্তন গ্রহণকারীদের" (éternels Acceptants) দাসসুলভ নিরুদ্বেগ নিরুত্তেজনার মধ্যে যতোটা দূরত্ব, তার চেয়ে কম দূরত্ব মহাত্মার অহিংসা এবং তার খোলাখুলি বিরোধী বিপ্লবীদের হিংসার মধ্যে,—একথা সাহস করে বলতে পারি।[৪৫]

১৯২৪ সালে রলাঁ একথা বললেও, অহিংসার সর্বব্যাপী কার্যকরতার ব্যাপারে, তাঁর মনে ক্রমশ কিন্তুভাব জাগতে শুরু করেছিল। ইতালিতে মুসোলিনির উত্থান, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অমানবিক আচরণ, ইউরোপের দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বিস্তার, সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইউরোপ ক্রমশ বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছিল। এই অবস্থায় গান্ধীর অহিংসা কতোখানি কার্যকর হতে পারে তা নিয়ে রলাঁর সংশয় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, অহিংসা নীতি যতোই মহৎ হোক,

ইউরোপের বাস্তব অবস্থায় তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহজনক। এসম্পর্কেতিনি মহাত্মা গান্ধীকে একাধিকবার অবহিত করেছিলেন। অহিংসা সম্পর্কে এই কিন্তুভাবটি *মহাত্মা গান্ধী* লেখার আগেই রলাঁর মনের মধ্যে ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়েই রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অ-প্রতিরোধ নীতির সার্থকতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, তার উত্তরে রলাঁ বলেছিলেন: ''অ-প্রতিরোধ কার্যত ফলপ্রদ এবং খুবই সহজ যখন এ প্রযুক্ত হয় এক বিপুল জনশক্তির দ্বারা, বিস্ময়কর প্রাণশক্তির কল্যাণে শেষ কথা বলতে যে দৃঢ়নিশ্চিত। সর্বদা নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে ভীত পাশ্চাত্য জনগণের পক্ষে এ সমস্যা আরও বেশি বিপজ্জনক। শান্তিবাদ দু'রকমের : আত্মত্যাগের ফলে, জীবনের দারিদ্রের ফলে। এবং শান্তিবাদ নিজের শক্তির প্রতি প্রশান্ত প্রত্যয়ের ফলে, জীবনের প্রাচুর্যের ফলে। এই শেযোক্ত শান্তিবাদ ভারতই যথার্থ অর্থে কার্যে পরিণত করার বিলাসের মূল্য দিতে পারে। (peut se payer la luxe de le mettre en practice)।''[৪৩] এই পর্বে রলাঁর লেখা তিন খন্ড উপন্যাস *লাম আঁশাঁতে* (বিমুগ্ধ আত্মা) নামটি অর্থবহ। তাতে রলাঁর এই সময়কার অহিংসার প্রতি বিশ্বাস ও সংশয়ের স্পষ্ট ছাপ আছে। রলাঁ তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন:

> ......১৯২১ সালে.......আমি নিশ্চিত ছিলাম যে (......কথাটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না) এই (অহিংসাই) অতীতের পাপের, ভবিষ্যতের পাপের বোঝা-ঘাড়ে-করা পৃথিবীর উদ্ধার হতে পারে......কিন্তু তার জন্যে কমপক্ষে প্রয়োজন যে, জগতকে তা চাইতে হবে, এবং, সর্বাগ্রে, তা পারতে হবে। কারণ এমন বিশ্বাস ডাক দেবে একটি জাতির সম্মত আত্মত্যাগে। এবং যুদ্ধের পরে এ ধরনের কিছু পোষণ করার আবহাওয়া পশ্চিমে গড়ে ওঠেনি.....তবু কী উদ্বেগে আমি ভারতে শৌর্য ও ধৈর্যশীল অভিজ্ঞতার গতিপথকে অনুসরণ করে গিয়েছি! স্বীকার করতে হবে কি, গান্ধীর প্রতি আমার মুগ্ধতা, আমার প্রীতি, আমার শ্রদ্ধার কমতি না-হলেও, তাঁর কৌশলের কার্যকরতা সম্পর্কে—বিশেষ করে পাশ্চাত্যে—সমস্ত কিন্তুভাব জানাতে আমার দেরি হয়নি। তাঁর সন্দেহগুলোকে দেখতে দেবার পক্ষে তিনি নিজেও

> খুবই খোলামন ছিলেন,—কিন্তু সে সন্দেহ তাঁর অহিংসার নীতির দিব্য সত্যতার সম্পর্কে নয়, আজকের পৃথিবীতে তার ফলিত প্রভাব সম্পর্কে।[৪৭]

মহাত্মা গান্ধীর মানসিক সীমাবদ্ধতা, "মনের দিগন্তের অপ্রসরতা", তাঁর রূপরসগন্ধবিরহিত কঠোর কায়িক ও মানসিক তপশ্চর্যা—সব কিছু জানা সত্ত্বেও, রলাঁ তাঁকে বলেছেন "ভারতের খ্রিষ্ট"। রলাঁর ভারত-ভাবনা আবর্তিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী,—মুখ্যত এই দুইজনকে কেন্দ্র করে। কারণ, আধুনিক ভারতের যে-উত্থান তাঁর একান্ত বাঞ্ছিত ছিল তার মহিমা, তার ব্যাপ্তি, তার নিশ্চয়তার অটুট বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে, আধুনিক ভারতের হৃদস্পন্দন কান পেতে শুনে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাবনার মর্মকেন্দ্রে, গান্ধী বহির্বলয়ে। পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনকে মিলিয়েই,—একে অন্যের পরিপূরক রূপে, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শাশ্বত ভারতের আত্মার প্রকাশ। তাঁর নিজের কথায়: "রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন এমন এক ট্রাজিক যুগে, যখন মানবতার ভবিতব্য, এবং বিশেষ করে তাঁর নিজের দেশের অগণিত মানুষের ভবিতব্য পরস্পর খেলায় মেতেছে। তাঁর উপরে এক ব্রত ন্যস্ত হয়েছে তাঁর যুগের মানুষকে আলোকিত করার, তাদের পথ দেখিয়ে দেবার,—যারা কূল-ভাসানো বিশাল নদী পাড়ি দিতে চাইছে।" রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর "দুজনের নিজের নিজের ব্রত আছে। তাঁদের কেউই সে ব্রত ছাড়তে পারেন না, ছাড়াও উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত উচ্চতর এবং দূরতর (plus haute et plus lointaine)। তার আবেদন শ্রেণী জাতি ও শতাব্দীর সমস্ত বাধা পেরিয়ে বাছাই করা (aux élus) মনের কাছে। গান্ধীর ব্রতের চেষ্টা একটি জাতির এবং একটি সময়ের ক্ষণস্থায়ী প্রয়োজনের (nécessités passagères) সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পর রম্যাঁ রলাঁর ভাবনায় আবির্ভাব ঘটেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের। তাঁর ভারত-ভাবনার পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় ভারতের আত্মার সন্ধান পেয়ে। তিনি বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, "মানুষ যখন অস্তিত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, সেই আদিমতম দিন থেকে জীবন্ত মানুষের সমস্ত স্বপ্ন যদি পৃথিবীর বুকে কোনো একটি জায়গায় স্বচ্ছন্দ স্থান পেয়ে

থাকে, তা হচ্ছে ভারত''।[৪৯] আধুনিক ভারতের যে-ঐক্যের বাণী,—স্বপ্ন, কর্ম, যুক্তি ও প্রেমের বাণী রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে চলেছে, যার মন্ত্রশক্তিতে বিশাল এক মহাদেশে এক প্রবল প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, তার মূলে ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদের যুগযুগব্যাপী ঐতিহ্য কতোখানি ক্রিয়াশীল, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার প্রেরণাতেই তিনি কিছুকাল মনঃসংযোগ করেছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে তাঁর ভারত-ভাবনা কখনোই সম্পূর্ণ হতো না।

প্রখর যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও রম্যাঁ রলাঁর মানসিকতায় অতীন্দ্রিয়বাদের বিশেষ স্থান ছিল। তিনি আস্তিক বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আস্তিক্যবাদের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞাই তাঁর প্রতি প্রযোজ্য নয়। তিনি জন্মেছিলেন ক্যাথলিক পরিবারে। বাবা আস্তিক ছিলেন না, কিন্তু মা ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণা। রলাঁ আজীবন তাঁর মায়ের গভীর ধর্মানুভূতির কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন, কিন্তু ক্যাথলিক গির্জার গন্ডিতে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছেন। প্রতিষ্ঠিত চিরাচরিত ''সেমিটিক ঈশ্বর'' এবং খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর অনীহা ছিল। ধর্মব্যবসায়ী যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার প্রচুর উক্তিও তাঁর রচনাবলি থেকে সংকলন করা যায়। তরুণ বয়সেই তিনি ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবলভাবে ধর্মপ্রবণ। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, অহং-এর মায়াকে পরিহার করা; সব সময়ে মানুষের দেবত্ব ও ঐক্যের ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখা, মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা;—এ ধরনের কথা রলাঁ কুড়ি বছর বয়সেই তাঁর *ক্রেদো কিয়া ভেরুম*-এ ব্যক্ত করেছিলেন।[৫০] পরবর্তীকালে তিনি একথা জানাতে ভোলেননি : ''আমার সত্তার সারাংশ ছিল চিরকালই ধর্মপ্রাণিত।'' ''*মানুষের সকল প্রকার প্রয়াসের লক্ষ্য যে ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে, অনেক সময় প্রচলিত সমাজজীবনের ঊর্ধ্বে,—এমন কি মানবজীবনের ঊর্ধ্বে*,''—*এমন একটি বিশ্বাসই ছিল তাঁর ধর্মচেতনার মূল।* পরিণত বয়সে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন : ''আনন্দ ও বেদনা সমেত জীবনের সমস্ত প্রকার, যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাদের মধ্যে, মানবজাতির মধ্যে, বিশ্বজগতে একমাত্র ঈশ্বর তিনি, যিনি নিরন্তর জন্ম। সৃষ্টি হয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে। এ এক অন্তহীন কর্ম এবং কঠোর প্রয়াসের ইচ্ছাশক্তি,—নির্ঝরের উচ্ছলিত প্রবাহ,

বদ্ধ জলাশয় নয়।"[৫১]

রলাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ভারতীয় অতীন্দ্রিয়তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ তীব্রতর করে তুলেছিল। এমন নয় যে, তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাবনা আকস্মিক ভাবে ভারতের কাছ থেকে পাওয়া; সে ভাবনা তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল। ভারতীয় ভাবনার মধ্যে তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন আরও বিশদভাবে, আরও বলিষ্ঠভাবে। ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত বিশ্বাসের মধ্যে ভারতের ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসকে রলাঁর মনে হয়েছিল, "সেই বিশ্বাস, যা বিশ্বজগতের সবচেয়ে বেশিটুকুই আলিঙ্গন করে।" বৌদ্ধধর্মের "ভাবাবিষ্ট বুদ্ধিবাদ" বা লাওৎসের "অতলের স্মিতহাস্য প্রশান্তি"-কে তাঁর মনে হয়েছে "মহিমান্বিত ব্যতিক্রমের কিছু মুহূর্ত, মনের মাথা ঝিমঝিম-করা শিখরচূড়া"। তাঁর অনুরাগ ছিল ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের প্রতি, কারণ, তাঁর মতে "এ সমস্ত কিছুকে ধারণ করে"। আনন্দ কুমারস্বামীর *দ্য ডান্স অব্ শিব* পড়ে অভিভূত রলাঁ ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় (জানুয়ারি ১৯২২) লিখেছিলেন :

> .....কোনো অস্বীকৃতি নেই। সব কিছুই সুসমন্বিত। জীবনের সকল শক্তি শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে আন্দোলিত সহস্রবাহু অরণ্যের মতো, যাকে পরিচালনা করেন নটরাজ রঙ্গেশ্বর। প্রতিটি বস্তুর নিজের স্থান আছে, প্রতিটি সত্তার নিজের কৃত্য আছে, আর দিব্য ঐকতানে সংশ্লিষ্ট সবকিছু,—তাদের বিচিত্র সুর, এমন কি বেসুর দিয়ে সৃষ্টি করেছে—হেরাক্লিডের কথা অনুযায়ী—সুন্দরতম সুবিন্যাস। পাশ্চাত্যে যখন এক কঠিন ও নিরুত্তাপ যুক্তি বিসদৃশকে পৃথক করে বন্দী করে রাখে, ভারত তখন বিভিন্ন সত্তার পার্থক্যটি মনে রেখে, তাদের মেলাতে চেষ্টা করে, সামগ্রিক ঐক্যকে তার সম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। বিপরীত মিথুন গড়ে তোলে অস্তিত্বের ছন্দ-তাল। আধ্যাত্মিক নির্মলতা যৌনসম্ভোগের সঙ্গে হাত মেলাতে ভয় পায় না—অবাধ যৌনতার সঙ্গে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা......শিল্পকলার মহত্তম সৃষ্টিগুলো সৌন্দর্যের সঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন ঘটায়। সর্বত্র সুতীব্র জীবন নিজেকে অভিক্ষেপ করে বহুরূপ ও সমৃদ্ধ এক ধারাবর্ষণে। সর্বত্র এক, একের দৃষ্টি, লক্ষ লক্ষ দৃষ্টির গভীরে।[৫২]

এই ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদের ভান্ডারে কোন শক্তি সঞ্চিত আছে যা তার

আধুনিক জগতে চলার পথের গতিবেগ সঞ্চার করেছে, রলাঁ তারই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতে গত একশো বছরে চিন্তাবীরের দল যে অধ্যাত্ম প্রেরণায় ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে মানুষের মিলন,—যে প্রাণময় ঐক্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তার সবচেয়ে প্রাণবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্যে। রামকৃষ্ণকে রলাঁর অন্তরের খুবই কাছাকাছি মনে হয়েছিল *অবতার* বলে নয়, একজন মানুষ বলে, যে পরিপূর্ণ মানুষটির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল "বিশ্বাত্মার দীপ্তোজ্জ্বল ঐকতান", যিনি উপলব্ধি করেছিলেন "মহাজাগতিক আনন্দের প্রশান্ত পূর্ণতা", *মানুষ হয়েও যিনি তাই ঈশ্বর*। আর শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন, সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি ছিলেন বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত শত শত জাতি নিয়ে গঠিত মহাজাতির ঐক্যের মূর্ত প্রকাশ; *মানবের মহানগরী*-র (Civitas Dei) স্থপতি; বন্ধ্যা দূরকল্পনার চোরাবালিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঢাকা-পড়ে-থাকা ভারতকে যে-সন্ন্যাসী টেনে তুলেছিলেন। এক দশক পরেও (১৯৩৫) রলাঁ সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন:

> মননের পথ ধরে যখন আমি, ভাবনার মধ্যে দিয়ে ভারতের তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলাম, তখন সেখান থেকে অনন্তের অচল স্বপ্নকে আনিনি যার মধ্যেই ভারতীয় চিন্তা নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে; কিন্তু এনেছি তাঁদের, যাঁরা জানেন সেই স্বপ্ন থেকে কর্মকে নিষ্কাষণ করে সেই অগ্নিকটাহে নিক্ষেপ করতে, যেখানে পুঞ্জীভূত হয়, টগবগ করে কর্মের ঢালাই প্রক্রিয়া: এনেছি উপদেষ্টা-পরিচালক (pasteur) গান্ধীকে, বীরনায়ক (héros) বিবেকানন্দকে।[৫৩]

দুই

রম্যাঁ রলাঁ তাঁর ভারত-ভাবনার কোন পর্বে কোন সূত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবহিত হয়েছিলেন এবং কবে থেকে তাঁদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। ভিলন্যভে বাসকালের প্রথম দিকে তিনি গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলেন *মহাত্মা গান্ধী* রচনার তথ্য সংগ্রহে, গান্ধীর আদর্শের যুক্তিসিদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণে। এ সময়ে যেসব ভারতীয় এবং ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিদেশীরা ভিলন্যভে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা হতো, তা ছিল স্বভাবতই ভারতের রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক এবং মুখ্যত তার উপলক্ষ ছিলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন দিলীপকুমার রায় (অগাস্ট ১৯২২), কালিদাস নাগ (এপ্রিল ১৯২২, সেপ্টেম্বর ১৯২৩), পিয়র্সন (সেপ্টেম্বর ১৯২৩), পল রিশার (জানুয়ারি-জুলাই-অগাস্ট ১৯২৪), লালা লাজপৎ রায় (জুন ১৯২৪), থিওসফিস্ট হাতিনি আলভি, রামাইয়া নাইডু, অমৃত জাসুংঘানি (জুলাই ১৯২৪), পেস্টনজি পশা (মার্চ ১৯২৪) এবং সর্বোপরি ইতালি সফরের পর রথীন্দ্রনাথ, প্রশান্তকুমার মহলানবিশ সহ সদলবলে রবীন্দ্রনাথ (জুন-জুলাই ১৯২৬)। এর আগেও দেখা করেছেন দিলীপকুমার (অগাস্ট ১৯২০); পারীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (এপ্রিল ১৯২১); লন্ডনে দেখা করেছেন এন্ড্রুজ (মার্চ ১৯২৩)। কিন্তু তাঁদের কারুর সঙ্গে কোনো আলাপচারিতেই ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরের আগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অথচ রম্যাঁ রলাঁ যে অতীন্দ্রিয় ভারত সম্পর্কে সে সময়ে মানসিক ভাবে সচেতন ছিলেন না এমন কথাও বলা চলে না।

কালিদাস নাগের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে (এপ্রিল ১৯২২) ভারতীয় অধিবিদ্যার চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্যের উল্লেখ, "বিষ্ণু ও শিবের বৈদিক সূক্তের প্রায় আক্ষরিক ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি খুঁজে" পেয়েও রলাঁ বিস্মিত হননি। তিনি বলেছিলেন: "এশিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে যে অগ্রবর্তী আর্যরা এসেছিল, আমি তাদের শেষ বংশধর,—আর এখন হারিয়ে গেছি পশ্চিমের নেগ্রয়েড ও সেমিটিক বনে-যাওয়া জাতিগুলোর মধ্যে।"[১] ১৯২৩ সালের অক্টোবরে, *মহাত্মা গান্ধী* সদ্য সমাপ্ত হবার পর, *বিশ্বভারতী*

কোয়াটার্লি-র প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তিনি দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন : "ভারতীয় মহান মিস্টিকদের সঙ্গে আমার চিন্তার আত্মীয়তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। নিশ্চিতভাবে, আমি ছিলাম শিশু (বা বড়ো জোর কিশোর), খ্রিষ্টীয় মিস্টিকদের চেয়ে স্বভাবে তাঁদের অনেক কাছাকাছি।.......ভগবান ও মানুষের.....'সৃষ্টির মধ্যে সৌভ্রাত্র' (fraternité dans la création)—এ আমার স্বভাবের মৌল বিশ্বাসের কাছাকাছি।"[২] (প্রবন্ধটি ছিল *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* সম্পর্কিত।) অরবিন্দ সম্পর্কে রলাঁ অবহিত হয়েছিলেন পল রিশারের চিঠির মাধ্যমে (সেপ্টেম্বর ১৯২১), পিয়র্সনের সঙ্গে আলাপচারিতে। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে অতিথি রবীন্দ্রনাথ রলাঁর বাসভবনেই আদলয ফেরিয়ের-এর সঙ্গে ভারতীয় *যোগ* সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, কৌতূহলী রলাঁ তার প্রকৃতি জানতে চেয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে অরবিন্দ সম্পর্কেও, জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।[৩] এমনকি থিওসফি সম্পর্কেও রলাঁর কৌতহূলী মনের পরিচয় আছে রামাইয়া নাইডুর সঙ্গে আলাপচারিতে। কিন্তু ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরের আগে রামকৃষ্ণ নামটি কোথাও উচ্চারিত হতে দেখা যায় না।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর, হেলসিংফোর্সে ওয়াই. এম. সি.এ.-র আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের পর, রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভারতের ওয়াই. এম. সি. এ.-র সাধারণ সম্পাদক কে.টি. পল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফেডারেশন অব্ ইনট্যারনাশনাল ফেলোশিপ-এর নিখিল বিশ্ব কমিটির সদস্য এ. সেনো। কে. টি. পল শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্টের সঙ্গে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ করেছেন। ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে। তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন ভারতীয় প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ প্রতিনিধিরাও এবং তাঁদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম এমননি থিওসফির প্রতিনিধিরা। হেল-সিংফোর্সের সেই কংগ্রেসে গান্ধীকে কে.টি. পলের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রলাঁ এবং নিজে চিঠিতে মীরা বেনের মাধ্যমেও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছিলেন। এই সংগঠনে ভারতের জনপ্রিয় ধর্মগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামের কোনো উল্লেখই বহুবছর কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়নি। এই সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গেই কে.টি পল নতুন

রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে বলেছিলেন: "আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে এই সম্প্রদায় ভারতের প্রকৃত মনে ভালো সাড়া জাগায় (qui répond mieux au vrai esprit)।" তিনি আরও বলেছিলেন: "ভারতের এই একটি ধর্মসম্প্রদায়ের অনেক ভবিষ্যৎ আছে।" তিনি একে সম্মান করেন, ফিরে গিয়ে রামকৃষ্ণমঠগুলো দেখবেন[৪]। এর ঠিক এক মাস পরেই (৪ অক্টোবর) রলাঁর সাক্ষাৎ হয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয় যাঁর মুখ থেকে রলাঁ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী প্রথম শুনেছিলেন।

এই সাক্ষাতের আগেই রলাঁ ধনগোপালের লেখা রামকৃষ্ণের জীবনী *দা ফেস অব্ সাইলেন্স* পড়েছিলেন। গ্রন্থটি সেই বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কে। সেই বছরেই জেনিভার আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারের জন্যে লিগ অব্ নেশনসের নির্বাচিত চল্লিশটি বিশিষ্ট গ্রন্থের অন্যতম রূপে *দা ফেস অব্ সাইলেন্স* স্থান পেয়েছিল। বোনের সাহায্যে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে অভিভূত রলাঁ "রামকৃষ্ণ ও তাঁর তেজস্বী শিষ্য বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করা এবং তাঁদের পরিচিত করানো কর্তব্য" বলে অনুভব করেছিলেন। তাই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *দা ফেস অব্ সাইলেন্স*-এর আগে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাকস মুলারের *রামকৃষ্ণ: দা লাইফ এ্যান্ড সেইংস* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ সালে, নতুন সংস্করণ ১৯২৩ সালে। ম্যাকস মুলার রামকৃষ্ণের জীবন-তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দের কাছ থেকে। কিন্তু ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো তো বটেই, ম্যাকস মুলারের বইটিও রলাঁর অগোচরে ছিল। ১৯২৪ সালে মায়াবতী, আলমোড়া থেকে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্বলিত *লাইফ অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ* গ্রন্থটিও তাঁর হাতে পড়েছিল বলে মনে হয় না।

ধনগোপাল তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন নিজের চেষ্টায় ১৯২১-১৯২২ সালের মধ্যে। *শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*-এর লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) নির্দেশে তিনি রামকৃষ্ণের তিরোভাবের ৩৫-৩৬ বছর পর তাঁর

জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে জনশ্রুতি, সেই সময়েই যা কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিল,—তার মূলও তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন। "শ্রী রামকৃষ্ণের জীবনী বিষয়ে গবেষণার জন্যে.......ঘটনাবলির মধ্যে না গিয়ে ঘটনাপঞ্জীর রচয়িতাদের সন্ধান" করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। মঠের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেছিলেন। রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে তখনো জীবিত স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং সম্ভবত স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ লেখার সময়ে তাঁরা পরলোকে, কিন্তু "চারজন" তখনো জীবিত ছিলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন যে, জীবিত শিষ্যদের "জীবন ইতিহাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সৌজন্যে বাধে"। তিনি কেবল স্বর্গত শিষ্যদের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চান। সদ্য প্রয়াত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান "সীমাবদ্ধ" এবং "অসম্পূর্ণ"। তিনি "বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও লাটু মহারাজের জীবনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু জনশ্রুতি নির্ভরতার জন্যে এই তিনজনের জীবনীতেই তথ্যগত গুরুতর এবং মারাত্মক ত্রুটি আছে।

এসব সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, পঞ্চবটী, গঙ্গার বহমান স্রোতধারা, বেলুড় মঠের সন্ধ্যারতি, সর্বোপরি প্রকৃতির বর্ণাঢ্য আবহের মধ্যে দিয়ে যেভাবে তিনি রামকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য উপস্থিতিকে মূর্ত, সজীব ও সচল করে তুলতে পেরেছিলেন তা রলাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি ধনগোপালকে শিল্পী বলে গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর ধারণার আদরাটি তিনি এই গ্রন্থ থেকেই পেয়েছিলেন। গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল ইউরোপীয় মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে। রলাঁর মতে, তাতে তিনি সার্থকতা লাভ করেছিলেন।

ভিলন্যভের ভিলা অলগায় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগমনের তারিখ ৪ অক্টোবর ১৯২৬। "মহান হিন্দু" রামকৃষ্ণের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপচারি সেদিন লিপিবদ্ধ করার গোড়াতেই তিনি গ্রন্থটি থেকে পাওয়া রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধারণার পরিচয় দিয়েছিলেন এই ক'টি কথায়:

> রামকৃষ্ণ ছিলেন অসংস্কৃত, শিক্ষাদীক্ষাহীন, কিন্তু তিনি স্বতঃ উপলব্ধির অন্যতম অতি-শক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, মনে হয়—নিজের মধ্যে তিনি সমস্ত মহৎ ধর্মের নিঁখুত একীভবন "বাস্তবিক"

> করেছিলেন।......অন্যদের কাছে যা শুধু মনের একটা আদর্শ, বুদ্ধিগত সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা, সারা জীবন রামকৃষ্ণ তা সম্পন্ন করেছিলেন সরাসরি সহজাত-বৃত্তি (Instinct) থেকে। তিনি ঈশ্বরে বেঁচেছিলেন, তাঁর সমস্ত ধারাবর্ষী রূপের মধ্যে দিয়ে।[৬]

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে, রলাঁ লিখেছেন, রামকৃষ্ণের গূঢ় ব্যক্তিগত বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল। বিনা কথায় তাঁর উপস্থিতি, তাঁর স্পর্শ বিপর্যয় ঘটিয়ে দিত। "প্রথম সাক্ষাতে" "বিদ্রোহী সিংহ" সংশয়ী বিবেকানন্দকে "হাতের একটা চাপ দিয়েই তাঁর চোখের সামনে নাস্তির যে অতলতা খুলে দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন.....তার নিশ্চিত যাথার্থ্য বাতিল করা যায় না।" বিবেকানন্দ এসব কথা যাঁদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের অনেকে এখনো বেঁচে আছেন, তাঁরাই সাক্ষী। বিবেকানন্দের মতো অতি-সংস্কৃত, অভিজাত, গর্বোদ্ধত, আধিপত্যশালী মনের অধিকারী, বুদ্ধিমত্তার জন্যে অহংকারী মানুষ রামকৃষ্ণের মতো অ-মননশীল অতি-সাধারণ শাদামাটা মানুষের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, "যেমন পল লুটিয়ে পড়েছিলেন দামাস্কাসের পথে"।

সেদিনের আলোচনায় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রলাঁকে জানিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণের মুখে-মুখে-বলা ঐতিহ্যের তিনি নির্দিষ্ট রূপ দিতে চান। তখনো ভারতে "তিন জন" শিষ্য বেঁচে আছেন, যাঁরা তাঁকে জানেন। ভারতে গিয়ে তিনি তাঁদের স্মৃতিকথা লিখে নেবেন; ইতিমধ্যেই তিনি "বিস্ময়কর প্রমাণপত্র, আত্মজীবনীমূলক রোজনামচা" সংগ্রহ করেছেন। রলাঁকে সেসব দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। তাঁদের যে-বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি রলাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁদের একজনের (রলাঁ তাঁর নামটা মনে রাখতে পারেননি) স্পর্শে তাঁর মনে হয়েছিল, "মাটির ঊর্ধ্বে মাতাল-করা এক আনন্দের জগতে তিনি চলে গেছেন; তাঁর সমস্ত উদ্বেগ, জগতের সব কিছু লোপ পেয়েছিল"। কিন্তু এধরনের শক্তি আয়ত্তে থাকলেও তার ব্যবহারে শক্তিমানরা অতি সতর্ক। পশ্চিমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতো বিচারশীল মানসিকতার লোকের মুখ থেকে এ ধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা রলাঁর কাছে খুব মূল্যবান মনে হয়েছিল।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণমিশন ও মঠের কার্যকলাপও বর্ণনা

করেছিলেন। মিশনের মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণের ধ্যানধারণা ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব অনুকূল নয়। যদিও রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যদের অনেকেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী। মঠগুলোর সঙ্গে ইউরোপীয় মঠের সাদৃশ্য কম। "ওখানে জীবন কাটানো নিষেধ; ওখানে যায় গুরুর উপদেশের মতো নিজেকে গড়ে তুলতে, কয়েক বছর ধ্যান করতে। যখন আলো আসে, শুধু নিজের জন্যে তা রেখে দেবার নিয়ম নেই। দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে বলা হয় : 'তোমার মধ্যে আগুন আছে। তা এখন অন্যের কাছে নিয়ে যাও।' " বিবেকানন্দ ধ্যানের জন্যে মঠস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পাহাড় কিনেছিলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুজানোয়ার, বাঘশুদ্ধ বন্য পরিবেশ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে তৈরি হয়েছিল ছয় কি সাত জন সাধুর উপযুক্ত একটি মঠ, কখনোই বারোর বেশি নয়। সাধুরা চাষ করেন এবং উপাসনা করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের পক্ষে "পুণ্যের কোনো আদর্শকে অনুসরণের কোনো প্রশ্ন নেই। বলা হয় : "সেবার কথা ভাবার কি আছে? কৃষ্ণ হও! আর সবই তোমার কাছে আসবে বাড়তি হয়ে।" ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রলাঁকে বলেছিলেন, ওকাকুরা বেলুড়ে বিবেকানন্দের সন্ধানে এসেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন : "এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি জীবনের মধ্যে আছেন।" ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় শিশুকালে বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন বলে স্মরণ করতে পারেন, একথাও জানিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাতের সময় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বয়স ছিল ছত্রিশ। তাঁর মুখেই রলাঁ তাঁর জীবনকাহিনী শুনেছিলেন।—তিনি চীনে জাপানে ঘুরেছেন, আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি পেয়েছেন। তিনি রলাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ার উৎখাত হাজার হাজার ভারতীয়ের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ভারতে ফিরে এই হতভাগ্যরা ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হাতে ঘেরাও হয়ে নিহত হয়। তাঁর মতে, "এটাই ছিল অমৃতসরের অভ্যুত্থানের সূচনা।"[৭] আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীর কথা উঠেছিল। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় গান্ধীর জীবনী লিখতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধ করেছেন। গান্ধী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মাধুর্যে প্রভাবিত হয়েছেন। "এই জীবনীটির ইতিহাসের

চেয়ে দিব্যতর কোনো কিছু তাঁর জানা নেই।" গান্ধীর নিষেধের কারণ সম্পর্কে রলাঁ বলেছিলেন, "গান্ধী সচেতন যে তিনি এই দিব্য উপাদানের মানুষ নন এবং ভক্তরা তাঁর উপরে তা চাপানোয় আহত হন।" গান্ধী দেবতা নন তিনি এক সন্ত। "সন্ত আমাদের মানবতার অন্তর্ভুক্ত, দেবতা থাকেন অন্য ভূমিতে।"

রলাঁ ধনগোপালের মুখ থেকেই জেনেছিলেন, আমেরিকায় প্রথমে তাঁর গুরু ছিলেন আব্দুল-বেহা। কিন্তু আব্দুল-বেহা তাঁকে বলেছিলেন : ".....তোমার স্থান আমাদের পাশে নয়। রবীন্দ্রনাথকে খোঁজো (Allez trouver Tagore)।" তাঁর নির্দেশেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। রলাঁ ধনগোপালকে অনুরোধ করেছিলেন রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিতে।

রলাঁ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু স্বভাবতই সে যোগাযোগ ঘটতে দেরি হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে জহরলাল নেহেরু এসেছিলেন দুবার, এক বার বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত ও আর. এস. পন্ডিতকে নিয়ে, অন্য বার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে। জুলাই মাসে রলাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে তখনো ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরছিলেন। ইতালি সফরে মুসোলিনি ও ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের "প্রকাশিত" মতামত নিয়ে যে বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, রলাঁ তা প্রশমিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। মুসোলিনির ইতালির প্রকৃত স্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে উদঘাটিত করেছিলেন। ইতালির মতো অন্য কোনো দেশেই রবীন্দ্রনাথ যেন "ফাঁদে" না পড়েন, সেজন্যেও তাঁর উদ্বেগ ছিল। দেশে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ ভিলন্যভ হয়ে যাবেন এমন কথাও ছিল। নভেম্বর মাসে হাঙ্গেরির বালাতন ফুরেদের স্বাস্থ্যনিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন (৩ নভেম্বর) স্বাস্থ্যের জন্যে ড্যানিউবের পথে তাঁকে ভারতে ফিরতে হবে।

ইতালির ব্যাপারে ভিলন্যভে রবীন্দ্রনাথের মানসিক শক্তি বিঘ্নিত করার জন্যে রলাঁর মনে বেদনাবোধও ছিল। তিনি তাঁকে লিখেছিলেন :

> আপনার ইতালীয় নিমন্ত্রণকর্তাদের প্রতি যে আস্থা ছিল, তা নির্মূল করতে গিয়ে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে হয়েছিল বলে,

> নিজেকে আমি তিরস্কার করেছি। কিন্তু তাতে আপনার গৌরবের স্বার্থ,—যা এখনো আমার কাছে আপনার বিশ্রামের চেয়ে দামি;—ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ ছিল না। আমি চাই না ইতিহাসে দানবেরা আপনার পবিত্র নামের অপব্যবহার করতে সক্ষম হয়। যদি আমার হস্তক্ষেপ কিছুকালের জন্যেও আপনাকে অশান্ত করে থাকে, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। ভবিষ্যৎ (ইতিমধ্যেই বর্তমান) আপনাকে দেখিয়ে দেবে আমি এক সতর্ক ও বিশ্বস্ত প্রহরীর কাজ করেছি।[৮]

সেই চিঠিতেই পুনশ্চ দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন,—ইতালির ফ্যাসিস্ট দৌরাত্ম্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বিভিন্ন শহরে আক্রমণে আহত-নিহতদের সংখ্যা, ক্রোচের বাসভবন আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির কথা।

হেলসিংকফোর্স আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত গান্ধী যোগ না-দেওয়ায় রলাঁ দুঃখপ্রকাশ করে মীরা বেনকে সেপ্টেম্বরে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠির সূত্রে গান্ধী রলাঁকে লিখেছিলেন (২৯ সেপ্টেম্বর), তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল আমন্ত্রণ খেই-ধরানো, "স্বতঃস্ফূর্ত নয়"; তাছাড়া তিনি "অন্তরের আহ্বান" পাননি। সেই বছরেই রলাঁর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশক রনিগের (RONIGER) প্রকাশ করেছিলেন *লিবের আমিকোরাম রম্যাঁ রলাঁ*। তাতে গান্ধীর কাছে রলাঁ সম্পর্কে একটি রচনার অনুরোধ জানালে অসামর্থ্য জানিয়ে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেটিই সংকলনে ছাপা হয়েছিল। সেই উত্তরে রলাঁ সম্পর্কে গান্ধী লিখেছিলেন "my self-chosen advertiser"। গান্ধী রলাঁকে লেখা চিঠিতে সেই প্রসঙ্গ তুলে লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন যে তাঁকে "my self-chosen advertiser" বলায় তিনি "আহত" হয়েছেন। এতে সত্যি সত্যি আহত রলাঁ সবিনয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে এমন অভিযোগ তিনি কখনো করেননি, করার কথা ভাবতেও পারেন না। রলাঁ তার দিনপঞ্জীতে লিখেছেন :

> আমার আশঙ্কার সংগত কারণ আছে যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিবিরের মধ্যে যে-বেদনাদায়ক বিরোধ আছে এটা তারই একটা ঘটনা! রবীন্দ্রনাথ যদি নাও হন, তাঁর চারপাশের কেউ

মুখ-ফসকানো কোনো কথা আমার বলে ঘাড়ে চাপিয়ে কাজে লাগিয়েছে। যেসব কারণে আমি এখন পরিকল্পিত ভারতসফর থেকে সরে আছি, তার একটা হচ্ছে এই যে, আমি সেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে পড়ব।[৯]

ডিসেম্বর মাসে বোন মাদলেন রলাঁর কার্পেলেসদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পারীতে, তাঁদের মুখ থেকে শুনে এসেছিলেন ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনির ফাঁদে-পড়ার কাহিনী। রলাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, ইতালীয় ফ্যাসিবাদের হাত এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এবার বলকান ফ্যাসিবাদের খপ্‌পরে পড়বেন। হাঙ্গেরির মধ্যে দিয়ে "তাঁর পথযাত্রার প্রতিধ্বনি" শুনছিলেন হাঙ্গে-রির বন্ধুদের কাছ থেকে। এইভাবে শেষ হয়েছিল ১৯২৬ সাল।

নতুন বছরের প্রথমেই তিনি (১৫ই জানুয়ারি) এইচ. মারিচিকে চিঠিতে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ছবির পাশে মুসোলিনির ছবি ছাপিয়ে *দা ইন্ডিয়ান ডেইলি মেইল*-এ প্রবন্ধ ছাপানোর জন্যে। একই সঙ্গে কালিদাস নাগকে চিঠি দিয়েছিলেন ১৭ জানুয়ারি সংখ্যায় *মডার্ন রিভিউ-এ* ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সপক্ষে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতিবাদ জানিয়ে। এই চিঠিতেই তিনি তাঁর তরুণ শ্যালক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত করে লিখেছিলেন, "বিজয়ী পাশবিকতায় ভারতীয় তরুণদের একাংশের মতোই নির্বোধভাবে অনুরক্ত হয়েছেন", "তিনি এই দুষ্কর্মের মুখ্য সহায়ক"। কাকা কালেলকরের *দা গসপেল অব্ স্বদেশী* পড়ে রলাঁ তাঁর "সন্ন্যাসীসুলভ ও জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার" নিন্দা করেছিলেন। কালেলকরের বিনীত উত্তর পেয়ে রলাঁ তাঁর "'সমালোচনার অবিচারের" জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখেছিলেন : "গান্ধী বা আপনারা চিরকাল থাকবেন না। আপনাদের উচিত এই কঠোর কান্ডারীর ভূমিকায় তাঁদের গড়ে তোলা, যাঁরা আপনাদের পর নৌকোর হালে আপনাদের স্থান নিতে পারেন।"[১০] এপ্রিল মাসে গান্ধী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্যে রলাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। সেই মাসেই তাঁকে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন কে. টি. পল। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল রলাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং মুসোলিনি-ভ্যাটিকান প্রসঙ্গে তাঁদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কে. টি. পলের মনোভাব "বেশ নরম", মেরুদন্ডহীন। মুসোলিনির সঙ্গে ভ্যাটিকানের আপসে রলাঁ

যে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন, সন্ত-ফ্রাঁসোয়া মুসোলিনিকে নিন্দা না-করে তাঁকে "ছোটো ভাই" বলতেন। রলাঁ তার উত্তরে লিখেছিলেন, সন্ত-ফ্রাঁসোয়া একথা বললেও অবশ্যই বলতেন, "ভাই অসৎ কাজ করো না। আমাকে অনুসরণ করো। আর পাপ করো না।" তাঁর অভিযোগ: "মুসোলিনির কোনো স্তাবকতা না করলেও (খ্রিষ্টানরা) বিচক্ষণের মতো চুপ করে আছেন। আজকের খ্রিষ্টানরা ঝড়ে-উত্তাল হ্রদের মধ্যে খ্রিষ্টের শিষ্যদের মতো।" সর্বশেষে তিনি লিখেছিলেন :

> আমার শৈশবের ধর্ম (ক্যাথলিক) থেকে বিছিন্ন হলেও, সমস্ত জাতের চার্চের থেকে মুক্ত থাকলেও, আমার আছে বিশ্বাস। অন্তরের ঈশ্বর যখন কথা বলেন, তাকে মানতে হয়।[১১]

এরপরই দেখা করতে এসেছিলেন (২৯ এপ্রিল) কাবুল থেকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং তারপর (১মে) স্ত্রী ও কন্যাসহ জহরলাল নেহেরু। দীর্ঘ আট মাসের মধ্যে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কিংবা পত্রালাপে, কোনো সূত্রে বা প্রসঙ্গেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উল্লেখমাত্র নেই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতির উপরে নির্ভর করে থাকা ছাড়া রম্যাঁ রলাঁ এ সময়ে অন্য আর কোনো উপায়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন কি না তার উল্লেখও পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতার পর্ব শুরু হয়েছিল বিবেকানন্দের বান্ধবী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের আগমনের পর থেকে।

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এসেছিলেন ১৩ মে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো ভারতের রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলে মিশন মিস ম্যাকলাউডের মাধ্যমে কিছুদিন আগে অনেক বই,—রলাঁর ভাষায়, "এই বিষয়ের প্রায় গোটা একটা লাইব্রেরি"—পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বোন মাদলেন রলাঁ সেগুলো পড়ে, প্রতি সন্ধ্যায় রলাঁকে তা আবার পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ইউরোপ ঘুরতে এসে আগ্রহী মিস ম্যাকলাউড নিজেই এসে পৌঁছেছিলেন ভিলন্যভে।

মিউ ম্যাকলাউড ছিলেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার অতি অন্তরঙ্গ বান্ধবী। নিউ ইয়র্কে তিনি বিবেকানন্দকে আতিথ্য দিয়েছিলেন, ইংল্যান্ডে ও

ইউরোপে যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন; তিনি ভারতে এসেছিলেন, বিবেকানন্দের সঙ্গে উত্তর ভারত ও কাশ্মীর ঘুরেছিলেন, বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দে তিনি তাঁর বিশ্বাস অর্পণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর ধর্মবিশ্বাস, তাঁর আবেগ। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রতি অখন্ড বিশ্বাস, তাঁর সঙ্গে এতো অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও তিনি দীক্ষিত হননি, মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেননি। তিনি নিজে স্বাধীনতা এবং মুক্ত মানসিকতাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। এ নিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াও ছিল। বিবেকানন্দ তাঁকে প্রীতি ভরে "জো" বলে ডাকতেন। "মূর্তিমান পূর্ণতা" বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণ এবং তাঁর কাজে অর্থ সাহায্যেই ছিল তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দ এবং চরিতার্থতা।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর মিস ম্যাকলাউডের চেয়ে উপযুক্ত এমন আর কেউ ছিলেন না যাঁর মুখ থেকে শুনে রলাঁ তাঁর বহুমাত্রিক চরিত্রের প্রত্যক্ষ বর্ণবিভূতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বইগুলোয় সোজাসুজি ঢুকতে রলাঁ অক্ষম ছিলেন। ধনগোপাল ভালো ফরাসী বলতে পারতেন না, তাই তার সঙ্গে আলোচনা যে পরোক্ষই ছিল তা অনুমান করতে বাধা নেই। কিন্তু মিস ম্যাকলাউড খুব ভালো ফরাসী জানতেন এবং বলতে পারতেন। তাঁদের আলাপচারি হয়েছিল সোজাসুজি এবং বেশ কয়েক দিন ধরে। রলাঁর দিনপঞ্জীতে অনেকগুলো পাতা জুড়ে এই আলাপচারি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।[১২]

প্রায় সাত বছর মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দের নিকটসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বিবেকানন্দের স্মৃতিতে তাঁর মন ভরপুর হয়ে ছিল; পঁচিশ বছর পরেও সে স্মৃতি ছিল অমলিন, নিত্যোজ্জ্বল। প্রায় ষাট[১৩] বছর বয়স্কা প্রখর বুদ্ধিমতী, উদগ্র কৌতূহলী, বাক্‌পটিয়সী, মার্জিতরুচি মিস ম্যাকলাউড আনন্দে আবেগে পরম প্রীতিতে রলাঁর কাছে সেই স্মৃতিচারণই করেছিলেন লীলাকীর্তনের মতো। বিবেকানন্দের "সৌন্দর্য মাধুর্য, বিচ্ছুরিত আকর্ষণীয় ক্ষমতা সম্পর্কে" তাঁর বলার কথা শেষই হতে চাইত না। বিবেকানন্দের মধ্যে মিশেছিল মল্লবীরের শক্তির সঙ্গে পরম মাধুর্য। শক্ত চোয়াল, চোখে অগ্নিদৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের প্রত্যয়। কণ্ঠস্বর ছিল চেল্লোর মতো সুন্দর গম্ভীর, উঁচুতে উঠত না, তার গম্ভীর স্পন্দনে ঘর গম্ গম্ করত।

শ্রোতার মনে তার প্রতিধ্বনি জাগত, তারপর ধীরে ধীরে যেমন সমে নেমে আসত, শ্রোতার মনকে তা টেনে নিয়ে যেতো মনের অন্তরতম প্রদেশে। নিবেদিতার কণ্ঠস্বরও নাকি একই গোত্রের ছিল। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল এ থেকে পৃথক, তাঁর স্বর উঠত অনেক উঁচুতে।

বিবেকানন্দের ছিল এক স্বচ্ছন্দ নিরন্তর স্বতঃস্ফূর্ততা। কোথাও কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। আগ্রহ, আনন্দ, বয়স্ক-শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে তিনি সকলের সঙ্গে যোগ দিতেন। প্রত্যেকেই সহজ বোধ করত। তাছাড়া, তিনি ছিলেন রঙ্গ-রসে ভরপুর। ঈশ্বরসন্ধানে এটিকে তিনি গুরুর মতোই প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী, নিজেকে বলতেন কবি। ইউরোপীয় তর্কবিদ্যা, কর্ম ও চিন্তার যান্ত্রিকীকরণ, "সংগঠিত করার" নাম করে যা প্রস্তরীভূত করে তোলে, তিনি তার জাতশত্রু ছিলেন। তিনি চাইতেন আন্তর প্রবাহের নিরন্তর স্বাধীনতা। স্ববিরোধিতাকে তিনি ভয় করতেন না। তাঁর কথাবার্তা স্ববিরোধিতা পূর্ণ ছিল । তিনি তা জানতেন এবং তা নিয়ে বড়াইও করতেন। গতকাল অন্য কথা বলেছেন বলে অনুযোগ করা হলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন: "ঠিকই তো। কাল ছিল কাল। আজ আমি এগিয়ে গেছি।" মিস ম্যাকলাউডের কাছে তিনি ছিলেন "গীতার মতো বিরোধিতায় ভরা। তিনি ছিলেন মূর্তিমন্ত গীতা।" পাপ সম্পর্কে পিউরিটান এবং খ্রিষ্টীয় আচ্ছন্নতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নিজের লোকদের কাছে তিনি দাবি করতেন সামগ্রিক স্বচ্ছতা, স্পষ্ট মন, সক্রিয় কর্মশক্তি।

রামকৃষ্ণের মতোই তিনি আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতাকে চরম প্রয়োজন করে তুলেছিলেন। যা-কিছু মনকে পদানত করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্বাসের ঘোষণা সত্ত্বেও, তিনি পশ্চিমের কাছ থেকে শৃঙ্খলাবোধের গুণাবলি গ্রহণ করতে এবং সন্ন্যাসীদের উপর চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। "সন্ন্যাসীদের কঠোর শৃঙ্খলা এবং অপরকে—দরিদ্রকে, রুগ্নকে, দুঃখীকে সেবা করার বাধ্যবাধকতা : ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসে এটাই ছিল তাঁর বিরাট নতুনত্ব।"

বিবেকানন্দ মাসের পর মাস মিস ম্যাকলাউডের বাড়িতে থেকেছেন। তিনি দেখেছেন বৃষ্টির জন্যে বিবেকানন্দ দিনের পর দিন বেরুতে পারছেন না, ঘন্টার পর ঘন্টা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর নিজের সঙ্গে কথা

বলছেন, অপরের উপস্থিতি সম্পর্কে খেয়ালই নেই। কথা বলতে বলতে তিনি পালটে যাচ্ছেন পর্যায়ক্রমে জ্ঞানের দশায়, ভক্তির দশায়, কর্মের দশায়। বেশির ভাগ সময়েই তিনি ছিলেন কিশোরের মতো হাস্যচপল। তখন তাঁকে "ধর্মপ্রবণ লোক নন" বলায় তিনি একদিন উত্তরে বলেছিলেন: "আমিই ধর্ম"। ভারতের দুর্দশা, জগতের দুর্দশা মাঝে মাঝে তাঁকে এমন ভাবে বিদ্ধ করত যে তিনি গভীর ও নিঃশব্দ বেদনার ঘোরে পড়তেন। তাঁকে আত্মস্থ করা কঠিন হতো। "অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করতেন।" কিন্তু আবার এক আশ্চর্য নমনীয়তায় তিনি এক দশা থেকে অন্য দশায় চলে যেতে পারতেন। ঈশ্বরদর্শন সম্পর্কে আবেগদীপ্ত বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে শাদামাটা জিনিশের কথা বা কোনো রান্নার কথা বলে মিস ম্যাকলাউডকে লজ্জিত ও স্তম্ভিত করে দিতেন।

বিবেকানন্দের আহ্বানেই মিস ম্যাকলাউড ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে গিয়েছিলেন, তাঁর সম্মতিতেই ভারতে এসেছিলেন। ভারতে আসার অনুমতি চাইলে বিবেকানন্দ উত্তরে বলেছিলেন : "যদি দারিদ্র, অধঃপতন, নোংরামি, ঈশ্বরের কথা-বলা নেংটিপরা মানুষদের দেখতে চান, তাহলে আসুন! যদি অন্য কিছু চান, আসবেন না! কারণ আর একটা সমালোচনাও আমরা সইতে পারব না।" মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দের নিষেধবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। যখন বুঝতে পেরেছিলেন মনে সমালোচনা জাগছে, সরে গিয়েছিলেন।

মিস ম্যাকলাউড ভগিনী নিবেদিতাকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। লন্ডনেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কেন মেয়েকে বিবেকানন্দকে অনুসরণের সম্মতি দিয়েছিলেন, নিবেদিতার মা সেকথা একমাত্র মিস ম্যাকলাউডকেই বলেছিলেন। ভারতে প্রথম দিকে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে আট মাস ছিলেন। নিবেদিতা প্রথম প্রথম তর্ক করতেন। কিন্তু যখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন, চিরদিনের জন্যেই করেছিলেন। "প্রথম দিকে নিবেদিতা বিবেকানন্দের কাছ থেকে কঠোর ব্যবহার পেতেন। সমস্ত প্রকারে বিবেকানন্দ তাঁর গর্বিত ও যুক্তিবাদী ইংরেজ-চরিত্রটিকে নিচু করতেন। নিবেদিতা তাঁর প্রতি যে পূজারিণীর অনুরাগ (passion adoratrice) দেখাতেন সম্ভবত তার থেকেও নিজেকে বাঁচাতে চাইতেন।" এই প্রসঙ্গে

রলাঁ বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য করেছেন: ''কারণ মনে হয় তাঁর সম্পর্কে নিবেদিতার ছিল প্রেমিকের উপাসনা (culte adoratrice), আমাদের বান্ধবী মিস শ্লেড যা দেখাচ্ছেন গান্ধীর সম্পর্কে। কিন্তু গান্ধী ও মিস শ্লেডের মধ্যে ৩০ বছরের দূরত্ব; বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে মাত্র ৫ থেকে ৬ বছর। এবং নিবেদিতার মনোভাব চিরকাল নির্মল হলেও, বিবেকানন্দ তার মধ্যে বিপদের গন্ধ পেতেন।''[১৪] কোনো দিকে না-তাকিয়ে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভর্ৎসনা করতেন। নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের কাছে কাঁদতেন। অবশেষে বিবেকানন্দকে মৃদু ভর্ৎসনা করায়, তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন: তিনি ভাল করে ভেবে দেখবেন। তিনি ব্যবহার সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছিলেন, অনেক মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে অনুরাগ দেখানো হতো, ''তাকে আমল দেবার বা গান্ধীর মতো এক বাৎসল্যের দাক্ষিণ্যে তাকে দেখার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না।'' বিবেকানন্দের স্বভাবে প্রচন্ডতা ছিল। ক্রোধ হলে কোনে কিছুকেই ছাড় দিতেন না। মিস ম্যাকলাউডের মনে পড়ে না তারপর তিনি কখনো ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু অমায়িক ব্যবহারে তিনি তা শুধরে নেবার চেষ্টা করতেন। নিবেদিতার মধ্যে ছিল এক স্কুলমাষ্টারিসুলভ মনোবৃত্তি। অপরের ত্রুটিগুলো তিনি ধরে দিতেন, নিজের যুক্তিকে প্রমাণ করতেন। এজন্যে অনেকে তাঁকে ক্ষমা করেননি, যেমন করেননি মিস ম্যাকলাউডের আত্মীয় লর্ড স্যান্ডউইচ। নিবেদিতার বুদ্ধিমত্তা এবং অনুরক্তির মূল্য অনুধাবন করতে পারলেও, নিবেদিতার প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গতা উজাড় করে দিলেও, বিবেকানন্দ মূলত পছন্দ করতেন ভগিনী ক্রিস্টিনকে। ভগিনী ক্রিস্টিন ছিলেন তাঁর অনেক কাছাকাছি। বাহ্যত বেশি মননশীল মনে হলেও, ''ঈশ্বরত্বের বাহ্য রূপগুলো'' নিবেদিতার মন থেকে কম ঝরেছিল। তিনি অনায়াসে ভারতীয় সমস্ত ধর্মকৃত্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড দেখে অবাক হয়েছেন, প্রতিদিন দেবতা ও মৃতদের উদ্দেশে প্রাচীন ও অদ্ভুত নিবেদনকৃত্যে নিবেদিতার কোনো ঘাটতি ছিল না। বিবেকানন্দের মৃত্যুতিথিতে, তিনি যা যা খেতে ভালবাসতেন, তা সবই নিবেদন করা হতো, এমনকি চকোলেট-আইসক্রিম পর্যন্ত। বিবেকানন্দ নিজে এই কৃত্য অনুমোদন করতেন। মানুষের দুর্বলতার জন্যে তিনি এসব মেনে নিয়েছিলেন। বিধিবদ্ধ ও পুনরাবৃত্ত ভঙ্গিগুলো ছাড়া মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জীবন্ত চিহ্নগুলো মনে আনতে ও বজায় রাখতে অক্ষম। তিনি

বলতেন, "এ বাদ দিলে ওদের কাছে ওটা হবে শুধুই বুদ্ধির, শুকনো চিন্তার ব্যাপার, (আর তিনি কপালে হাত দিতেন)।"

মিস ম্যাকলাউড কাশ্মীরে বিবেকানন্দের সফরের দলে ছিলেন। চারটে পৃথক শিকারায় বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, মিসেস প্যাটারসন ও মিস ম্যাক্লাউড থাকতেন। খাবার সময় সবাই মিলতেন মিস ম্যাকলাউডের শিকারায়। এই সময়ে বিবেকানন্দ পনের দিন নির্জনে নিঃসঙ্গ কাটিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন "মায়ের" প্রত্যাদেশ পেয়ে, নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হয়ে।

মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দকে গানের সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গিতে দেখেছেন। তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়াতেন, লম্বা জোব্বা গোড়ালি পর্যন্ত পড়ত, পায়ে থাকত ঘুঙুর, নড়তেন কি নড়তেন না, বিনা ভঙ্গিতে দুই হাত ধীরে ধীরে নাড়াতেন। শুধু চোখে পড়ত দেহটি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে,—আর পায়ের ঘুঙুর কাঁপছে। রামকৃষ্ণের মতো সাজানো-গোছানো ও পারিপাট্যের চমৎকারবোধ বিবেকানন্দের ছিল না। নিজের ক্ষেত্রে তিনি আচারপ্রথা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, ইউরোপীয় বন্ধুদের ভোজে যেতেন, অন্যদের মতো মাংস পর্যন্ত খেতেন, খেতে খেতে গল্প করতেন।

মিস ম্যাকলাউডের কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন "পূর্ণ" (tout)। যার মনে যা ভালো লেগেছে, সে তাঁর কাছ থেকে তাই নিয়েছে। তিনি নিয়েছিলেন, "শক্তি" (l'énergie), তা তাঁর মঙ্গল করেছে। বিবেকানন্দ যে "পূর্ণ শক্তি" (toute énergie) একথা নিবেদিতা তাঁকে বললে, তিনি বলেছিলেন, বিবেকানন্দ হচ্ছেন "পরিপূর্ণ কোমলতা" (tout tendresse)। রলাঁর কাছে মিস ম্যাক্লাউড স্বীকার করেছিলেন, "মৃত্যুর পূর্বাহ্নে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তখনও তরুণ থাকলেও, এমন অনেক দিন এসেছে, যখন জীবনের ভারে তিনি চাইতেন না যে, জীবন দীর্ঘায়িত হোক। তাঁকে ভয়ংকর লড়তে হয়েছে। আমেরিকায়, ভারতে কতো ঈর্ষা কতো বিদ্বেষ। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল সনাতনীরা, অ-সনাতনীরা, ইংরেজ ও ভারতীয়রা। সেরা ভারতীয়দেরও ইংরেজরা অবজ্ঞার চোখে দেখত। তাঁদের সঙ্গে মিশলে দুর্নাম রটত। ভগিনী নিবেদিতা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। সনাতনীরা বলত, বিবেকানন্দ অহিন্দুদের মধ্যে পবিত্র বাণী প্রচার করেন এবং তাদের সঙ্গে খান। ইউরোপীয়রা বলত, তিনি মহিলাদের সঙ্গে খালি মাথায় এক টেবিলে বসে অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করেন। মিস

ম্যাকলাউড ছিলেন আমেরিকান। মার্কিন কনসাল-জেনারেল প্যাটারসনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। প্যাটারসনের স্ত্রী ছিলেন প্রথম দিকের বিবেকানন্দপন্থী। বিবেকানন্দের কাছাকাছি থাকার জন্যে ম্যাক্‌কিনলের কাছে তদ্বির করে স্বামীকে ভারতের মার্কিন কনসাল জেনারেল করিয়েছিলেন।

মিস ম্যাকলাউড স্বীকার করেননি যে, মৃত্যুর আগে বিবেকানন্দের মধ্যে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতে চাইতেন, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তা ছিল তাঁর ইচ্ছামৃত্যু, কারণ, তিনি মনে করেছিলেন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে।

ভিলন্যভের আলাপচারিতে বিবেকানন্দের ইংল্যান্ড সফর, রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কেও মিস ম্যাকলাউড অনেক তথ্য জানিয়েছিলেন, শিকাগোর ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর বিবেকানন্দের উৎসাহী ভক্তরা ছোটো একটি গোষ্ঠীতে মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে জন বারোর বেশি ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে দশ-এগারো জনই মহিলা। কিছু পরে আনা হয়েছিল স্টেনোগ্রাফার গুডউইনকে। পরে তিনি স্বামীজির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারতে আসার কিছু পরে এনট্রাইটিসে তিনি ছাব্বিশ বছরে মারা যান। তাঁর প্রতি বিবেকানন্দের পক্ষপাত অন্যতম শিষ্য রুশ ইহুদি লেয়ঁ ল্যান্ডসবার্গের (কৃপানন্দ) ঈর্ষা জাগিয়েছিল। অন্যতম ফরাসী শিষ্যা মারি লুইজ (অভয়ানন্দ) ভারতেও এসেছিলেন। হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজির সঙ্গে সুইট্‌জারল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিন, জন্মসূত্রে জার্মান মিস গ্রিনস্টেইড,—গুরুর মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে ভারতে এসে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয় বারের ইংল্যান্ড সফরে বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন সেরভিয়ের-দম্পতিকে। স্বামীজিকে অনুসরণ করতে মিস ম্যাকলাউড তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। বিবেকানন্দের আগে সেরভিয়েরের মৃত্যু হলেও মিসেস সেরভিয়ের তখনো পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

বিবেকানন্দের ফ্রান্স সফরের কথা বলতে গিয়ে মিস ম্যাকলাউড নিদারুণ বিরক্তি ভরে জুল বোয়ার নীচতার উল্লেখ করেছিলেন। বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করতে জুল বোয়া এমা কালভেকে উত্তেজিত করেছিলেন! কিন্তু এমা কালভে সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা নসাৎ করে মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দকে জানিয়েছিলেন, মর্যাদাবতী এমা কালভে জুল বোয়াকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন:

বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী, তাঁর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর মনকে আন্তরিকভাবে স্পর্শ করেছিল। ইউরোপে থাকা এবং মিশর হয়ে ভারতে ফেরার খরচ তিনিই দিয়েছিলেন। পের ইয়াস্যাঁতের ঘরকন্না বিবেকানন্দের মনে এক করুণ ছাপ রেখেছিল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে রম্যাঁ রলাঁ মন্তব্য করেছেন, "আমার হাসি পায় যে বিবেকানন্দ ফ্রান্সের এমন ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন; আমার দুঃখ হয় ত্বরার আতিশয্যের জন্যে, যে ত্বরা নিয়ে, এমন কি তলস্তয়ের সঙ্গে দেখা না-করেই তিনি এক ছুটে ইউরোপ পেরিয়ে গিয়েছিলেন।" সে সময়ে তলস্তয় ভারতীয় চিন্তাধারা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, ১৮৯৬ সালের পর থেকে বিবেকানন্দের লেখা পড়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তদের মতোই মিস ম্যাকলাউড রলাঁকে বলেছিলেন, প্রতিভাজাত তৎপরতায় বিবেকানন্দ বই "গিলতেন" (il dévorait), গোটাটা জানার জন্যে পাতাগুলো উলটে-পালটেই তৃপ্ত হতেন (se contentant de les feuilleter)। এ সম্পর্কে রলাঁর মন্তব্য : "আমার আশঙ্কা এইজন্যেই যেন ইউরোপীয় চিন্তার গভীরে তাঁর ঢোকা সম্ভব হয়নি। এবং এটা একটা বিশ্রি ফাঁক যে, (অন্যান্য অনেক এশিয়াবাসীর মতো) তলস্তয়ের মহান ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নাড়া না-খেয়েই তিনি ইউরোপ থেকে ফিরে যেতে পারলেন, মারা যেতে পারলেন![১৪]

রামকৃষ্ণমিশন সন্ন্যাসীদের এক বাহিনী সৃষ্টি করেছে। শুধু বেলুড়েই সন্ন্যাসীর সংখ্যা তিনশোর কাছাকাছি। তাঁরা বিবেকানন্দের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের অনেকে জীবিত আছেন। শ্রেষ্ঠ জীবনীকার সারদানন্দ থাকেন বেলুড়ে। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ। সম্ভবত অভেদানন্দ[১৫](?) আছেন হিমালয়ের অদ্বৈত আশ্রমে। "শিষ্যা নিবেদিতার তুল্য, দিব্য চেতনায় নিঃশেষিত, জরাজীর্ণ" ভগিনী ক্রিস্টিন আছেন সেখানে; তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র বৈজ্ঞানিক বশী সেন, সেখানেই তাঁর লেবরেটরি।

ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের প্রায় তিরিশটি মঠ, দুশো থেকে তিনশো চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়। কিন্তু সম্প্রদায়ে বাঙালীদেরই একচেটিয়াত্ব। সাধারণত মহামারীর সময় চিকিৎসালয় দিয়েই শুরু করা হয়, তারপর দেশের মাথাদের কাছে আবেদন করা হয় তা টিকিয়ে

রাখার জন্যে। একটু একটু করে চারধারে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় ও উপাসনালয়। গত বছর (১৯২৬) পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম সম্মেলনে বারো-জনের একটি পরিষদ গঠিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো, নিউইয়র্ক ও সানফ্রানসিস্কোতে মিশনের তিন-চারটি কেন্দ্র আছে। ইংল্যান্ডে কোনো কেন্দ্র নেই। তবু ইংল্যান্ড বিবেকানন্দের সবচেয়ে ঐকান্তিক বন্ধু ও বিশ্বস্ত শিষ্যদের যুগিয়েছে। কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে। আমেরিকার চেয়ে ইংল্যান্ডের মননশক্তির স্তর অনেক উঁচুতে। সেখানে বাণী পৌঁছে দিতে দরকার এমন জাতের সন্ন্যাসীদের, যাঁরা শুধু এক বিরল মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন না, তাঁরা হবেন তারই সঙ্গে অত্যন্ত শিক্ষিত এবং ইউরোপের উচ্চ মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সমর্থ। এমন সন্ন্যাসীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

তরুণতম সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী ওঙ্কারানন্দের প্রতি মিস ম্যাকলাউডের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অসাধারণ পন্ডিত, পরিষদের নির্বাচিত বারো জনের একজন। সারদানন্দের বিপুল কর্তৃত্ব। মিস ম্যাকলাউডের ভাষায় "তিনি জিব্রাল্টারের মতো শক্তিমান"।

রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবীকে মিস ম্যাকলাউড খুব ভালো করে জানতেন, পাঁচ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। "সারদাদেবী ছিলেন পুরোপুরি বিশিষ্টা রমণী, যে কোনো ব্যাপারেই ইউরোপীয় রমণীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এক হতে পারতেন এবং সরলতা, চারুত্ব, স্বাভাবিক মাধুর্য বজায় রাখতে পারতেন।"

আলোচনা হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অধিবিদ্যা নিয়েও। ভারতের সাধু সন্তদের আবেশ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সঙ্গে ইউরোপীয় নিকৃষ্ট অধিবিদ্যার কোনো মিল নেই। সে অধিবিদ্যাকে ভারতীয়রা অবজ্ঞা করেন নিকৃষ্ট বলে, অকেজো বলে, মিথ্যা বলে নয়। তাতে হয়তো অলৌকিক ব্যাপার ঘটানো যায়, কিন্তু সে সবই দিব্য ব্যাপারের বুজরুকদের আশ্রয়। "তাঁদের দিব্যের বিজ্ঞান যথার্থই এক পবিত্র উচ্চমার্গের বিজ্ঞান, মনের এক সুদীর্ঘ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে লাভ করা।" শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালনের প্রশ্নটি ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে এক মৌল প্রশ্ন। নিঃশ্বাসবায়ু এবং রক্তের ক্রমান্বয়িক যোগব্যায়ামের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরা ঈশ্বরদর্শনে পৌঁছুতে পারেন।

তাঁদের তত্ত্বানুসারে দেহের অভ্যন্তরে যৌনাঙ্গ থেকে মূর্ধা পর্যন্ত পাঁচটি রক্তকপাট (ecluses du sang) বা পদ্ম আছে। শেষ কপাটে পৌঁছুলে বুকের চামড়া লাল হয়ে ওঠে। সেটা ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ। রামকৃষ্ণ তাই বুক দেখতে চাইতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বুকও দেখেছিলেন। এইভাবেই সমাধির শেষ স্তরে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু এতে বিপদ আছে, রামকৃষ্ণ তাই তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে দিতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ছিলেন ব্যতিক্রম, আবেশ ছিল তাঁর নিত্যদশা। বিবেকানন্দ এ লাভ করেছেন কদাচিৎ,—জীবনে দুই কি তিন বার। তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তবে থিওসফি ও প্রেততত্ত্ববিশ্বাসীদের সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক ছিল। তিনি বলতেন : "যে টাকার পেছনে ছোটে সে ইতর। কিন্তু গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ আর প্রেততত্ত্বের পেছনে যে ছোটে সে ডবল ইতর। ওটা কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁতে নেই। নোংরা করে।" উইলিয়ম স্টিডের এই দিকে প্রবণতা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন।

মিস ম্যাকলাউড রলাঁকে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণই শিষ্যের নাম দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। (সেই কথাই লিখেছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়)। তাঁর পিতৃদত্ত নাম, ভাইদের পরিচয়ও তাঁকে দিয়েছিলেন। "শ্রীম" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে একজন শিক্ষক এবং সংসারী, "বাপমায়ের মনস্তাপ ঘটিয়ে" ছোটো ছোটো ছেলেকে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে যেতে উৎসাহিত করতেন, সে কথাও বাদ দেননি। এ কথাও বলেছিলেন যে, হিমালয়ে ভ্রমণের সময়ে বিচিত্রদর্শন এক ব্রাহ্মণকে দেখে পরিহাস করায় বিবেকানন্দ তাঁকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, তিনি জানিয়ে ছিলেন, বিবেকানন্দ যখন পওহারী-বাবার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন, তখন তিনি রামকৃষ্ণ ও পওহারী বাবার মধ্যে দুলছিলেন (hésitait encore)।

মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন, প্রথম বারেব আমেরিকা সফর বিবেকানন্দের মনে বিরাট আশা জাগিয়েছিল। আমেরিকার আপাত গণতান্ত্রিক সাম্য তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তার মধ্যে তিনি মহৎ আর শ্রেয়কেই শুধু দেখেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বারের সফরে তাঁর সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক দোষত্রুটি ও জাতিগত ঔদ্ধত্য তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি বলেছিলেন : "তাহলে, আমেরিকা সেও !.........এখন আর সে নয়, সে চীন বা রাশিয়া,—যে কাজটা সম্পূর্ণ করবে।" "কাজ" বলতে তিনি প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের দুই মিলিত দৌত্যের বাস্তব রূপায়ণের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।
জাপান-সফরের সময়ে মিস ম্যাকলাউডই ওকাকুরাকে বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলেও, সাক্ষাতের পরদিনই তাঁকে বলেছিলেন : "উনি আপনার জিনিশ নন। উনি আমাদের।" অত্যন্ত অভিভূত হয়ে আরও বলেছিলেন : "আমরা দুই ভাই, বিপরীততম দূরত্ব এসে মিলেছি।" কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁরা যার যার কাজে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মের মহিমা উপলব্ধি করলেও ওকাকুরা তার জন্যে নিজেকে তৈরি বলে মনে করেননি।

মিস ম্যাকলাউড বিশ্বাস করতেন: "প্রত্যক্ষভাবে ভারতকে না-জানলে, তার ভাষায় তার পরিবেশের আস্বাদ না-পেলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।" রামকৃষ্ণের এমন কোনো ফটো নেই যাতে তাঁর জীবন্ত প্রাণশক্তি, মধুর হাসি নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের মতো করে দেখানো হয়েছে। একমাত্র যে ফটোটি আছে, তাতে তিনি সমাধির অবস্থায় ছিলেন,—তা থেকেই এই হাঁ-করা মুখ, কিছুটা হাবাগোবা আর উদভ্রান্ত চেহারা (cet air un peu stupide et égaré), নীচের ঠোঁটটা বিকৃত, ফোলা। তিনি নিরন্তর ভাবের ঘোরে থাকতেন। "রোদে খড়ির দাগ-দেখা মুরগির ছানার মতোই" সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু অসাধারণত্ব এইখানেই যে, এই নিরন্তর আবেশে ঢলে-পড়ার সঙ্গে তাঁর প্রখর সাধারণ জ্ঞানের নিরন্তর ভারসাম্য রাখতে পারতেন। কোনো ইউরোপীয় যুক্তিবাদী এ মেনে নেবে না। ভারতীয়দের মধ্যে তাদের ধর্মীয় অতিলৌকিক দর্শনকে (vision) মূর্ত করে তোলার তীব্রতা ক্যাথলিক. বিশেষ করে প্রোটেস্টান্টদের অবাক করে। ভারতীয়রা ঈশ্বরকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা তাঁর কথা শোনে, তাঁকে বাস্তবের মতো স্পর্শ করে। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনি ঈশ্বরকে দেখেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : "তোকে যেমন দেখছি, তাঁকে তেমন দেখি। তবে আরও ভালো করে।"

অনেকের মতোই মিস ম্যাকলাউড বিশ্বাস করতেন, রামকৃষ্ণ ভারতের তিন হাজার বছরকে মূর্ত করেছেন এবং বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হয়েছে আগামী তিন হাজার বছর। তিনি সারদাদেবীকে বলেছিলেন : "আপনার

স্বামীর ভাগে পড়েছিল ভালো দিকটা, তাঁর নিজের লোকের মধ্যে ভারতে তিনি বয়ে এনেছেন কথামৃত; সেটা তাঁর কাছে ছিল পরিপূর্ণ আনন্দও। বিবেকানন্দের দৌত্য ছিল অনেক কষ্টকর। ভারতের চিন্তাকে তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে বিদেশে ও বিরূপ লোকদের মধ্যে।" উত্তরে তাঁকে সারদা দেবী বলেছিলেন: "ঠিকই তো, সে ছিল সকলের চেয়ে বড়ো। আমার স্বামী বলেছিলেন, তিনি দেহ আর সে মাথা।"

রলাঁ প্রশ্ন করেছিলেন, গান্ধীবাদ সম্পর্কে রামকৃষ্ণমিশন কী ধারণা পোষণ করেন? উত্তরে মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন, মিশন এসবের বাইরে, রাজনৈতিক কোনো কিছুর সঙ্গেই তার সংশ্রব নেই। মিশন শুধু ধর্ম ও সেবার ব্যাপারেই থাকে। ইংরেজ সরকার তার সেবামূলক কর্মকে সুনজরেই দেখে। একবার অবশ্য পরোক্ষ ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছিল যে, সন্ত্রাসবাদীরা মিশনের নামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তাই উদ্যোগী হয়ে মিস ম্যাকলাউড বড়ো লাটের কাছ থেকে মিশনের নামে একটা প্রশংসাপত্র এবং পাঁচশো টাকা দান আদায় করেছিলেন। মিশনের লক্ষ্য বর্তমান রাজনীতি ও কাজকর্মকে ছাড়িয়ে। আপ্রাণ চেষ্টা চলছে ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে। বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

মিস ম্যাকলাউড রলাঁকে বিবেকানন্দের ছাত্রাবস্থার একটি ফটো দেখিয়েছিলেন। সে ফটো মোটাসোটা হাসিখুশি এক তরুণের। গায়ের রং সম্পর্কে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁর গায়ের রং কম ফরসা; কিন্তু খুব ময়লাও নয়। সাজানো-গোছানো পারিপাট্যের এক চমৎকার বোধ ছিল রামকৃষ্ণের, যা বিবেকানন্দের মোটেই ছিল না।

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের আলাপচারি হয়েছিল ১৭ মে পর্যন্ত। সেখান থেকে তিনি গিয়েছিলেন মঁপেলিয়ের-এ প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে দেখা করতে এবং ব্রতাগ্রেয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে খুঁজে বের করতে। মিস ম্যাকলাউড ধনগোপালকে খুব ভালো করে জানতেন এবং তাঁর প্রতি গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু এক মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। পরে তাঁর স্ত্রীকে দেখে তাঁকে উচ্চস্তরের মনে হয়েছিল। ধনগোপাল প্রথম দিকে ছিলেন শঙ্করমতের অদ্বৈতবাদী, বিবেকানন্দের প্রতি আগ্রহ ছিল না। মিস ম্যাকলাউডই তাঁকে বিবেকানন্দের অনুবর্তী হয়ে উঠতে

উৎসাহিত করেছিলেন। রলাঁ ও মিস ম্যাকলাউডের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল এলোমেলো, এলোমেলো ভাবেই রলাঁ তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিদায়ের পর রলাঁ দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন :

> ভদ্রমহিলা সৎ সরল এবং খাঁটি। বিচারবিবেচনায় তিনি যদি ভাসাভাসাও হয়ে থাকেন, নিজেকে বিচার করেন আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনি স্বাধীন,—এমন কি যাদের ভালোবাসেন তাদের স্বাধীনতাকেও সম্মান করতে জানেন। বিবেকানন্দকে তিনি অনেক ভালোবেসেছিলেন। সেই স্মৃতি তাঁকে চিরস্থায়ী যে আনন্দ দিয়েছে তাতেই তিনি বেঁচে আছেন। আর সেই ভালোবাসা, সেই স্মৃতি, সেই আনন্দ স্বার্থশূন্য। নিজের পথে যে আলোর সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তা ধরে রাখতে এবং তা ছাড়িয়ে দিতে ভালোবাসেন। তিনি সেই পতঙ্গের মতো, মধু খেয়ে যারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে নবজন্মের পরাগ বয়ে নিয়ে যায়।[১৬]

জুন মাসের শেষ দিকে ফ্রান্স থেকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের একটি চিঠি পেয়েছিলেন রম্যাঁ রলাঁ। তিনি এমা কালভের সঙ্গে দেখা করেছিলেন দুজনের বিবেকানন্দের স্মৃতি মিলিয়ে দেখতে। ভিলন্যাভের আলোচনার সূত্র ধরে তিনি তলস্তয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। এমা কালভের স্মৃতিতে বিবেকানন্দ অম্লান হয়ে আছেন। কনস্ট্যান্টিনোপলে বিবেকানন্দকে তিনি তলস্তয় প্রসঙ্গে পের ইয়াস্যাঁৎকে সশ্রদ্ধভাবে বলতে শুনেছিলেন, পের ইয়াস্যাঁৎ কিন্তুভাব দেখিয়ে বলেছিলেন : "তলস্তয়ের ধর্মে বুনিয়াদ নেই।" বিবেকানন্দ নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মিষ্ট স্বরে বলেছিলেন : "আমাদের কারো ধর্মেই কি বুনিয়াদ আছে?" মিস ম্যাকলাউডকে রলাঁ বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সাংগীতিক পরিভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল না, তিনি শুধু বলেছিলেন : "উত্তপ্ত, মর্মস্পর্শী, যতো কণ্ঠস্বর শুনে থাকব—সকলের চেয়ে সুন্দর (chaude, émouvante, la plus belle voix qu j'aie entendue)।" এ বিচারে এমা কালভেই উপযুক্ত। তিনি বলেছিলেন, বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল "এক বিস্ময়কর পুরুষালি উদাত্ত, তার স্পন্দন ছিল চীনা ঝাঁঝের মতো (un admirable baryton, qui avait des virbrations de gong chinois)"।[১৭]

তিন

ইউরোপের যুক্তিবাদী পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে উপস্থিত করার প্রবল বাসনায় রম্যাঁ রলাঁ যখন বিপুল তথ্য আয়ত্ত করতে মনঃসংযোগ করেছিলেন, তখন সবেমাত্র তাঁর *মের্ এ ফিস্* উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, *বেঠোফেন*-এর সমাপ্তির কাজ চলছে; তাঁর স্বাস্থ্যও প্রতিকূলতা করছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত যে সাহিত্য তাঁকে রামকৃষ্ণমিশন পাঠিয়েছিল, তার সবটাই ছিল ইংরেজী ও বাংলা ভাষায়,—যে দুটি ভাষাই তাঁর অজানা। তাই সব কিছু তাঁকে আয়ত্ত করতে হচ্ছিল বোন মাদলেনের সহায়তায়। মাদলেন রলাঁ অক্সফোর্ডের ছাত্রী ছিলেন, ইংরেজীতে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল, বাংলার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। আর, এইভাবে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গভীরে অনুপ্রবেশের যে-প্রচেষ্টা করে চলেছিলেন তাকে দুঃসাধ্য বলতে বাধা নেই।

এই একই পদ্ধতিতে তিনি গান্ধীজির জীবনী লিখলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর সমস্যা ছিল গুরুতর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের,—বিশেষ করে রামকৃষ্ণের, জীবন এমনই নির্ভেজাল ভারতীয়, এমনই প্রাকৃত ও দেশজ, যা ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার একেবারে বহির্ভূত। মাইকেল এঞ্জেলো, তলস্তয়, বেঠোফেনের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল রলাঁর ইউরোপীয় সংস্কারের অঙ্গীভূত। *মহাত্মা গান্ধী*-তে তিনি গান্ধীর জীবনে অহিংসাতত্ত্বের ফলিত দিকটিকেই বিচার্য করেছিলেন, তাই ভারতীয় জীবনের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা তেমন বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশ, পরিমন্ডল, তার ভূগোল, প্রকৃতি, তার দেশজ প্রাকৃত জীবনকে অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত করে তুলতে না-পারলে যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত উপলব্ধিই সম্ভব নয়, তা তিনি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে-জীবনী রলাঁর হাতে এসেছিল, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও, তা ছিল একান্তভাবে ভারতীয় ভাবনায় ভাবিত ভারতীয়দের লেখা, ইউরোপীয় মনের কাছে তার আবেদন সীমাবদ্ধ। এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আলাপচারিতে। জন্মসূত্রে ভারতীয় সংস্কারের অধিকারী হয়েও ধনগোপাল পশ্চিমী মানসিকতায় অভ্যস্ত ছিলেন।

ত্রুটি-বিচ্যুতি, কাল্পনিকতার ঊর্ধ্ববিহার সত্ত্বেও তাঁর *দা ফেস অব সাইলেন্স* গ্রন্থের রামকৃষ্ণ ও তৎসংক্রান্ত বিচিত্র পরিবেশ, বর্ণাঢ্য পরিমন্ডল রলাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং রামকৃষ্ণের উপলব্ধির পথে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিল। মিস ম্যাকলাউড ছিলেন জন্মসূত্রে পশ্চিমী এবং মুক্ত মানসিকতার অধিকারিণী, কিন্তু বিবেকানন্দের সাহচর্যে, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকালের অতি-ঘনিষ্ঠতায়, ভারতীয় সংস্কার ও মানসিকতার বিপুল অভিজ্ঞতার ভান্ডার। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতে রলাঁ কেবল দিব্যত্বের সন্ধানী বিশিষ্ট ভারতীয় সনাতন অথচ অতি-সক্রিয় মানসিকতারই পরিচয় পাননি, প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের বহুমাত্রিক চরিত্রের বলিষ্ঠ রেখাচিত্রটি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁর গভীর আগ্রহে রামকৃষ্ণমিশন স্বভাবতই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক পত্রালাপ শুরু করেছিলেন মায়াবতী থেকে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ। মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে মিশনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। রলাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলোচনার পক্ষ কালের মধ্যেই (৩ মে) রলাঁকে পত্র লিখেছিলেন স্বামী অশোকানন্দ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে রলাঁর নিজস্ব মতামত কী? তাঁর আগ্রহের প্রেরণা কী?

অশোকানন্দের প্রশ্নের উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (২৬ জুন), বছর খানেক আগে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি "প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের মহৎ হৃদয়টি" উদঘাটিত করেছিল এবং "সেই আলোর রেখাই" তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে তাঁর জীবন ও চিন্তাকে জানতে। মিশনের পাঠানো বই ও পত্রিকার সংখ্যাগুলো তিনি বোনের সঙ্গে কয়েক মাস ধরে পড়েছেন, গতমাসে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে দিনের পর দিন বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চোখে "যেন আত্মিক শক্তির এক জ্বলন্ত উৎস এবং রামকৃষ্ণ প্রেমের এক প্রবাহিনী। তাঁরা দুজনে ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন বিকিরণ করেছেন। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাধর। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রতিভার ঊর্ধ্বে।"

> আমি তাঁদের উদ্দেশে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করতে চাই, যে গ্রন্থ পাশ্চাত্যের বহুজনের কাছে তাঁদের চেনাবে। কাজটা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের সমৃদ্ধ চিন্তায় বহুবিধ উপাদানের ভিড়; পাশ্চাত্যের বুদ্ধি (এমন

কি হৃদয়) যে শৃঙ্খলাবোধের দাবি করে, সে দিক থেকে এই চিন্তার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে বলে মনে করা হয় না। এই উপাদানগুলোর একটি অংশ বিশিষ্টরূপে ভারতীয়। অন্য অংশ বিশ্বজনীন। এবং শেষেরটিকেই আলাদা করতে হবে।—ইউরোপীয় মগজে কিছু কিছু কথার যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হবে এবং ক্রিয়ার যে-ফলাফল উদ্ভূত হতে পারে, তাদের কথা আমাকে সব সময়ই ভাবতে হবে। কারণ ইউরোপীয়দের কাছে সবটাই ক্রিয়া বা ক্রিয়া হতে হবে।—

এখানে একটা বিপদ আছে; শ্রীরামকৃষ্ণের ও সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা বিশিষ্টরূপে ছাঁচ অনুযায়ী গড়ার উপযোগী (plastique) এবং যাদের সামনে উপস্থিত হয়, প্রায়ই তাদের বিচিত্র হৃদয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। (রামকৃষ্ণ করেন প্রেমের সহজাত সংস্কারের (instinct) বলে, যা কিছু দেখে তাতেই যে-সহজাত সংস্কার নিজেকে পরিবর্তিত করে; আর বিবেকানন্দ করেন আবেগদীপ্ত প্রতিক্রিয়ার বলে, যে-প্রতিক্রিয়া মনকে কাদামাটির মতো গড়ে তুলতে ও আকার দিতে চায়;) এই চিন্তা নিজেকে প্রকাশ করে অতি-বহু-অর্থে (en des sens très multiples)এবং সময়ে সময়ে তাদের মনে হয় (কার্যত) পরস্পরবিরোধী।[১]

রলাঁ আরও লিখেছেন, ইউরোপ এবং গোটা পৃথিবী আগের চেয়েও এক প্রচন্ড সামাজিক ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক পথের নির্দেশ চাইছে। "যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, স্পষ্ট, সহজ নির্দেশ তাদের দিতে হবে এবং তার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না।.......যে-পথ ধরে মানুষকে এগুতে হবে, সেই পথ যে-রশ্মি আলোকিত করছে—সেই রশ্মিকে সত্যের সূর্য থেকে পরিস্রুত হতে দেওয়া প্রয়োজন।" রলাঁর দৃঢ়বিশ্বাস বিবেকানন্দ যদি এর মধ্যে দিয়ে যেতেন, তাহলে এটি প্রবলভাবে অনুভব করতেন।

এই চিঠিতেই রলাঁ অশোকানন্দকে জানিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর বোন ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরিচিত হতে, যোগাযোগ করতে চান। তাঁদের মনে হয়েছে, খুব কমই মন তাঁর মতো বিবেকানন্দের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। এছাড়া তাঁরা কৌতূহলী হয়েছেন জগদীশচন্দ্রের ছাত্র পন্ডিত বশী সেন সম্পর্কে। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা জানতে চান বিজ্ঞান সম্পর্কে

বিবেকানন্দের চিন্তা কী ছিল। রলাঁর অনুমান: "তাঁর চিন্তায় ছিল বিজ্ঞান ঈশ্বরের অন্যতম পথ। এবং ঠিক ঠিক এরই মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিমুখে পশ্চিম এগিয়ে যাবে, যদি এ ভালোভাবে পরিচালিত হয়।" এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের যদি নিজের মুখে বলার সুযোগ হয়ে থাকে, তবে তা জানতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন। রলাঁ চিঠি শেষ করেছিলেন এই কথা বলে : "আমি আপনাদের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করি সেই দিব্য ঐক্যের জ্বলন্ত স্পর্শের মধ্যে, রামকৃষ্ণ ছিলেন মানুষের রূপে যার পরম সংগীত (Cantique des cantiques)।"

স্বামী অশোকানন্দকে চিঠি লেখার প্রায় পক্ষ কালের মধ্যে রলাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। তিন বছর আগেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রলাঁর চিঠির মাধ্যমে (২০ জুন ১৯২৪) হার্দ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[২] সাক্ষাতের জন্যে দুজনেই আগ্রহী ও উৎসুক ছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর অষ্টম ইউরোপ অভিযানে ১৯২৭ সালের ৯ জুলাই উপস্থিত হয়েছিলেন ভিলন্যভে। সাক্ষাৎ দর্শনে ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতে রলাঁ যে কতখানি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন তার উদ্দীপ্ত বর্ণনা আছে তাঁর দিনপঞ্জীতে।[৩] বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা জানার জন্যে তিনি বশী সেনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা জানার কিছু সুযোগ ঘটে গিয়েছিল বশী সেনের বিজ্ঞানগুরু জগদীশচন্দ্রের মুখ থেকেই। জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দকে খুব ভালো করে জানতেন। রামকৃষ্ণকে তিনি দেখেছেন কিন্তু সত্যিকারের জানাশোনা ছিল না। বিবেকানন্দকে জগদীশচন্দ্র ভালোবাসতেন। বিবেকানন্দ একসময় তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবল বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদকে দেখাবার জন্যে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের সকলের মতোই জগদীশচন্দ্র রলাঁকে জীবন ও বুদ্ধিতে উপচে-ওঠা তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহিনী শক্তির বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে গড়ে-ওঠার আগেই সেই ব্যক্তিত্বের বড়ো তাড়াতাড়ি ইতি ঘটেছিল। রলাঁ লক্ষ করেছিলেন ভারতীয় অলৌকিক ক্রিয়াসাধক হঠযোগী ইত্যাদি যারা বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের মতো যুক্তির সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির কঠোর সংযমকে মোটেই সংশ্লিষ্ট করে না, তাদের সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রেরও গভীরতম অবজ্ঞা; থিওসফিস্টদের মনের অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি

ও অলসতা সম্পর্কে করুণমিশ্রিত তাচ্ছিল্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ার পর জগদীশচন্দ্রের কথা শুনে রলাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, "ভারতীয় ধর্মীয় মহৎ স্বতঃলব্ধ বোধের (intuition, যা সমাধি পর্যন্ত যেতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে সব সময়ই যুক্তির নিয়ন্ত্রণ; এবং সাময়িক হলেও, যা- কিছু যুক্তির বিসর্জন ঘটায়, তার প্রতিই তার বিতৃষ্ণা।" রলাঁ লিখেছিলেন:

> কিন্তু কেমন করে একই সঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছ যুক্তি ও আন্তর দর্শনকে মেলান, তা এমন এক বিজ্ঞান, যা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইউরোপীয়রাও মোটেই অনুমান করতে পারেন না।—(লক্ষণীয় এই যে, দেহের একাংশ বা গোটা দেহে সংবেদনশীলতার প্রণালীগুলো (cannaux) নিজের ইচ্ছে মতো খোলা বা বন্ধ করার জন্যে যে ক্ষমতা মন আয়ত্ব করতে পারে, যা মনকে আয়ত্ত করতে হয়,—সেই ক্ষমতার কথা জগদীশচন্দ্র আমাদের এক মুহূর্তে বলে দিলেন।)

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েকদিন পরে, উত্তরের আগেই, রলাঁ আবার চিঠি লিখেছিলেন স্বামী অশোকানন্দকে (১৩ জুলাই)।[৪] তাতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপদ্ধতি, প্রকৃত অবস্থা ও প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। তখন রলাঁর প্রয়োজন দলিলগত প্রমাণ। প্রতি সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বইয়ের পাঠ বোনের মুখে শুনে শুনে তিনি প্রচুর নোট করছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কাজটা সুন্দর হলেও, খুবই বড়ো। একে আয়ত্ত করাই কঠিন। বিশেষ করে কঠিন ইউরোপীয়দের জন্যে সংক্ষিপ্ত করা। ইউরোপের "একদল ঐতিহাসিক কেবল পুথির মধ্যে ডুবে থাকে; তারা কেবল যিশুর দেবত্বই অস্বীকার করে না, তাঁর অস্তিত্বের সম্ভাবনাই অস্বীকার করে, অস্বীকার করে এক নর-দেবতার অস্তিত্বকে বা এক মহান দেহধারীর আন্তরিক, স্বাভাবিক (এবং ন্যায়সঙ্গত) দেবত্বারোপকে। এই পুথির পোকাগুলো অনুমানও করতে পারে না, আজকের জগতে কী চলছে। ওরা দেবতাদের সরিয়ে দিচ্ছে, আর অতীতের দেবতাদের প্রতি খড়্গহস্ত। ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত।" রলাঁ ঠিক করেছিলেন তাঁর লেখা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম দেবেন *জীবন্ত দেবতারা* (Les Dieux vivants) এবং সে কথাটি স্বামী অশোকানন্দকে জানিয়েছিলেন।[৫]

সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে গ্লাঁ-তে (Gland) অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সম্মেলন। তাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রম্যাঁ রলাঁও, তাঁর নামও ঘোষিত হয়েছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ সম্মেলনের অন্যতম বক্তা ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর বক্তৃতা শোনার এবং সঙ্গলাভের আকর্ষণ ছিল অতি প্রবল। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতাটি ছিল সাধারণ আলোচ্য বিষয়বস্তুর বাইরে। আলোচ্য সাধারণবিষয় ছিল, শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় জাতিগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে। জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় ও প্রজেকশানের মধ্যে দিয়ে উদ্ভিদের গোপন স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রাণসঞ্চালন-পথ হাতে-কলমে প্রমাণ করে ঘোষণা করেছিলেন, শুধু মানবীয় ঐক্য নয়, প্রাণজগতের ঐক্যের কথা। তিনি স্বীকার করেছিলেন, প্রাণের শাশ্বত ঐক্যের ভারতীয় বিশ্বাসই তাঁর তিরিশ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা, "তাঁর গোপন যাত্রারম্ভের বিন্দু এবং তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত"।

মাসখানেক আগে রলাঁর সঙ্গে আলাপচারিতে এই কথাই বলেছিলেন জগদীশচন্দ্র। রলাঁ লিখেছিলেন : "তিনি ভারতীয় ভাবে ধর্মপ্রবণ, এবং তা তিনি মোটেই গোপন করেন না। তিনি নিঃসন্দেহ যে, জীবন এক এবং গতিশীল। আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব অথবা অজৈব (বলে কথিত) পদার্থের মধ্যে দিয়ে এক রূপ থেকে অন্য রূপে আমাদের নিয়ে যায়। পরিণামে তিনি সমস্ত অস্তিত্বই অঙ্গীভূত করেছেন।.........তারই ফলস্বরূপ মানবতার ঐক্য তাঁর কাছে একটা চোখে-দেখা জিনিশ।" মানুষের বাইরেও যে আবেগময় জীবন আছে, তাঁর সেই আবিষ্কারের কথা শুনে লর্ড কেলভিন বলেছিলেন : ".......এটা ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব, তিনি চেয়েছেন মানুষকে বিশেষ অধিকার দিতে।" জগদীশচন্দ্রের মতে, ঈশ্বরকে গন্ডিবদ্ধ করাটাই তো শ্রদ্ধার অভাব।

এই সম্মেলনে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল "খুব চটকাদারি এবং কিছুটা ভাসাভাসা।" ধনগোপাল সম্মেলনেই রলাঁকে জানিয়েছিলেন যে, স্বামী সারদানন্দ সদ্য প্রয়াত হয়েছেন (১৯ অগাস্ট)। রামকৃষ্ণের তখনো জীবিত প্রত্যক্ষ শিষ্য হচ্ছেন স্বামী শিবানন্দ। তিনি এখন বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট, বয়স সত্তর বছর। তাই

তাঁর কাছে জিজ্ঞাসার কিছু থাকলে বেশি দেরি করা চলবে না। রলাঁ সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শিবানন্দকে চিঠি লিখতে মনস্থ করেছিলেন।

রলাঁর চিঠি পাবার আগেই অবশ্য শিবানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম আগ্রহের কথা জেনেছিলেন। বেলুড় মঠ থেকে এক চিঠিতে (২১ সেপ্টেম্বর) মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছিলেন :

> ......অশোকানন্দকে লেখা রম্যাঁ রলাঁর অনূদিত চিঠিটি পড়ে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত। পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারীকে ঠাকুর এবং স্বামীজির মহত্ত্ব সম্পর্কে প্রভাবিত করতে তুমি যে কী গভীর ও যথার্থ ভাবে সাফল্য লাভ করেছ, তা জানাটাও রোমাঞ্চকর; বিশেষ করে তোমার অনুশীলন ও আদর্শ অনুসরণেই জগৎ বর্তমান বিশৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে আসার একটা সূত্রের সন্ধান পেতে পারে। মনে রেখো, এই কাজের জন্যেই স্বামীজি তোমাকে এখনো এ জগতে রেখে গেছেন এবং মহৎ মানুষের সন্ধানে তোমাকে দিয়ে দুনিয়া চুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।[৬]

রম্যাঁ রলাঁর ১৩ জুলাইয়ের চিঠির উত্তর দিতে স্বামী অশোকানন্দের কিছুটা দেরি হয়েছিল (১১ সেপ্টেম্বর)।[৭] স্বামী অশোকানন্দ চিঠির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তথ্য সম্বলিত একটি দীর্ঘ বিবরণ পাঠিয়েছিলেন, রলাঁ সেই বিবরণটিকে তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

রলাঁর প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীতে রামকৃষ্ণমিশনের কার্যকর প্রভাব কী?—উত্তরে অশোকানন্দ লিখেছিলেন: এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেওয়া কঠিন। সেটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে এই কারণে যে, তাঁরা বিশেষ কোনো তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন না, তাঁদের মতামত কোনো ক্রমেই সাম্প্রদায়িক নয়, সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের সমস্ত সত্যের অনুমোদন (The endorsement of all the truths of all creeds)। যখন কোনো ধর্মীয় দল কোনো অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তখন সহজেই তার প্রভাবের হিশেব করতে পারে অন্য সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থেকে তার প্রভাবের সীমানা নির্দিষ্ট হতে দেখে। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তাঁরা সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি সমেত (in all its aspects) হিন্দুধর্মের সমর্থক। হিন্দুধর্ম সমস্ত ধর্মের সংশ্লেষ। তাঁরা বেদান্তের সমর্থক, যে-বেদান্ত সমস্ত

হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। বৈদান্তিক ভাবনা নিশ্চিতভাবে পৃথিবীতে কমবেশি মাত্রায় ছড়িয়েছে এবং এখনো ছড়াচ্ছে। কিন্তু অসম্ভব না-হলেও, একথা বলা কঠিন যে, তার কতোখানি স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর মিশনের প্রচারের ফলে। অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্তত আংশিকভাবে তা তাঁদের মিশনের কারণেই। যে বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদান্তিক ধারণা পশ্চিমে এবং ভারতের বাইরে প্রবাহিত ও বিস্তৃত হয়েছে তারা হচ্ছে: ১) পাশ্চাত্যের সংস্কৃতবিদেরা; ২) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকে পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণমিশন; ৩) রবীন্দ্রনাথ ও থিওসফি সমেত পরবর্তী উপদেষ্টারা এবং সাহিত্য; ৪) ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে বৈদান্তিক ধারণার স্বাধীন বিকাশ। বৈদান্তিক ধারণা বলতে প্রধানত দুটি : ১) মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যত্ব; মানুষের মধ্যেই দিব্য সুপ্ত আছে, মানুষ অনন্ত গুণের ও শক্তির অধিকারী; তাই মানুষের সঙ্গে সমাজ রাষ্ট্র বা ধর্মের আচরণের ভিত্তি হবে মানুষের অন্তরে সুপ্ত দিব্যত্ব ও সর্বশক্তিময়তার স্বীকৃতির উপরে। (on the recognition of his inner potential Divinity and Omnipotence)। ২) জীবনের চরম মূল্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক; মানুষের সমস্ত কিছুকে ফলপ্রসূ করতে, এই চরম আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে হবে। এর পরেই অশোকানন্দ লিখেছেন :

> বৈদান্তিক শিক্ষার এই হচ্ছে মুখ্য বৈশিষ্ট্য। একথা বলা চলে না যে, পশ্চিম এগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু আমি একথা ভাবতে রাজী আছি যে এগুলো, বিশেষ করে প্রথমটি ,সবসময়ই তার অবচেতন মনে আছে। কোথা থেকে সে এই ধারণাগুলো পেয়েছে? আমি মনে করি না, খ্রিষ্টধর্ম বা গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি এগুলোর পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুকূল। আমি মনে করি, প্রথম ধাপে, শিল্পগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রগতি, পশ্চিমকে এই সব ধারণার অভিমুখে ঠেলে নিয়ে গেছে, এবং সে ব্যাপারে সে সাহায্য পেয়েছে পশ্চিমী ভারতত্ত্ববিদদের ছড়ানো ভারতীয় সংস্কৃতির। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দের বহু পশ্চিমী লেখকের চিন্তায় বৈদান্তিক প্রভাব আছে। পরবর্তী ধাপগুলোয় আমি নিশ্চিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর সন্ন্যাসীরা এবং তাঁদের রচনাবলি বেশ কিছু পেরেছে।

স্বামী শিবানন্দকে রলাঁ চিঠি লিখেছিলেন ১২ সেপ্টেম্বর। তিনি লিখেছিলেন: পশ্চিমের কাছে তিনি রামকৃষ্ণের প্রেম ও আলোকের দিব্য উৎসকে পরিচিত করাতে চান। "সমস্ত ধর্মমতের সমন্বিত ঐক্যের এই উদ্‌ঘাটনের চেয়ে, যিনি সমস্ত জীবন্ত সত্তার সত্তা—বহুরূপী অথচ যিনি রূপহীন—সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সংবাদের চেয়ে, আমাদের কালের মানবতার আর কোনো কিছুই এতো জরুরি নয়।" কিন্তু পশ্চিমের কোনো গ্রন্থে রামকৃষ্ণের মতো মূলগতভাবে ভারতীয় কোনো ব্যক্তিত্বকে স্থানান্তরিত করাটা একটা সূক্ষ্ম কাজ। রামকৃষ্ণের কিছু কিছু ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ইউরোপীয় পাঠকের কাছে অবোধ্য মনে হবে। তার ফলে তাঁর জীবন ও চিন্তার অতি অপরিহার্য গুণাবলি ঢাকা পড়ে যাবার বিপদাশঙ্কা থেকে যাবে। এবং সেইজন্যে তিনি ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন, তিনি অপেক্ষা করছেন, যতোদিন না তাঁর নিজের মধ্যে, যা তিনি লিখতে চান, তার জীবন্ত ও সত্য সমন্বয় দেখা দেয়। এই অতি-অসাধারণ মানুষটিকে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ একজন। অতি-মননশীল বর্তমান যুগের একটি প্রবণতা হচ্ছে ইতিহাসের সমস্ত অতি-মানবিক ব্যক্তিত্বগুলোর মানবীয় অস্তিত্বেই (human existence) সন্দেহ করা। তাঁরা যেসব মহিমান্বিত আদর্শের মশাল, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভান করলেও, তাদের মধ্যে দেখে কোনো জাতি বা কোনো যুগের কেবল প্রতীক; যিশু বা বুদ্ধের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এমন লোকদেরও দেখা যায়। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারা যদি তাঁর জীবনের প্রমাণ লিখিতভাবে পৃথিবীতে না-রেখে যান, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও এটা ঘটতে দেরি হবে না। রলাঁ তাই স্বামী শিবানন্দের প্রত্যক্ষ প্রামাণিক তথ্য চান, যা ইউরোপীয় পাঠকের সামনে হাজির করতে পারেন। পরিশেষে তিনি লিখেছিলেন :

> একটি গুরুতর প্রশ্নে আপনার আলোকসম্পাত প্রার্থনা করছি। প্রশ্নটি হচ্ছে : রামকৃষ্ণের যন্ত্রণার সমস্যা। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে "সেবার" প্রশ্ন সম্পর্কে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়েছি (পড়ে শুনিয়েছে আমার বোন)। তাতে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, কেবল গুরুর মতবাদ থেকে,—"সমস্ত মানুষের মধ্যে দিব্যের প্রতি তাঁর ভক্তি থেকে,"—তাঁর মহান শিষ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, তবু

> বিবেকানন্দের মধ্যে আরও অপরিহার্য যা ছিল তা হচ্ছে, বিশ্বজনীন যন্ত্রণা সম্পর্কে—এবং যে অশুভের (mal) বিরুদ্ধে লড়তে হবে বা সান্ত্বনা দিতে হবে তার সম্পর্কে—বেদনাকরুণ ও বীরোচিত এক আচ্ছন্নতা বোধ (obsession); যা রামকৃষ্ণকে এক পরমানন্দে, অনন্তে বিশ্বাসের এক হাসিতে পূর্ণ করে রাখত, সেই বিশ্বজনীন দিব্য দর্শন থেকে এটা কি যথেষ্ট স্বতন্ত্র এক কেন্দ্রীয় (central) বোধ নয়? প্রকৃতি ও সমাজের নিষ্ঠুর অবিচার সম্পর্কে, হতভাগ্য, অত্যাচারিত, নির্যাতিতদের সম্পর্কে—তাঁর মনোভাব কী ছিল? তিনি কি তাদের ভালোবেসেই তৃপ্ত ছিলেন? তিনি কি তাদের সাহায্য করতে চাইতেন না? কিংবা এই কর্মে তাঁর মহান শিষ্য বিবেকানন্দকে কি তিনি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করেন নি?[৮]

রলাঁ স্বামী অশোকানন্দের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ৪ অক্টোবর। চিঠিতে রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর লেখার কাজ এখনো শুরু হয়নি, এমন কি প্রারম্ভিক খসড়া পর্যন্ত হয়নি। এক বছর ধরে তিনি অপরিহার্য তথ্যাদি সংগ্রহ করে চলেছেন; কিন্তু তাঁর নিজস্ব কর্ম পদ্ধতি অনুসারে, সব কিছু জ্বলে-ওঠার আগে তিনি "আগুনকে ছাই চাপা" দিয়ে রাখেন। এ রকম বিরাট একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত কিছু ধারণা জড়ো করাটা কঠিন হবে না; প্রয়োজন হচ্ছে, নীরবে এইসব নিয়ে নিজেকে চিন্তা করতে দেওয়া। তিনি আশা করেন, সামনের শীতে এই কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারবেন। *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর সংখ্যাগুলো থেকে তাঁরা দুজনেই খুব উপকৃত, মিশন সম্পর্কে *General Report* তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই তাঁদের কাছে আছে। কিন্তু তাঁদের প্রয়োজন বিবেকানন্দের *জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, মাই মাষ্টার, মেসোয়ার্স অব ইউরোপিয়ান ট্রাভেলস* গ্রন্থ ক'টি। তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে গ্রন্থগুলো পাঠান। কিন্তু এই চিঠিতে রলাঁ পশ্চিমে বেদান্তের প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে স্বামী অশোকানন্দকে নিজের অভিমত জানিয়ে লিখেছিলেন :

> এটা তর্কাতীত যে, বৈদান্তিক ধারণা এবং পশ্চিমে দেখা-দেওয়া অনেক-

ধারণা ও প্রবণতার মধ্যে একটা সম্পর্ক নিজেকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। কিন্তু আমি মনে করি না যে, এটা (যে-ভাবেই হোক, তাদের বেশির ভাগের ক্ষেত্রে) বৈদান্তিক ধারণার আধুনিক প্রচারের ফলে। আসলে, এই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে মানব-স্বভাবের, সর্বোপরি মহান ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অভিন্ন ভিত্তির উপরে। *আর্য* নামে ভাষাগুলোয় (এবং তার ফলে, চিন্তায়) ঐক্যস্থাপন করে যে-সব মিল, তারা যাই হোক না কেন, এই সব মিলকে দূর অতীতকালে খুঁজে পাওয়া যাবে। পাসকাল তাঁর *পাঁসে-য়* এই সুন্দর কথা বলেছেন.......,"যদি আমাকে না পেতে, তুমি আমাকে খুঁজতে না।" (Tu ne me chercherais pas, si tu ne m'avais trouvé.)

আপনাদের কোনো ভারতীয় পবিত্র গ্রন্থে, কোনো দার্শনিক বা কবির লেখায় যখন কোনো একটা উদ্ঘাটিত রহস্য পড়ি, যা আমার অন্তর স্পর্শ করে, তাকে আমি নতুন চিন্তা বলে আবিষ্কার করি না, তাকে আমার গুপ্ত চিন্তাগুলোরই একটা বলে চিনি। তা আমার মধ্যে লেখা ছিল অনন্তকাল।

দিব্যকে, অনন্তকে খর্ব করা হবে, যদি ভাবা হয় যে, তা এক বাছাই-করা জাতির বাছাই-করা একদল লোকের হাতের একমুঠো বীজ। অনন্ত মানবতার সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেকে বপন করেছেন। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পক্ষে পৃথিবী সর্বত্র তেমন উর্বর নয়। এখানে মাথা তোলে এবং ফসল ফলায়, ওখানে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু বীজ আছে সর্বত্রই। এবং, পর্যায়ক্রমে,—যে ঘুমিয়ে ছিল সে জেগে ওঠে, আর যে জেগে ছিল সে ঘুমিয়ে পড়ে। শক্তি চিরকাল এক জ'তি থেকে অন্য জাতিতে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে গতিশীল। কোনো জাতি, কোনো মানুষ তাকে ধরে রাখে না। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এ হচ্ছে অনন্ত জীবনের অগ্নি,—সেই এক অগ্নি। আর আমরা বাঁচি তারই ইন্ধন যোগাতে। যে দুটি বৈদান্তিক নীতি আপনি আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন, তা আমার কাছে শিশুকাল থেকে পরিচিত,.......ভারত বা তার চিন্তার কাছ থেকে সামান্যতম জ্ঞান লাভেও আমি সক্ষম হইনি। এসব আমার মধ্যে কোথা থেকে এসেছে? আপনি যা ভাবেন, এসব তার চেয়ে

অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবী জুড়ে, যেমন কোনো এক খ্রিষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদে (যার উদ্ভব প্রাচ্যে), তেমনই হেলেনিক সংস্কৃতির একাংশে (যার সে [গ্রীস] অধিকারী হয়েছিল—পিথাগোরাস থেকে প্লেটোর মধ্যে দিয়ে প্লাটিনাস পর্যন্ত তার মহান চিন্তাবীরদের কাছে থেকে; এবং যা তার শিকড় চালিয়ে দিয়েছিল ইউরোপের মতোই এশিয়া ও মিশরের জগতে।) এবং আমাদের ক্ষেত্রে, উনবিংশ শতাব্দের মানুষদের ক্ষেত্রে, আমরা পেয়েছি এই ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদের উৎস : সংগীত—শক্তিশালী জার্মান সংগীত, এবং সর্বোপরি বেঠোফেনের বীরোচিত ধর্মীয় সংগীত। আমাদের কাছে এ এক অধিবিদ্যা এবং কথাহীন এক ধর্ম,—এক 'যোগ'-উদঘাটনকারী। আপনি যদি ভালো করে জানতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, অনন্তে অভিনিবিষ্ট হবার এবং সমাহিত হবার কঠোর শিক্ষাও পশ্চিমের আছে। জে. এস. বাখের এক ধর্মীয় সংগীতের সমুদ্রবৎ বিপুল ঐকতানে নিমজ্জিত এমন এক জার্মান জনতার চেহারা, পরানন্দের নিঃশব্দ ও জ্বলন্ত তীব্রতায় ভারতের সর্বগ্রাসী ধর্মীয় ভক্তির সমতুল্য। এর সঙ্গে যোগ করবেন, সপ্তদশ শতাব্দের ওলন্দাজ ও ইহুদি স্পিনোজার যে প্রবল চিন্তার প্রবাহ এসেছিল বিশুদ্ধ চিন্তার এলাকায়, যা পরিপূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল এক শতাব্দের পরে গ্যয়টের মধ্যে, যার সারবস্তু আমরা এখনো নিঃশেষ করতে পারিনি, এবং উনবিংশ শতাব্দের গোড়ায় দিকের মহান জার্মান ভাববাদের মধ্যে। মানুষের দেবত্ব এবং জীবনের আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অনেক মানুষের দুটি পরম বিশ্বাসের বস্তু এবং তা সব সময়েই। এমন কি এও বলতে পারা যায়, যে-ভাবুকেরা ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের কারো কারো "বিশ্বাসের" মৌল ভিত্তি ছিল এই নীতি দুটির প্রথমটি ("মানুষের দেবত্ব")। যে ত্বরান্বিত ক্রিয়া অবজ্ঞাত ও হিংসাত্মক মানুষের জনতাকে উদ্বেলিত করেছিল, তারই দুর্ভাগ্যে রক্তে ও রৌপ্যে ফরাসী বিপ্লব ডুবে গেলেও,— "বিশ্বাসের" মৌল ভিত্তি অটুট হয়ে ছিল একদল সেরা মানুষের মধ্যে। শিশুকালেই আমি তা অগ্রবর্তীদের হাত থেকে গ্রহণ করেছি। আমার

পর অপরের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।

নিগূঢ় ধ্যানশীল শ্রেষ্ঠ ইউরোপ শ্রেষ্ঠ এশিয়ার ভগিনী। দুয়ের মধ্যেই একই ঈশ্বরের শোণিত প্রবাহিত। কিন্তু এশিয়া দেখে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী তার ভগিনীকে যে-নিঃশব্দ লড়াইগুলো চালাতে হয়েছে, দেখে না সহস্রবর্ষের পথটি, যে-পথে সে বীজ ছড়িয়েছে তার রক্তের, তার ঈশ্বরের........[১]

অক্টোবরের শেষ দিকে (২৪ অক্টোবর) রমাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন দিলীপকুমার রায়। ১৯২০ সালের অগাস্ট থেকে রলাঁর সঙ্গে দিলীপকুমারের সাক্ষাৎ পরিচয়। ১৯২২ সালের অগাস্ট মাসেও তিনি ভিলন্যভে এসেছিলেন। রলাঁর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল নিয়মিত, কিছু লিখলেই তা তিনি রলাঁকে পাঠাতেন। এবার তিনি এসেছিলেন ভিয়েনা-ফেরৎ ভারতে ফেরার পথে। ভিয়েনায় তিনি ভারতীয় সংগীত শুনিয়ে এসেছিলেন।

তিন বছর আগেও দিলীপকুমার ছিলেন গান্ধীভক্ত। রলাঁ এবারে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি হালে অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে পড়েছেন। স্বভাবতই এবারে দিলীপকুমারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অরবিন্দ-প্রসঙ্গ। স্বয়ং অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তিনি তাঁর নতুন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে রলাঁকে জানিয়েছিলেন। "নির্জনবাসে অরবিন্দ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অনুসরণে আছেন। তিনি আশা করেন তা থেকে মনকে নিংড়ে এক নতুন ক্ষমতা পেতে সক্ষম হবেন, সেটা মানুষের মনে দিব্য ও অনন্ত শক্তির এক ধরনের প্রত্যক্ষ সংক্রমণ; তাতে দেহ উপকৃত হবে এবং ফলস্বরূপ তা মানবজাতির এক আমূল পরিবর্তন (mutation) আনতে সক্ষম হবে, (অবশ্য বৃহত্তর সংখ্যাতে তা সাধারণীকৃত হবে না, উপলব্ধ হবে একদল কুলীন মানুষের মধ্যে)।" অরবিন্দের অপেক্ষিত অতিমানব (Surhomme) পুরোপুরি নিট্‌শের অর্থে অতিমানব নন, অর্থাৎ সেই অতিমানব নিহত শিকারের উপরে- দাঁড়ানো "অট্টহাস্য-করা সিংহ" নন, তিনি মানুষী ধরনের, নতুন ও উন্নত স্তরের শক্তিসম্পন্ন,—যিনি এক নতুন ধাপ টপকে যাবেন, সে ধাপ বর্তমান মানবতা থেকে ততোটা দূরে, যতোটা

দূরে বর্তমান মানবতা সেই পশুভাব থেকে,—যা থেকে সে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য লিখেছেন: "ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার মনে সাড়া পাই না, এই স্বপ্নাচ্ছন্নতা আমাকে টানেও না। কিন্তু এক দেশ থেকে দূরবর্তী অন্য দেশে যুগপৎ প্রস্ফুটনকে আমি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের মতোই দেখি। তা থেকে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, নিঃসন্দেহে মনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক গোপন নিয়মের সাড়া। স্বাভাবিক বাড়, না রুগ্ন গড়ন? আমি জানি না। কিন্তু সাধারণ নিয়ম। তাহলে তার পরীক্ষার প্রয়োজন।" অরবিন্দ ঘোষ বৈদিক জ্ঞানকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়েছেন। মনে হচ্ছে, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করছেন, তার ফলাফল আগে থেকে ঘোষণা করে। এর বিপদও তাঁর জানা আছে এবং শিষ্যদের তিনি অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, এর ফলে তিনি পাগল হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি ভাবেন মানবতার জন্যেই এই অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁর কর্তব্য এবং তিনি মনে করেন, নিজের দেহে তিনি অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন; তিনি নিশ্চিত যে, চরম অভিজ্ঞতা লাভের আগে রোগে বা দুর্ঘটনায় তিনি মারা যাবেন না।

সেদিনকার সাক্ষাৎকারে স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত রলাঁর কাজের কথা আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়ে ঠিক ঠিক কী আলোচনা হয়েছিল রলাঁ তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি। দিলীপকুমার অবশ্য আলোচনায় উৎসাহ বোধ করেছিলেন এবং অরবিন্দের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তের মূল্যের কথা বলেছিলেন। তিনি সারদা দেবী এবং রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের অনেককে জানতেন। সারদা দেবী তাঁর কাছে প্রশান্ত মাধুর্যের এক স্মৃতি রেখে গিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে দিলীপকুমার রলাঁকে জানিয়েছিলেন যে, লন্ডনে এক ভারতীয়ের কাছে তলস্তয়ের লেখা একটি চিঠি আছে, তাতে তলস্তয় বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। রলাঁ সেই চিঠিটির অনুলিপি পেতে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন এবং দিলীপকুমারও তা পাঠাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনায় সংগীতপ্রসঙ্গ অপরিহার্য। প্রতিবারেই রলাঁর সঙ্গে সংগীত আলোচিত হয়েছে এবং গান গেয়ে শুনিয়েছেন দিলীপকুমার। তিনি আগে মনে করতেন ভারতীয় সংগীত জগতের সেরা

সংগীত এবং ভারতীয় ছাড়া কেউ তা বুঝতে সক্ষম নয়। তাঁর কাছে এই দাবি ছিল জাতীয় সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু রলাঁ তাঁকে নিশ্চয় করে বলেছিলেন, ভারতীয় সংগীত ইউরোপীয় সংগীত থেকে পৃথক হয়েছে একই বিবর্তনের মাত্রার ফলে। এবার ভিয়েনা থেকে সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় সংগীত শুনিয়ে ফিরে এসে স্বীকার করেছিলেন, তাঁর দেশের আর্ট থেকে ইউরোপীয় আর্ট "অপ্রতিকার্যভাবে দূরবর্তী" (irrémédiablement éloignée) নয়। অজ্ঞাতসারেই তিনি ইউরোপীয় সংগীতের কোনো কোনো উপাদান নিজে গ্রহণ করেছেন এবং অসচেতনভাবেই তাঁর সংগীতে এনে ফেলেছেন।

সেদিন দিলীপকুমার রলাঁকে তিনটি গান শুনিয়েছিলেন, দুটি তাঁর নিজের, তৃতীয়টি কালীবিষয়ক উনবিংশ শতাব্দ কি তার আগের একটি গান। মনে হয় সেটি ছিল রামপ্রসাদী। গানটি রলাঁর মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়েছিল। সেই গানের স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এই ক'টি কথায়: "আবেগের এক গ্রন্থিমোচন,—মিনতি জানাচ্ছে, শোকার্ত হয়ে উঠছে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে, চড়া থেকে খাদে নেমে আসছে, বারে বারে মনে হচ্ছে শেষ হলো, বারে বারে তা নতুন করে শুরু হচ্ছে অতৃপ্ত এক আবেগের তীব্রতা নিয়ে।" পরিশেষে তিনি মন্তব্য লিখেছিলেন: "এই সংগীতে আমি আরব প্রভাব দেখতে পাচ্ছি, আর সে সম্পর্কে মোটেই সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।" (Je trouve en cette musique des influences arabes, qui ne me semblent point douteuses.)[১৩]

রম্যাঁ রলাঁর তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। স্বামী অশোকানন্দের মাধ্যমে ভগিনী ক্রিস্টিন ও বশী সেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। বশী সেন তাঁকে বিবেকানন্দের বিজ্ঞান সম্পর্কিত উক্তিগুলো একত্র সন্নিবেশ করে পাঠিয়েছিলেন। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি তথ্যাদি সমাবেশ করে গ্রন্থরচনার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত স্বামী শিবানন্দের উত্তর তাঁর হাতে পৌঁছোয়নি। মধুপুর থেকে ২ নভেম্বর স্বামী শিবানন্দ মিস ম্যাকল্যাউডকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, তিনি রম্যাঁ রলাঁর কাছ থেকে খুবই আকর্ষণপূর্ণ একটি চিঠি পেয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন:

মনে হয়, তিনি (রম্যাঁ রলাঁ) বিষয়টির দিকে উপযুক্ত মানসিকতা

নিয়েই এগুচ্ছেন,—সে মানসিকতা একই সঙ্গে সপ্রশংস উপলব্ধিজাত সহানুভূতিশীল এবং বিশ্লেষণমূলক। এক প্রাচ্য আদর্শকে বোঝা এবং তার প্রতি সুবিচার করতে পারাটা তাঁর পক্ষে কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাঁর ভেতরে ইতিমধ্যেই যে সহানুভূতি ও সপ্রশংস উপলব্ধি রয়েছে তা সমস্ত বাধা দূরীভূত করবে এবং তাকে সত্য ও নির্ভুল যথানুপাত লাভ করাতে সক্ষম হবে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বিষয়কে ভাষায় আঁকা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না।.........পরের ডাকে তাঁকে প্রামাণিক সাক্ষ্যসহ আমার উত্তর পাঠাবার ইচ্ছা......আমার বিশ্বাস তাঁর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। মোট কথা, আমরা এক, পরস্পরের কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায় শুধু তা যদি জানা যেতো![১১]

স্বামী অশোকানন্দের ১১ নভেম্বর তারিখের চিঠি রলাঁর কাছে পৌঁছেছিল ডিসেম্বরের গোড়ায়। রলাঁ বিবেকানন্দের রচিত যে চারখানি বই পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, তার জায়গায় মিশন থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সাত খন্ড *বিবেকানন্দ রচনাবলি*। তাঁর চিঠিখানি ছিল বেশ দীর্ঘ।[১২]

তিনি লিখেছিলেন: পশ্চিমে বৈদান্তিক ধারণার বৃদ্ধি সম্পর্কে রলাঁর পর্যবেক্ষণ তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছেন। তিনি রলাঁর বক্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, তিনি তাঁর চিঠিতে অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ঐতিহাসিক কারণে বৈদান্তিক ধারণার ''স্বাধীন'' বিকাশের অন্যতম কারণ হচ্ছে পশ্চিমে তাঁদের প্রচার। তিনি আরও লিখেছিলেন, তাঁর মতে, প্রথম ধাপে যন্ত্রশিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক প্রগতি পশ্চিমকে এইসব দিকে ঠেলে দিয়েছিল, এবং তাতে সাহায্য করেছিল ভারততত্ত্ববিদদের ছড়িয়ে দেওয়া ভারতীয় সংস্কৃতি। আত্মার শক্তিসমূহ স্বাধীনভাবে উদঘাটিত হতে পারে না, এবং তারা কোনো বিশেষ মানুষ বা মানুষের জাতের জিম্মায়, এই মত পোষণ করা তাঁর কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু রলাঁ তাঁর সঙ্গে অবশ্যই একমত হতেন যে, তাতে একটা জাতির পক্ষে অন্য জাতিকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করাটা আটকায় না। যদি কোনো জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশি সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠে, তাহলে সুযোগ ঘটলে, অন্যদের নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারে। পশ্চিম, বিশেষভাবে, রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল, যন্ত্রশিল্পের বিকাশ অনুশীলন করেছে,

এ ব্যাপারে ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশগুলো তার পেছনে। এই সব ব্যাপারে আজ তারা নিশ্চয়ই পশ্চিমের দ্বারা বেশি রকম প্রভাবিত হচ্ছে। তিনি একথা বলতে চান না যে, অন্য কোনো ব্যাপারেও ভারতীয়েরা পশ্চিমের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। তিনি শুধু তার প্রভাবের বিশিষ্ট দিকগুলোর কথাই বলছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি মনে করেন ভারতীয় ধারণাসমূহ পশ্চিমকে সাহায্য করেছে। যা ছিল অস্পষ্ট তা হয়েছে স্পষ্ট। ভারতের দর্শন ও ধর্ম জানার ফলে পশ্চিমের দেশজ আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো আরও বেশি সুসমৃদ্ধ ও শোধিত (clarified) হয়েছে। আর এটা এখনও যতদূর পর্যন্ত হয়েছে তাতে তাঁদের মিশনেরও অংশ রয়েছে, একথাই তিনি বলতে চান। তার বেশি আর কিছুই দাবি করেন না।

অবশ্য, তিনি উল্লেখ করতে চান, পশ্চিমের বৈদান্তিক ধারণার অস্তিত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এক দলের মধ্যে এসব ধারণা মূলত ভারত থেকেই এসে থাকবে। এই মতের পক্ষে এখনো সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। কিন্তু কিছু প্রমাণ অবশ্যই আছে। রলাঁ বলেছেন, তিনি খ্রিষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদ, হেলেনিক সংস্কৃতি ইত্যাদি, পিথাগোরাস এবং প্লেটো ও স্পিনোজার মধ্যে বৈদান্তিক ধারণা দেখতে পান। খ্রিষ্টধর্ম মূলে নিশ্চয়ভাবে বৌদ্ধধর্মের কাছে ঋণী ছিল; বৌদ্ধধর্ম বৈদান্তিক চিন্তার জনপ্রিয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণত এটাই স্বীকৃত যে, পিথাগোরাস ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা স্পষ্টতই ভারতীয় চিন্তার কাছে প্রচুর ঋণী। সমাজবিদ্যার ইংরেজ অধ্যাপক আরউইক তাঁর *দা মেসেজ অব প্লেটো* নামে যে বইটি লিখেছিলেন, তাতে এই বক্তব্যই প্রতিপাদন করেছেন যে, প্লেটো তাঁর মুখ্য ধারণাগুলো পেয়েছিলেন বেদান্তের কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাসী* মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে কয়েক বছর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভারতীয় দর্শনের কাছে কিছু প্রাচীন ইউরোপীয় ভাবুকের ঋণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। এটা সুপরিচিত যে, স্পিনোজা তাঁর পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায় সুপন্ডিত ছিলেন এবং কে বলতে পারে Zohar-এর অতীন্দ্রিয় শিক্ষা কতখানি ভারতীয় প্রভাবের ফল? এটা স্বীকৃত যে, ব্রাহ্মণরা এথেন্সে যেতেন। এটাও ঐতিহাসিক যে, আলেকজান্দ্রিয়া ভারতীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় সংমিশ্রণের

স্থান ছিল এবং আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী (Gnostic) খ্রিষ্টান দর্শন ভারতের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। প্রকৃত ঘটনা এই যে, সেটা প্রাচীন যুগে যখন বাণিজ্য ব্যাপার প্রধানত স্থলপথে চলত, চীন, ভারত থেকে গ্রীস, মিশর পর্যন্ত দেশগুলোর মধ্যে। আমরা এখন যতোটা ভাবি, তার চেয়ে বেশি যোগাযোগ ছিল। স্থলপথ থেকে জলপথে বাণিজ্য-পথগুলোর পরিবর্তনের অর্থ শুধু এশিয়া এবং ইউরোপে বিরাট শিল্পগত ও রাজনৈতিক বিপ্লবই নয়, এশিয়া এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরেও আঘাত। তিনি শেষ করেছিলেন এই কথা বলে:

> আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, সমস্ত সংস্কৃতিমান জাতির মধ্যে কম বেশি বৈদান্তিক ধারণার বিকাশ অবশ্যই ছিল। কিন্তু আমি আরও মনে করি যে, কিছু জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে নিজেদের বোধের ও বিকাশের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা করেছিল; এবং যখনই সুযোগ এসেছে, তাদের উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তা দিয়ে অন্য জাতিদের প্লাবিত করেছে। ভারত হচ্ছে সেই রকম এক জাতি।
>
> আগে যা কিছু লিখেছি তা শুধু আমার দৃষ্টি ভঙ্গি স্পষ্ট করার জন্যে। আপনার চিঠির গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আপনিও আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তবিকভাবে (substantially) একমত।...... সংগীত সম্পর্কে আপনার মন্তব্যগুলো বিশেষভাবে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দও এই অভিমত পোষণ করতেন যে, সংগীত ঈশ্বর-উপলব্ধির অন্যতম পথ। তাঁরা দুজনেই ভালো গায়ক ছিলেন.......[১৩]

স্বামী অশোকানন্দের চিঠির উত্তর দেবার আগেই রম্যাঁ রলাঁ তাঁর গ্রন্থপরিকল্পনা নিয়ে *য়্যুরোপ* পত্রিকার সচিব রবের ফ্রাঁসের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছিলেন। ১১ ডিসেম্বর এক চিঠিতে তিনি তাঁকে পত্রিকায় ভাবী গ্রন্থের প্রকাশের ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন: *নরদেবগণ: রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মবাণী* (L' Homme-Dieux : Ramakrishna et l'Evangile de Vivekananda)।[১৪]

কয়েকদিন পরে (১৪ ডিসেম্বর) বিবেকানন্দের রচনাবলি প্রাপ্তির সংবাদ

এবং স্বামী অশোকানন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে রলাঁ লিখেছিলেন:

> ....আমার আগের চিঠির আপনার উত্তরটি আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। মূলগত ভাবে আমাদের ঐকমত্য আছে। আমাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য (যদি তাকে একটা পার্থক্য বলা চলে) হচ্ছে যে, আপনি চিন্তার সেই রূপকেই বৈদান্তিক বলেন যাকে আমি মনে করি সব সময়ে সব দেশের মধ্যেই ছিল, এবং যার সবচেয়ে নিখুঁতভাবে উপলব্ধি ঘটেছে বৈদান্তিক ভারতে। পূর্ণ বিকাশ এক জিনিশ, উৎপত্তি আর এক জিনিশ। আমি মনে করি না যে ভারতে বা অন্য কোনো দেশে কখনো দিব্য উদ্‌ঘাটনের (révélation) উৎপত্তি ঘটেছিল। তার জন্যে সে সম্মান দিই ঈশ্বরকে, যিনি আছেন সকল জীবন্ত সত্তায়। তিনিই একমাত্র উৎস এবং সেই উৎস আছে সেইসব জীবন্ত সত্তায়, যারা ছিল, যারা আছে, যারা হবে। সবাই এর ধ্বনন শুনতে পায় না। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই তা আছে। এবং আমরা জানিনা, যারা নিজেরা নিঃশব্দ, অথবা নিজেদের নিঃশব্দ করে রাখে, তারা তাঁর বিস্ময়কর সংগীতে পূর্ণ কি না। কারণ ঈশ্বরই নৈঃশব্দ্য, ঠিক যতোটাই তিনি অতি শক্তিশালী প্রকাশের মধ্যে। অনন্তের সামনে অগ্রাধিকারের প্রশ্নই ওঠে না; কোনো আরম্ভও নেই, কোনো শেষও নেই। কিন্তু দিব্য চিন্তার সবচেয়ে শক্তিশালী, নিঁখুত এবং সম্পূর্ণ স্মৃতিসৌধ,—ঐক্য এবং অভিন্নতার (identity) ক্যাথেড্রাল—সত্তার হিমালয়কে ভারতে চিনে নিতে আমি দ্বিধা করি না।

তিনি চিঠির শেষে জানিয়েছিলেন, যেমনটি ভেবেছিলেন, গ্রন্থরচনার কাজটি সম্পূর্ণ হতে কিছুটা দেরি হবে। কারণ প্রথমত, তথ্যাদির পরিমাণ বিপুল, সেগুলোর শ্রেণী-বিভাগ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তার সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাবলি যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর আগে শুরু করা সাহিত্য-কর্মকে তিনি শেষ করেছেন। সবশেষে কারণ হিশেবে লিখেছিলেন:

> আমার পক্ষে এটাও প্রয়োজন হামেশাই অবিচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে আবেদনের উত্তর দেবার; চন্ড আবেগে গিলে-খাওয়া এই পৃথিবীতে এক জায়গায় কি অন্য জায়গায় এই অপরাধ ঘটার বিরতি নেই; এই কর্তব্য থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে রাখতে পারি না, যা বেশির ভাগ

> চিন্তাশীল মানুষই করে থাকেন; কাজের মধ্যে নিজেদের ঢেকে তাঁরা চোখ বুঁজে থাকেন, যাতে বিক্ষুব্ধ হতে না হয়।[১৫]

স্বামী শিবানন্দকে লেখা রলাঁর ১২ সেপ্টেম্বরের চিঠির উত্তর আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। উত্তরের তারিখটি জানা যায়নি, পৌঁছানোর তারিখও নয়। তবে সেটি যে ডিসেম্বরের আগে পৌঁছায়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তরটি দীর্ঘ।[১৬] তাতে স্বামী শিবানন্দ রামকৃষ্ণসংসর্গে লব্ধ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে লিখেছিলেন: "আমি খুব জোরের সহিত বলিতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় লোককল্যাণকর দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমান যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। জগতের অশেষ দুঃখকষ্টের প্রতি তিনি গভীর ভাবে সজাগ ছিলেন।........তিনি স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণকে জগতের দুঃখমোচন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।"

চিঠিতে স্বামী শিবানন্দ দুঃস্থ অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখনিবারণের আর্তির দৃষ্টান্তরূপে রামকৃষ্ণের জীবনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। দুটি ঘটনাই তাঁর স্বয়ং রামকৃষ্ণের মুখ থেকে শোনা। প্রথমটি ঘটেছিল, মথুরানাথ বিশ্বাসের নদিয়ার জমিদারিতে। জমিতে দু'বছর ফসল না-হওয়ায় প্রজারা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছিল। প্রজাদের অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে রামকৃষ্ণের মন কেঁদে উঠেছিল। তিনি প্রজাদের খাজনা মাফ করতে, পরিতোষ সহকারে খাওয়াতে এবং বস্ত্রদান করতে মথুরানাথ বিশ্বাসকে আকুল হয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি দেওঘরে। দেওঘর অঞ্চলে দু'বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। পথচলতি পালকি থেকে কঙ্কালসার সাঁওতালদের দেখে দয়ার্দ্রহৃদয় রামকৃষ্ণ তাদের "অন্নবস্ত্র তৈল ও স্নানের বন্দোবস্ত" করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, "যে পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে সে পর্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গে বাস করিব, এস্থান ছাড়িয়া যাইব না।" রামকৃষ্ণ যে "পরদুঃখে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং অনুরাগ প্রকাশ" করেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, তেমন আরও দুটি ঘটনার কথা স্বামী শিবানন্দ তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন: একদিন দক্ষিণেশ্বরে "অর্ধবাহ্যদশায়" থেকে তিনি বলেছিলেন: "জীব শিব।

জীবকে দয়া দেখাইবে কি? দয়া নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা।" সেকথা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের বলেছিলেন: "আজ আমি এক গভীর তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিলাম। যদি কখনও সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে এই মহাসত্য জগতে প্রচার করিব।" অন্য ঘটনাটি ১৮৮২ সালের প্রথম ভাগে, কাশীপুরে গলরোগে আক্রান্ত রামকৃষ্ণ যখন অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর "বাহ্যজ্ঞানহীন মৃতব্যক্তির ন্যায় হিমাঙ্গ" দেখে শিষ্যরা সশঙ্কিত চিত্তে রামকৃষ্ণকে সংবাদ দিলে তিনি উৎকণ্ঠিত হননি। সমাধিভঙ্গের পর বিবেকানন্দ তাঁর কাছে এলে তিনি বলেছিলেন: "বেশ, এখন বুঝতে পারলে? এই নির্বিকল্প সমাধির চাবি এখন আমার কাছে রইল। তোমাকে মায়ের কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলেই মা চাবি খুলে দেবেন।" স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিতে পরম আনন্দে জগৎ ভুলে থাকার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে রামকৃষ্ণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন: "তোকে উচ্চ আধার বলে মনে করেছিলুম কিন্তু এখন দেখছি তুই সাধারণ লোকের ন্যায় আত্মসুখে নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছা করিস। জগদম্বার কৃপায় এই উচ্চ অনুভূতি তোর নিকট এতোই স্বাভাবিক হবে যে সাধারণ অবস্থাতেও তুই সর্বভূতে একই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবি। তুই পৃথিবীতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করবি, লোকের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করবি এবং দীনহীনের দুঃখ দুর্দশা অপলোদন করবি।"

স্বামী শিবানন্দ লিখেছেন: "অন্যের ভিতর আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করিয়া উচ্চ অনুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবার শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত দিব্য শক্তি ছিল। চিন্তা, দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা তিনি এই কার্য সম্পাদন করিতেন।" রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর স্পর্শ ও ইচ্ছায় তিনি তিন বার সমাধি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি আরও লিখেছিলেন:

> সর্বক্ষণ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একজন সাধকের পক্ষে দরিদ্রের দুঃখক্লেশ অপনোদন করা সকল সময়ে স্বভাবতঃই সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন ছিলেন মনে করা অত্যন্ত দূষণীয় হইবে। তিনি স্বয়ং যাহা আচরণ করিয়াছিলেন এবং সূত্রাকারে ব্যক্ত

> করিয়াছিলেন উহাই পরবর্ত্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা নিজ জীবনে উপলব্ধি ও আচরণ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের (?) যখন উচ্চ ভাবরাজ্যে অবস্থান করিতেন তখন তাঁহাদের পক্ষে নিজের প্রয়োজনাদির দিকে দৃষ্টি রাখাও অসম্ভব ছিল। অতএব যাঁহারা তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যসকল উপলব্ধি করিয়া বহুজনের হিতের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহাদিগের ভিতরই শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন— ইহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আমরা নিজেরাও অনুভব করিয়াছি। এই জন্যেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে একদিকে যেমন তিনি ধর্ম্ম সমন্বয়ের অত্যদ্ভুত বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, অপর দিকে আবার দুঃস্থগণের মধ্যে ঐহিক পারলৌকিক জ্ঞান, অন্নবস্ত্র, ঔষধ বিতরণ করিয়া যাহাতে তারা অভাবশূন্য হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে তজ্জন্য সার্ব্বজনীন সেবাধর্ম্মও প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এবং গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সূত্রাকারে কথিত উপদেশসমূহের জ্বলন্ত ভাষ্যকার ছিলেন।

স্বামী শিবানন্দের এই দীর্ঘ চিঠিটি প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায় স্বামী অশোকানন্দকে লেখা রলাঁর পরের বছরের ৪ মার্চের চিঠিতে। কিন্তু তখনো রলাঁ চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে পারেননি।[১৭]

চার

রম্যাঁ রলাঁ তাঁর গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পর্বকে বলেছেন মহৎ ভারত-স্বপ্নের (le grand songe indien) "মুগ্ধতার" (enchantement) পর্ব।[১] ভারতের অতীন্দ্রিয়তা ও ধর্মের রহস্য অনুসন্ধানে তিনি যেভাবে গভীর নিবিষ্ট-চিত্ত ও তন্নিষ্ঠ হয়েছিলেন তাতে তাঁকে স্বচ্ছন্দে যোগাসনে ধ্যানীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তার ধ্যানদৃষ্টি কখনো স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি। তার কারণ, ধর্ম তাঁর কাছে শুদ্ধ ধ্যানবস্তু ছিল না, তা ছিল মানুষের জীবনের অঙ্গ; সামাজিক কর্মরূপে ধর্মই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত আস্তিকতা।

ধর্ম বলতে রলাঁ বুঝতেন, সত্তার এমন এক দশা, যা মানুষকে নিরন্তর ঠেলে নিয়ে চলে তার নিজের সীমার বাইরে এবং বিশেষ নির্দিষ্ট ভাবে তাকে অংশগ্রহণ করায় বিশ্বজগতের প্রতিটি "হয়ে-ওঠার" (devnir) সঙ্গে। তাঁর কাছে জগতের, বিশ্বজগতের "গোপন ঐক্যই" এই সদর্থকতা প্রতিপাদন করে; তিনি এর কোনো দিক থেকেই বস্তু ও চৈতন্যকে পৃথক করে দেখেননি।[২] তিনি যাকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে মনে করতেন, অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা থেকে তা ছিল স্বতন্ত্র। ভারতীয় অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিশক্তির (intellect) স্থান খুব সামান্যই, সে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় একমাত্র ঊর্ধ্ব মনোভূমিতে। রলাঁর ধারণায়, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মনোভূমিতেই ঘটে, তাতে অহং-এর পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে না। তাঁর কাছে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা কর্মের সঙ্গে, মানুষের দুঃখযন্ত্রণা, জনগণের পরিশ্রমের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।[৩]

মহাত্মা গান্ধী-র পরপরই রলাঁ প্রবল শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও দীর্ঘকায় তিনখন্ড উপন্যাস লেখা শেষ করেছিলেন।[৪] ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, পোলান্ডে, বুলগেরিয়ায়, রুমানিয়ায় শ্বেতসন্ত্রাসের রাজত্ব, এমন কি খাস ফ্রান্সেও ফ্যাসিস্ট মনোভাবের বিস্তৃতি তাঁকে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিনি নেমে এসেছিলেন কর্মের জগতে। একদা যে-রলাঁকে বলা হয়েছিল 'ইউরোপের বিবেক", তিনি ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন: তিনি জগতের *প্রতিটি অত্যাচারিতের পক্ষে, প্রতিটি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।*[৫] ১৯২৬ সালের নভেম্বরে গঠিত হয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী

আন্তর্জাতিক কমিটি; ১৯২৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পারীর সাল বুলিয়েয় তার প্রথম কংগ্রেসে আঁরি বারব্যুস ও আইনস্টাইনের সঙ্গে তিনি ছিলেন তার সভাপতি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে তন্ময়তার পর্বেও তিনি কর্মের ক্ষেত্রে প্রবল সক্রিয়। এই পর্বেই আবার তিনি বিপ্লবের পরবর্তী রাশিয়ার কর্মকান্ড সম্পর্কে আশাবাদী এবং সমর্থক হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। বলশেভিক মূঢ়তা, সংকীর্ণতা, ভ্রান্তির প্রতি তাঁর আক্রমণ বন্ধ হয়েছিল; রুশ বিপ্লবকে "মানব সমাজের শক্তিমান অংশ" বলে মনে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। ইতালি, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইন্দোচীন, রাশিয়ার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় রলাঁ সরব হয়েছিলেন, সক্রিয় সংগ্রামে নেমেছিলেন।[৬]

এই জন্যে স্বাভাবিক কারণেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে তন্ময় অনুসন্ধানে এই পর্বে রলাঁর বেশ বাধাও ঘটেছিল। গ্রন্থরচনার কাজ ত্বরান্বিত হয়ে উঠছিল না। সমস্ত রকম অবিচার-অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো যে তাঁর নৈতিক প্রয়োজন, সেই কথাটি তিনি স্বামী অশোকানন্দকে ১৪ ডিসেম্বরের চিঠিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন।[৭] রলাঁর দিনপঞ্জীতে উল্লেখ না থাকলেও, অক্টোবর মাসে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও যে রলাঁ একথা বলেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন দিলীপকুমার রায় নিজেই। রলাঁ সাক্কো-ভেঞ্জেত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁকে বলেছিলেন:......."আমাকে খুব একটা তিক্ত প্রবন্ধ লিখতে হলো.....। বলতে গেলে এ ঠিক আমার কাজ নয়। তবে যখন বেশির ভাগ লোক আত্মসর্বস্ব হ'য়ে ওঠে তখন বাকি লোকের ঘাড়েই তো পড়বে প্রায়শ্চিত্তের ভার।......."[৮]

পরিকল্পনা অনুসারে রলাঁ শীতকালে ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রন্থরচনার আয়োজন শুরু করেছিলেন। গ্রন্থরচনার সংবাদ গোর্কিকে জানাচ্ছেন ২ জানুয়ারি।[৯] প্রকৃতপক্ষে রচনা আক্ষরিক ভাবে শুরু হয়েছিল মার্চের গোড়া থেকে। রলাঁ তখনো নবপর্যায়ে *বেঠোফেন* শেষ করে উঠতে পারেননি, সময় অনেক বেশি লেগে গিয়েছিল। তাঁর এ পর্যায়ের *বেঠোফেন*-এর প্রথম খন্ড লেখা শেষ হয় ৪ মার্চ। [অশোকানন্দকে চিঠি, ৪.৩.২৮] এই কারণে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে আরও দু'মাস লেগে গিয়েছিল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল; স্বামী অশোকানন্দের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে ও প্রশ্নোত্তরের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছিল; প্রথম রচনার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক মাস রলাঁর

দিনপঞ্জীতে রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উল্লেখ চোখে পড়ে না। স্পষ্টই বোঝা যায়, গভীর আত্মপ্রত্যয়ে রলাঁ গ্রন্থরচনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিবিষ্টতার মধ্যে তবু এই সময়েই শুরু হয়েছিল মাডলিন শ্লেড (মীরা বেন) ও গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়ের পালা,—যার জের চলেছিল পুরো দুটি মাস ধরে। রামকৃষ্ণ লেখার সময়ে এই সমান্তরাল পত্র-বিতর্কে রলাঁর মানসিক স্থৈর্য বিচলনের কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না।

এই বিতর্কের বিষয় ছিল দুটি, বের্তালঁ ভাইদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসহযোগ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধীজির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ সমর্থনের প্রশ্নটি। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ফ্রান্সের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী মারিয়ান রোজের লেখা বের্তালঁ ভাইদের সম্পর্কে লেখা একটি প্রকাশিতব্য পুস্তিকা রলাঁ মাডলিন শ্লেডকে পাঠিয়েছিলেন। তেওফিল ও ফেলিক্স বের্তালঁ ছিলেন ফ্রান্সের উচ্চ-আল্পসের দুই চাষী-ভাই। ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিংসা পরিহারের জন্যে তাঁরা সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে জনহীন বন্ধ্যা পাহাড়ের মাথার তেরো বছর কাটিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁদের গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আদালত তাঁদের শাস্তি দিতে সাহস করেনি। ঘটনাটি ফ্রান্সে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রলাঁ অনুরোধ করেছিলেন. বিবেকবান প্রতিবাদীর বীরোচিত দৃষ্টান্ত হিশেবে গান্ধী যেন *ইয়ং ইন্ডিয়া*-তে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য লিখে ভারতীয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যাতে তারা জানতে পারে, মহৎ সত্য এবং বিবেকের বিধানের প্রতি চরম অনুরক্তি সব দেশেই দেখা যায়।[১০]

কিন্তু মিস শ্লেড গান্ধীর অনুমতি নিয়ে লিখে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধী মনে করেন না, বের্তালঁ ভাইরা সেইসব মানুষের প্রকৃত দৃষ্টান্ত, যাঁরা অহিংসার প্রেরণায় যুদ্ধের বিরোধিতা করে যে-কোনো যন্ত্রণা ভোগ করতে পারেন। তাঁদের আবেদনের মূল উৎস ছিল পাহাড়ী ভিটার প্রতি তাঁদের তীব্র আসক্তি। মাদাম রোজের বর্ণনাকে তাঁর "রং ফলানো" মনে হয়েছিল।[১১] তার উত্তরে ক্ষোভের সঙ্গে রলাঁ লিখেছিলেন: "শিক্ষাহীন, গুরুহীন, সমস্ত মতবাদ ও দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে অজ্ঞ, স্বভাবজাত বিবেক ও পুরনো বাইবেলের সরল বিশ্বাসের একমাত্র আলোকে চালিত এই সরল চাষীরা, এই নিরহংকার

বীরেরা, যারা নিজেদের জানে না, তারা যদি হিংসার পরম অস্বীকৃতির গুরুর ও তাঁর শিষ্যদের চাহিদা পূরণ না করে, তাহলে গান্ধীবাদী মহৎ চিন্তা যে কোনোদিন বাকি মানুষের জগতে ঢুকতে পারবে ও সেখানে ফল দিতে পারবে, তার কোনো আশাই নেই। আপসহীন শুদ্ধতার জন্যে ভারতের এক আশ্রমের চার দেয়ালের মধ্যে তার আটকে থাকার সম্ভাব্য বিপদ থাকবে।[১২] রলাঁ দিনপঞ্জীতে মন্তব্য করেছেন: "যাঁরা সেরা মানুষ তাঁদের মধ্যে সেই একই সংকীর্ণতা,—তাঁরা বিশ্বজনীন সত্যবাণী (Gospel) পরিণামে গোষ্ঠীর এক কঠোর বিধিবদ্ধ নিয়মে নামিয়ে আনেন।"[১৩] এই একই চিঠিতে রলাঁ ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধে গান্ধীর অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধের সমর্থনে জনগণকে উৎসাহিত করাটা ভুল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি গান্ধী ও মিস শ্লেড একই সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন রলাঁকে। গান্ধী-বের্তালঁ ভাইদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "......চাষীরা যে-সাড়া দিয়েছিল তার মধ্যে যুদ্ধ হিশেবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক নিশ্চিত ঘৃণা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের চরমতম যন্ত্রণাবোধের এক দৃঢ় সংকল্প আমি দেখতে পাচ্ছি না।"[১৪] এই চিঠিতেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর তাঁর আত্মজীবনী থেকে পড়ে নিতে রলাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই সঙ্গে মিস শ্লেডও চিঠিতে[১৫] জানিয়েছিলেন, যুদ্ধ প্রতিরোধীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস এবং বিশ্বযুবশান্তি কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে গান্ধীর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। যুদ্ধ প্রতিরোধীদের কংগ্রেস হবে ভিয়েনায় সোনটার্সবের্গে ২০-৩০ জুলাই এবং যুবশান্তি কংগ্রেস হল্যান্ডে ১৭-২৩ অগাস্ট এবং তাতে গান্ধীর যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

রলাঁ গান্ধীর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ৭ মার্চ। তাতে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ সমর্থনের প্রসঙ্গে সবিনয়ে লিখেছিলেন: ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীর চিন্তাকে বুঝতে এবং তা সমর্থন করতে অসমর্থ (avec tout mon désir d'entrer dans vos pensées et de les approuver, Je ne l'ai pas pu!)। দেশ ও জাতির পবিত্রতায় বিশ্বাস করে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, বেদনাদায়ক হলেও তাদের তিনি মেনে নিতে পারেন; জাতির পবিত্রতায় বিশ্বাস না করলেও, কেবল ভয়ে, সহনাগরিকের চোখে অসম্মান জোটার আশঙ্কায় যারা যুদ্ধে যোগ দেয়, করুণার পাত্র হলেও তাদের তিনি বোঝেন। তাদের

ভর্ৎসনা করার অধিকার তাঁর নেই। "কিন্তু যখন আপনার মতো মহৎ সাহসী, পরম বিশ্বাসী মানুষ—যিনি আপসহীনভাবে মানুষের র ক্তপাতকে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে ধিক্কার দেন, তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন—এবং তাও স্বেচ্ছায়, অংশগ্রহণে বাধ্য না-হয়ে, তখন জগতের কোনো কিছুই আমাকে—শুধু তা মেনে নেওয়াতে নয়, তা বোঝাতেও পারবে না।"[১৬]

এই গুরুতর প্রশ্নটিতে গান্ধীর সঙ্গে ভবিষ্যতেও মতৈক্য ঘটেনি এবং মতের এই অনৈক্য রলাঁকে মানসিকভাবে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইউরোপে আসা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গান্ধীর দোলাচলচিত্ততা। বিভিন্ন সম্মেলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইউরোপে যাওয়ায় গান্ধীর অন্তরের সাড়া ছিল না, যেটুকু আগ্রহ তা রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। কিন্তু তাতে রলাঁ একেবারেই সায় দিতে পারেননি। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এক বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, যার কাছে অতীতের যুদ্ধ ছেলেখেলা বলে মনে হবে। তিনি চেয়েছিলেন গান্ধী ইউরোপের যুবশক্তির সঙ্গে মিলিত হবেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। যে-জগৎ তাঁর কথা শোনে, তার কাছে পরিষ্কার, যথাযথ ও স্পষ্টভাবে নিজের মতবাদ, অহিংসা, অসহযোগের গুরুত্ব বোঝাবেন। তিনি লিখেছিলেন: "আগামী সংকটের দিনে গান্ধীর চিন্তায় কোনো সন্দেহে এলে চলবে না। এবং অন্যদিকে নির্দেশের সমস্ত ফলাফল বিচার করতে হবে ও যাদের উপর তা ন্যস্ত করা হবে তাদের শক্তিও বিচার করতে হবে। সামনে যে অগ্নিপরীক্ষা, সে সম্পর্কে ইউরোপের তরুণরা সচেতন। আশু বিপদ সম্পর্কে তারা প্রতারিত হতে চায় না। অনেক শক্তিবাদী এই বিপদকে না-দেখার চেষ্টায় আছে, তাদের মন থেকে একে সরিয়ে রাখছে। যারা এর মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়, তারা জানতে চায়: অসহযোগ কতদূর পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং মানবিক?....এই সর্বাঙ্গীণ আত্মত্যাগ আগামী কালের মানবতার যন্ত্রণার বোঝা হালকা করতে পারবে, না কি, এই আত্মত্যাগ তাদের নিয়তিকে বাধাবন্ধহীন বর্বরতার হাতে ছেড়ে দেবার ঝুঁকি নেবে?........."[১৭]

রলাঁ স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন, এই মহৎ দায়িত্ব পালনের জন্যে গান্ধী ইউরোপে না এলে তাঁর আসার প্রয়োজন নেই। গান্ধী মনে করেছিলেন, যে-বিশ্বজনীন বার্তা তাঁকে ইউরোপে নিয়ে যেতে হবে, তা এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত দিয়েই তিনি ইউরোপকে পথ দেখাবেন অবশেষে

তাঁর দোলাচলচিত্ততার অবসান হয়েছিল পৌত্রের মৃত্যুতে। গান্ধী ইউরোপ সফর পুরোপুরি বাতিল করে রলাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ের পত্রবিতর্কের মানসিক পীড়া, চাপ ও অস্বস্তির মধ্যেও রলাঁর *রামকৃষ্ণ* লেখায় কিন্তু ছেদ পড়েনি। পত্রালাপের পর্ব শেষ হবার আগেই ৯ মে প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল তাঁর প্রথম খন্ড *রামকৃষ্ণ*।[১৮]

এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত যে দু'টি বিষয় রলাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল তাদের প্রকৃতি কী স্বতন্ত্র! একটিতে এক অতীন্দ্রিয়, অতীত জীবনরহস্য সন্ধানের প্রয়াস, অন্যটিতে বর্তমান পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্রুবাদর্শকে,—বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক আগ্রহ। *রামকৃষ্ণ* লেখা এবং পত্রালাপ সমান্তরাল ভাবে চলেছে, একের মধ্যে অন্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। রলাঁর দিনপঞ্জীতে মে মাস পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ বা মন্তব্য স্থান পায়নি। চিঠিগুলোতে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। (কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে, নিজের মন্তব্য লিখতে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে বিবেকানন্দের নামটি উল্লেখ করেছেন।)[১৯] অথচ পত্রালাপের প্রসঙ্গে যেমন, *রামকৃষ্ণ* লেখার প্রসঙ্গেও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তেমনই তাঁর সতর্কতা ও তৎপরতার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা দেয়নি। তার দৃষ্টান্ত মিলবে দিলীপকুমার রায়ের লেখা *রম্যাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণ এ্যান্ড বিবেকানন্দ* প্রতিবেদনের প্রতিবাদে স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত চিঠিতে।

দিলীপকুমার রায়ের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল *প্রবুদ্ধ ভারত* পত্রিকার ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। প্রতিবেদনটি আগের অক্টোবর মাসের ভিলন্যভে রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। (রলাঁর দিনপঞ্জীতে সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৪ অক্টোবর, দিলীপকুমার লিখেছেন ২৫ অক্টোবর।) দিলীপকুমারের প্রতিবেদনটিকে রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত গ্রন্থরচনার প্রথম প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। সে সময়ে দিলীপকুমার ঘোষিত অরবিন্দপন্থী। তাঁর লেখা এই অনুপ্রাণিত প্রতিবেদনটি মুখ্য রচনারূপে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ প্রকাশ করতে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সম্ভবত উৎসাহ বোধ করেছিলেন।

দিলীপকুমারের প্রতিবেদনটি সম্পর্কে রলাঁ সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর আপত্তি

জানিয়েছিলেন। আলাপচারির ভঙ্গিতে লেখা প্রতিবেদনে রলাঁর জবানিতে এমন সব কথা বসানো হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর বক্তব্যই নয়, বরং বহুলাংশে বিপরীত। ছোটোখাটো বিচ্যুতি বাদ দিয়ে রলাঁ চারটি গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রথমটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। দিলীপকুমার লিখেছিলেন: রলাঁ রামকৃষ্ণকে নিয়ে লিখতে চান ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন জানাতে। তাঁর গ্রন্থ "কোনো কোনো মহলে প্রচুর ঈর্ষা ও গাত্রজ্বালা জাগিয়ে তুলেছে।" রলাঁর গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য *এই বিদ্বেষবিষকে প্রতিহত করা*। (to counteract this venom)[২০]। রলাঁ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন: "আমি এই রকম কিছুই বলিনি। আমি শুধু বলছিলাম *দা ফেস অব সাইলেন্স*-ই প্রথম বই যা আমার কাছে রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে উদঘাটিত করেছিল এবং সেজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারতের মহান চিন্তার বিষয়ে বই লিখতে যাচ্ছি মুখার্জিকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে নয়। এটা মুখার্জি সম্পর্কিত প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন রামকৃষ্ণসম্পর্কিত। আমি ভারতীয় বির্তকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছি না। ভারতের "নরদেব" সম্পর্কে আমার উপলব্ধ জ্ঞানকে পাশ্চাত্য জগতের সামনে আমাকে হাজির করতে হবে।"

দ্বিতীয় অভিযোগ, প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভাব সম্পর্কে। দিলীপকুমার লিখেছিলেন: রলাঁ বলেছিলেন, পশ্চিমের লোকেরা এশিয়ার মহামানবদের *পুরোপুরি খাটো* করে (to belittle wholesale) দেখার পক্ষপাতী হয়ে উঠছে এবং *একটু একটু করে এশিয়ার বিষয় সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে* (gradually losing all interest in things Asiatic)। রলাঁ লিখেছিলেন: "এ বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপের জনসাধারণ আজ যেমন, তেমন কখনো এতো আকৃষ্ট হয়নি। আর এই সত্য ঘটনাই পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদীদের উত্তেজিত করেছে। এবং আঁরি মাসিসের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসীকে দিয়ে *পাশ্চাত্যের সমর্থনে*-র মতো বই লেখাচ্ছে। মানুষ তখনই নিজের সমর্থনে নামে যখন সে আক্রান্ত হবার ভয় পায়। আজকের "পাশ্চাত্যপন্থীরা", যারা প্রাচ্যের অনুমিত বিপদ সম্পর্কে প্রকাশ্যে অভিযোগ করে, তাদের সেই মনোভাবই প্রমাণ করে যে প্রাচ্য

ইতিমধ্যেই তার স্থান করে নিতে শুরু করেছে।”

তৃতীয়টি, সোপেনহাওয়ার সোসাইটি সম্পর্কে রলাঁর বিরূপ মন্তব্য। দিলীপকুমার লিখেছিলেন: ইউরোপের এলিটরা মনের দিক দিয়ে আজ কোন স্তরে পৌঁছেছে তারই দৃষ্টান্ত হিশেবে রলাঁ নাকি সোপেনহাওয়ার সোসাইটির এক হোমড়াচোমরার উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাঁর একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের একটি উক্তি দেখে সম্প্রতি হোমড়াচোমড়া ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: সুন্দর উক্তিটি কার? বিবেকানন্দকে সোসাইটির এক বড়োকর্তাই জানেন না! (A big gun of the Schopenhauer Society asking who Vivekananda was?) রলাঁ প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন, তাঁর মুখে সোপেন-হাওয়ার সোসাইটি সম্পর্কে *অকরুণ উক্তি* (unkind words) দেওয়া হয়েছে। তাতে তাঁর বক্তব্য এমনভাবে বদলে গেছে যে তাতে তিনি বেদনাবোধ করেছেন। সোপেনহাওয়ার সোসাইটি ইউরোপের বড়ো বড়ো দার্শনিক সংঘগুলোর একটি, যে বিশেষভাবে ভারত সম্পর্কে আগ্রহী। গত বছর এই সোসাইটির আন্তর্জাতিক কংগ্রেসটি নিবেদিত হয়েছিল ভারতের উদ্দেশে। তার প্রকাশিত নতুন বর্ষপঞ্জীতে (Jahrbuch) ইউরোপ ও ভারত সম্পর্কে সম্মেলনের বিবরণ আছে। তাতে রলাঁর লিখিত *বিবেকানন্দ ও পল ডয়সেন* শীর্ষক প্রবন্ধও আছে। সোসাইটি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পাত্র। রলাঁ লিখেছিলেন: “বিবেকানন্দ যখন দেখা করতে এসেছিলেন, পল ডয়সন তখন তাঁর অনন্য-সাধারণ গুরুত্বে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন এবং পল ডয়সনের প্রতিষ্ঠিত সোপেনহাওয়ার সোসাইটির সদস্যরা তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতি হারিয়ে ফেলতে পারেন, রায়ের সামনে এতে অমি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু যাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি তাঁদের মনোভাবকে আঘাত দেবার ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল না। এর বিপরীত, আমার প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি অধ্যাপক হানসৎসিন্ট যে-উৎসাহদীপ্ত অনুভূতিতে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করেছিলাম।”[২১] অধ্যাপক হানসৎসিন্ট ছিলেন সোসাইটির ডিরেক্টর। প্রতিবেদনের *হোমড়াচোমড়া* (big gun) বলতে তাঁকেই বুঝিয়েছিল। রলাঁর আপত্তি সেখানেই। সোসাইটির সদস্যদের সম্পর্কে সাধারণভাবে *অকরুণ উক্তিটি* প্রযুক্ত হলে সম্ভবত রলাঁর ততোটা আপত্তি হতো না। কারণ পরে তাঁর *বিবেকানন্দ*-এর দ্বিতীয় খন্ডের পাদটীকায় তিনি নিজেই লিখেছেন:

"......বলতে গেলে, আমাকে সোপেনহাওয়ার গেজেলশাফট্-এর মহলে, বিবেকানন্দের নিমন্ত্রণকর্তা ও বন্ধু পল ডয়সনের শিষ্যদের, নতুন করে বিবেকানন্দের নামটি শেখাতে হয়েছে।"[২২]

চতুর্থ অভিযোগটি গান্ধী সম্পর্কে রলাঁর মন্তব্য এবং সেটি অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, যে সময়ে গান্ধী ও রলাঁর মধ্যে পত্রবিতর্ক চলছে আদর্শ ও কর্মের শুদ্ধতা ও নৈতিকতা নিয়ে, সেই সময়ে কোনো অসতর্ক মন্তব্য, বিশেষ করে ভারতে প্রকাশিত কোনো পত্রিকায়, রলাঁর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। দিলীপকুমার লিখেছিলেন, বিবেকানন্দ শেষ জীবনে যে সামাজিক সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং অকাল মৃত্যুর জন্যে যে কর্ম অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে, সেই প্রসঙ্গে রলাঁ নাকি বলেছিলেন: "তোমাদের সামনে এই যে জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে, তোমাদের বড় নেতারা, যেমন গান্ধী, কেন তা আরও গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন না?" বাক্যটি উদ্ধৃত করে রলাঁ লিখেছিলেন: "এটা হাস্যকর (absurd)। মহৎ অধিবিদ্যক মানসিকতার, উদার বুদ্ধিবাদের, শিল্প ও ভাবের গভীর উপলব্ধির অভাবের জন্যে গান্ধীকে আমি ভর্ৎসনা করতে পারতাম। কিন্তু যে সম্পর্কে তাঁকে একেবারেই ভৎর্সনা করা চলে না, তা হচ্ছে "সামাজিক সেবা" সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অভাব,—যে-সেবায় তাঁর শক্তির চরম সীমা পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। যদি গান্ধীর মধ্যে কোনো একটা সন্দেহাতীত পবিত্রতা, অহং-এর এক সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি, তাঁর সমগ্র সত্তার এক দিব্য বলিদান থেকে থাকে, তবে তা আছে তাঁর সামাজিক সেবায়। এই মহিমময় দৃষ্টান্তের জন্যে আমি তাঁর সামনে মাথা নত করি, তাঁর পায়ের ধুলো নিই। এখানে তাই দিলীপকুমার রায় আমার উপরে আমার প্রকৃত চিন্তার একেবারে বিপরীতই আরোপ করেছেন। আমি আরও ছোটো খাটো ভুলের উল্লেখ করতে পারতাম। এই সাক্ষাৎকারের অযথার্থতা দেখাতে এই যথেষ্ট এবং তিনি আর যা যা টুকতে ভুলেছিলেন তার সব কিছু সম্পর্কে আমি আর মোটেই বলতে চাইনে।"[২৩]

প্রতিবাদপত্রে রলাঁ অতি বিনয়নম্রতায় ক্ষমশীলের মতো লিখেছিলেন: "দিলীপকুমার রায়ের আন্তরিকতায় আমি সন্দেহ করি না; এ নিয়ে অলোচনার কোনো অবকাশ নেই। আর তাছাড়া, তাঁর প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করায় আমি দুঃখিত। দিলীপকুমার রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা আমার কাছে

অপ্রীতিকর; মানুষটি সে চমৎকার (charming), অতি উচ্চাঙ্গের গায়ক, সহজাত উজ্জ্বল গুণাবলি আছে, অভিপ্রায়ও সাধু, সবসময়েই আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি লিখেছেন সরল বিশ্বাসেই.....।"

স্বামী অশোকানন্দকে লেখার তিন দিন পর ৭ মার্চ রলাঁ দিলীপকুমারের লেখাটি সম্পর্কে মাডলিন শ্লেডকে জানিয়েছিলেন চিঠিতে 'পুনশ্চ' দিয়ে।[২৪] তাতে কিন্তু এতো মৃদু শব্দাবলি ব্যবহার করেননি। তিনি লিখেছিলেন: "দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কিছু উক্তির (terms) ব্যবহারে আমি রুষ্ট (indignant), সেটি প্রকাশিত হয়েছে কোনো এক ভারতীয় পত্রিকায়। তাদের কাছে আমি প্রতিবাদ করে লিখেছি। দিলীপকুমার মোটেই খারাপ ছোকরা (lad) নয়; সে চমৎকার এবং বুদ্ধিমান, কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রগলভ (frivolous)। তাকে যা বলা হয় তা সে বুঝে উঠতেও পারে না, পরে সে প্রায়ই অনিচ্ছাকৃতভাবেই, তাকে যা বলা হয় তার উলটোটাই লিখে বসে।" দিলীপকুমার রায় মিস শ্লেডের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। এখানে লক্ষণীয়, রলাঁ মিস শ্লেডের কাছে প্রতিবেদনটির নাম, বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির নাম উহ্য রেখেছেন। দিলীপকুমারের প্রকৃতি সম্পর্কে রলাঁ যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারে আলাপচারির পর তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন: "লঘুচিত্ত (léger) দিলীপকুমার রায়ের গালগপ্পো (racontar) নির্ভরযোগ্য নয়।"[২৫] যদিও সেবার আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল গান্ধী-প্রসঙ্গ। (দিলীপকুমার রায়ের *অনামী* গ্রন্থে এই সাক্ষাৎকারের আলোচনার দু'দিনের বিবরণে কিন্তু গান্ধী-প্রসঙ্গই নেই।)

রলাঁর প্রতিবাদপত্রটি *প্রবুদ্ধ ভারত* কর্তৃপক্ষ দিলীপকুমার রায়কে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তর একই সঙ্গে ছাপা হয়েছিল পত্রিকার জুন সংখ্যাতেই। প্রতিবেদনের ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সম্পর্কে দিলীপকুমার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। রলাঁর অভিযোগই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, প্রতিবেদনটি একটু তাড়াহুড়ো (little hastily) করে লেখা হয়েছিল। নিজের সমর্থনে শুধু এইটুকু বলেছিলেন: রলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে বই লিখবেন শুনে তিনি এতোটাই উৎসাহিত হয়ে

উঠেছিলেন যে, রলাঁর বই লেখার প্রেরণা এবং সোপেনহাওয়ার সোসাইটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি। বিবেকানন্দ সম্পর্কে অজ্ঞতার উল্লেখ করে সোসাইটির কোনো দার্শনিককে ছোটো করার মনোবাসনা ছিল না। সামাজিক সেবার আগ্রহের অভাব সম্পর্কে রলাঁর মুখে কটাক্ষমূলক মন্তব্যটি দেবার ধারণা যে কী ভাবে তাঁর মনে এসেছিল তা তিনি জানেন না। (I do not know myself. however. why I had the impression......)। সেজন্যে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন। এশিয়া প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক ইউরোপীয়দের অনীহা সম্পর্কে রলাঁর নিজের বক্তব্য তিনি ভুল করে ১৯২৭ সালের জুন মাসে সাক্ষাৎকারের সময়কার বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, একথা স্বীকার করেছিলেন। ইউরোপে থাকার সময়ে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, ইউরোপ লড়াকু দেশপ্রেম আর সংকীর্ণ জাতিপ্রেমের পথে চলেছে। আঁরি মাসিস, ভালেরি, নরম্যান এঞ্জেল এবং অন্যরা তা পুষ্ট করেছিলেন। তাই রলাঁ যখন এ ধরনের উগ্র দেশপ্রেমের মাথাচাড়া দেওয়াকে নিন্দা করেছিলেন, তখন তিনি তা অতি ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন, অভিপ্রেত অর্থের প্রতি মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে বই লেখার সংবাদে এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, অন্য বিষয়গুলোকে তুলনামূলক ভাবে তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন।

দিলীপকুমার *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সংশোধিত আকারে *অনামী* গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন রলাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে যুক্ত করে। কিন্তু তাঁর প্রতিবেদন ও গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য আছে।[২৩] মূল প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, রলাঁ বলেছিলেন: "মিঃ মুখার্জির রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ স্তুতি কোনো কোনো মহলে প্রচুর ঈর্ষা ও গাত্রজ্বালা জাগিয়ে তুলেছে। আমার এই বই লেখার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিদ্বেষবিষকে প্রতিহত করা।" এখানে "কোনো কোনো মহল" বলতে রলাঁ সঙ্গতভাবেই ভারতীয় মহল বুঝেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন: "আমি ভারতীয় বিতর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছি না।" (I am not going to mix myself up in Indian controversies.) ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইটি সম্পর্কে রামকৃষ্ণপন্থী ও ব্রাহ্মগোষ্ঠী উভয়েরই যে যথেষ্ট বিরূপতা ছিল রলাঁ

তা ভালোভাবেই জানতেন। তিনি তাই অতিশয় সতর্ক ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, দিলীপকুমার সংশোধনের পর *অনামী*-তে রলাঁর মুখের উক্তিটি এই রকম দাঁড় করিয়েছেন: "....ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসায় য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক খুবই রাগ করে। আমি তাদের প্রতিবাদে একটা বই লিখব ঠিক করেছি।" বই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রলাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও দিলীপকুমার তাঁর বক্তব্যই বজায় রেখেছেন, কেবল *কোনো কোনো মহল*-কে *য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক*-এ পরিবর্তিত করেছেন; রলাঁর অপর তিনটি আপত্তির বিষয়:—ইউরোপের প্রাচ্যবিরোধিতার মানসিকতা, সোপেনহাওয়ার সোসাইটির প্রতি কটাক্ষ এবং গান্ধীর সমাজসেবার আগ্রহের অভাব সম্পর্কিত রলাঁর উক্তিগুলো একেবারে বাদ দিয়েছিলেন।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনের শেষ অবধি রলাঁ সুইট্জারল্যান্ডে ছিলেন না, বোনের সঙ্গে ফ্রান্সে পারী ও নিভের্নেয় গিয়েছিলেন। তিনি এ সময়টা বাইরে থাকবেন তা জানিয়ে রেখেছিলেন মাডলিন শ্লেডকে ৭ মার্চের চিঠিতে। গান্ধী ইউরোপে এলে, সুইট্জারল্যান্ডে তাঁর পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল জুনের প্রথম দিক। কিন্তু গান্ধী ইউরোপ আসার পরিকল্পনাই বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাই বোনের সঙ্গে নিভর্নেয় রলাঁ কিছু বৈষয়িক ব্যাপারের সমাধান করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় খন্ড *বিবেকানন্দ* লিখতে। *রামকৃষ্ণ* ও *বিবেকানন্দ* প্রাথমিক খসড়ার মধ্যে কালব্যবধান প্রায় ছয় সপ্তাহ।[২৭]

পুরো জুলাই ও অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত লেখার কাজ চলেছিল অব্যাহত ভাবে। কিন্তু মন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিল না। জুলাই মাসের ২০-৩০ তারিখ পর্যন্ত ভিয়েনার সোনটাসবের্গে যুদ্ধবিরোধীদের আন্তর্জাতিকের অধিবেশন বসতে চলেছে, প্যান-জার্মানবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভিয়েনায় সদ্যসমাপ্ত শুবার্টের উৎসব উপলক্ষে দুই দেশের সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই Anschluss-এর, সোজাসুজি অস্ট্রিয়া-জার্মানির সংযুক্তিকরণের, ঘোষণা করা হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে খোদ অস্ট্রিয়া সরকার। বৃহত্তর জার্মানি যদি পুনর্গঠিত হয়, তাহলে সেখানে প্রাধান্য পাবে

ধর্মধ্বজী, রাজতন্ত্রী ইত্যাদি অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। অস্ট্রিয়া সরকার যুদ্ধপূর্বযুগের কূটনীতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনছে প্রতিশোধকামী জাতীয়তাবাদের বিপদ আড়াল করতে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অন্যান্য বুর্জোয়া সরকারের ঐকতানে যোগ দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এই অবস্থায় ভিয়েনায় যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন করার ফলাফল কী হবে তা নিয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিল এবং সে আশঙ্কা অনেকখানিই বাস্তবে দেখা দিয়েছিল। তার প্রমাণ দিতেই যেন ৭ অগাস্ট রলাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভাই মুকুন্দ। রাজেন্দ্রপ্রসাদের বয়স তখন তেতাল্লিশ। তিনি ভিয়েনায় গিয়েছিলেন গান্ধীর প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগ দিতে। তাঁর কাছে ছিল রলাঁর জন্যে গান্ধীর লেখা পরিচয়পত্র এবং তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন গান্ধীর নির্দেশেই। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আক্রমণ করেছিল এক অস্ট্রিয়ান জাতীয়তাবাদী, ডান্ডার ঘায়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে বাঁচাতে গেলে শ্রীমতী স্টান্ডেনাঠ্কেও তারা রেহাই দেয়নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদের কপালে তখনো তুলোর ব্যান্ডেজ।[২৮]

অগাস্ট মাসের একেবারে শেষ দিকে একদিনের জন্যে এসেছিলেন ভিয়েনায় অস্ত্রোপচারের পর প্রতিমা দেবী ও তাঁদের পালিতা কন্যাকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর তার পর দিনই (৩০ অগাস্ট) রামকৃষ্ণমিশনের "তরুণ পন্ডিত" ও বৈজ্ঞানিক বশী সেন। তিনি সম্প্রতি প্রোটোপ্লাজমের উপরে তাপের প্রভাব নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বশী সেনের বৈজ্ঞানিক কর্ম সম্পর্কে রলাঁ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তাঁর প্রতি আরও আগ্রহ ছিল ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার জন্যে। তাঁদের দুজনের সঙ্গেই চিঠির মাধ্যমে রলাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। এবার বশী সেনের সঙ্গে সোজাসুজি সাক্ষাৎকার। *বিবেকানন্দ* লেখার সময়েই এই সাক্ষাৎকার তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। বশী সেনের চেহারা দেখে তিনি লিখেছেন: "মুখখানি উদ্দীপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, অত্যন্ত আকর্ষণীয়: নিগ্রো-ইতালীয় টাইপ, কালো বাবরি চুল,—যেন নৃত্যপর এক কৃষ্ণ (un Krishna dansant)।"

বশী সেন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের শিষ্য। রামকৃষ্ণকে তিনি দেখেননি, বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল না।

কিন্তু সারদা দেবীকে খুব ভালো করে জানতেন। তাঁর মতে, সারদা দেবীর কেবল উপস্থিতি, কেবল হাসিই দিব্যানন্দে অবগাহন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল ভগিনী ক্রিস্টিনের সঙ্গে, পশ্চিমের নারী শিষ্যাদের মধ্যে যিনি ছিলেন বিবেকানন্দের মনের সবচেয়ে কাছাকাছি। ভগিনী ক্রিস্টিনকে দিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লেখানোর চেষ্টায় আছেন এবং সেই স্মৃতিকথা রলাঁকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বশী সেন ছিলেন জগদীশচন্দ্রের ছয় বৎসরের ছাত্র। দীক্ষা নেবার পর তিনি বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কেবল অধ্যাত্মমার্গে বিচরণ করার জন্যে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন: তাঁর নিজস্ব মৌলিক মানসিক শক্তিটির অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনন আরও পূর্ণতা লাভ করে ভগবানের আরও কাছে পৌঁছোবে।

বশী সেন বলেছিলেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম তাঁর আধ্যাত্মিক সর্বাগ্রে-করণীয় কর্ম থেকে বিক্ষিপ্ত করে না এবং সেই কর্মই তাঁকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে। রাজযোগ যা শেখায়,—সেই কুলকুন্ডলিনীর জাগরণ—সেই তুরীয়ানন্দ উপলব্ধির প্রবণতা জানতে তিনি বৈজ্ঞানিক যথাযথতার সঙ্গে কম খোঁজাখুঁজি করছেন না।

সমস্ত লৌকিক উপাখ্যান বর্জন করে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রকৃত ব্যক্তি-পরিচয়টিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মতো বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয় বস্তু বশী সেনের মধ্যে বর্তমান। তাই তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন রামকৃষ্ণের জীবনকে উপন্যাস করে তোলার (d'avoir romancé) জন্যে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে রলাঁর প্রত্যয় হয়েছিল, একজন ভারতীয় একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তির দেবত্বে পরম বিশ্বাসী এবং আপস না-করে সেই ব্যক্তির দৈহিক, এমন কি নৈতিক বাস্তবতার পর্যবেক্ষক হতে পারে। আনন্দোচ্ছ্বসিত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বশী সেন রলাঁকে শুনিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণের সবচেয়ে অনুরক্ত ভক্ত গুরুকে কেমন করে "বুড়োটা", "দেড়ে", "পরমহংস" বলে উল্লেখ করতে পারতেন। বিবেকানন্দের প্রতিভাকে পুজো করলেও তাঁর স্বভাবের স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতিগুলো হাসতে হাসতে বর্ণনা করতে বশী সেনের আটকায়নি। তাঁর স্বভাবের আচরণ পরদিন কী হবে, তা অন্যে দূরের কথা, স্বয়ং বিবেকানন্দ নিজেও জানতেন না। হতভম্ব হয়ে একবার ভগিনী

ক্রিস্টিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'কিন্তু আপনি যে গতকাল অন্য কথা বলেছিলেন?'' বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন: ''বটেই তো! গতকাল ছিল গতকাল।'' এতো পৃথক হয়েও রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শিষ্যদের মনে এক অচ্ছেদ্য একত্ব লাভ করেছেন। রামকৃষ্ণ বলতেন: ''আমি শক্তিমান (le potentiel), আর সে শক্তি (le dynamisme); আমি নারী (la femme), আর সে পুরুষ (l'homme)।'' রামকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বজনীন উপলব্ধির বিকিরণ। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন সক্রিয় শক্তি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিও,—যে বুদ্ধিকে কিছুই সীমাবদ্ধ করতে বা থামাতে পারে না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জন্যে কালীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন: ''আমার সকল শিষ্যকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত কর। শুধু ওটাকে বাঁধ মায়ার বাঁধনে।'' বশী সেন গিরিশচন্দ্রের একটি সরস উক্তি শুনিয়েছিলেন রলাঁকে: ''শুধু দুজন মায়ার বন্ধন এড়িয়ে গেছেন। একজন বিবেকানন্দ,—তিনি খুবই মোটাসোটা (trop gros); অন্যজন নাগমহাশয়,—তিনি খুবই ছোটোখাটো (trop petit)।'' আলাপচারিতে রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের বর্তমান পরিচালক স্বামী শিবানন্দের প্রসঙ্গে বশী সেন অকুণ্ঠভাবে তাঁর স্নিগ্ধতা, তাঁর প্রশান্তির প্রশংসা করেছিলেন, ''যেন বুদ্ধের দুই হাত প্রসারিত''। অথচ তিনি নাকি এমনটি ছিলেন না। তিনি ছিলেন কিছুটা রূঢ়, কাউকে আমল দিতেন না। তিনি এমনটি হয়ে উঠেছেন সম্প্রদায়ের প্রধান হবার পর থেকে। বড়ো বড়ো সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব মিশে যায় যে কাজের তাঁরা যোগ্য তারই মধ্যে।[২৯]

বশী সেনের ঠিক চার দিন পরে (৩ সেপ্টেম্বর) সস্ত্রীক আবার এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্র সদ্য কলিনে চিকিৎসা করিয়ে এসেছেন। কিন্তু রলাঁর মনে হয়েছিল, তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। এবারকার আলাপে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠেছিল একেবারে গোড়াতেই। জগদীশচন্দ্র নিজের কর্মশক্তি ও তৎপরতার জন্যে ক্ষত্রিয়ত্বের গর্ব করতেন; বিবেকানন্দও যে তাঁরই মতো ক্ষত্রিয়বর্ণের ছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। (ক্ষত্রিয়=কায়স্থ এই সরলীকরণ রলাঁ মেনে নিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র শুধু নন, ধনগোপালও কায়স্থদের ক্ষত্রিয় বর্ণ বলেছেন।)

বিবেকানন্দকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বলেছিলেন বিনয়ের ব্যাপারে বিবেকানন্দের কোনো আতিশয্য ছিল না। জগদীশচন্দ্রেরও ছিল না। ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উচ্ছল সমস্ত শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তনে সেদিন জগদীশচন্দ্র মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এর পিছনেও ছিল বিবেকানন্দের প্রেরণা। বিবেকানন্দ বলতেন: "দারিদ্র ও ত্যাগের সমর্থন করাটা যেমন খুব ভালো, তেমনি খুব ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করাটাও : সব কিছুরই সময় আছে; আজ আমির, কাল ফকির।" গান্ধীর তপশ্চর্যার ও প্রকৃতিতে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি জগদীশচন্দ্রের কোনোই সহানুভূতি ছিল না। জাতির বীর্যহীনতা ও ভীরুতার অপবাদে তাঁর গভীর বেদনাবোধ ছিল; বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণ করেই তিনি বলেছিলেন, "একটা জাতি যা, তার চেয়ে বীর বা ভীরু যা তাকে বলা হয়, সে তাই হয়।" যেদিন থেকে নিজের সাহস সম্পর্কে বাংলাদেশের চেতনা হয়েছে সেদিনই সে সাহস ফিরে পেয়েছে। জগদীশচন্দ্র রলাঁকে ফাঁসির মুহূর্তে বাঙালী বিপ্লবীদের সাহসিক আচরণের একাধিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন, আর শুনিয়েছিলেন বাঘবশকারী শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের (সোহং স্বামী) কাহিনী। রলাঁর বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি জাতির শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হবার পেছনে বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল কতোখানি।

এরপরেই আলোচনা হয়েছিল রাজযোগ নিয়ে। রাজযোগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের রচনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রলাঁ বেশ বিব্রত বোধ করেছিলেন এই দেখে যে, বিবেকানন্দের মতো শক্তিশালী আন্তরিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন কিছু অতিলৌকিক (surnaturel) ক্ষমতাকে স্বীকার করেছেন যা রূপকথাসুলভ (contes de fées), বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা একেবারেই মানা চলে না। সেইজন্যে রলাঁর মনে কিন্তুভাব ছিল। এবং জগদীশচন্দ্রের আলোচনায় তিনি খুশি হয়েছিলেন, নিজের মতেরই সমর্থন পেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, রাজযোগে বিরাট শক্তিলাভ হয়, কিন্তু তা একটা সীমা পর্যন্ত, তার বাইরে নয় (mais ne pas au-delà d'une certaine limite)। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অরবিন্দের যোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উল্লেখ করেছিলেন। অরবিন্দের উচ্চতর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও, বিশ বছরের নির্জনবাসে ভারতের মুক্তির জন্যে তিনি যে

অলৌকিক ফলের আশা করেন তাতে জগদীশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "যোগের মাধ্যমে যদি এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হতো তাহলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না তা বোঝা যায় না।" জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রলাঁর এই প্রশ্নে মতৈক্য ঘটেছিল।[৩০]

এর কয়েক দিন পরেই ১৬ সেপ্টেম্বর এসেছিলেন সি. এফ. এন্ড্রুজ, যিনি একই সঙ্গে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের কর্মসঙ্গী। তিনি এসেছিলেন জেনিভায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শক্তিসমূহের এক কংগ্রেসে যোগ দিতে। সেখান থেকে ফিরে যাবেন ইংল্যান্ডে। তাঁর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রলাঁ মন্তব্য করেছেন: "সমস্ত পীড়িতের পক্ষ সমর্থন ও প্রেমের জন্যে দেশদেশান্তরে তিনি এক অনন্ত অভিযাত্রী।" সেদিনকার আলাপচারিতে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণপন্থীদের প্রসঙ্গও উঠেছিল। কারণ অসহযোগ আন্দোলনের বিগত বছরগুলোয় বিভিন্ন অভিযানে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তা সে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গেই হোক আর রামকৃষ্ণপন্থীদের সঙ্গে হোক। রামকৃষ্ণপন্থীদের সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। যেখানে সামাজিক সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন, ভারতের সেসব জায়গাতেই তাঁদের সাক্ষাৎ মেলে। তিনি বলেছিলেন, রামকৃষ্ণপন্থীরা সবসময়েই তাঁদের ধর্মীয় চর্চাকে কোনো মূর্তির উপাসনার (Culte de quelque image) সঙ্গে যুক্ত করেন, পক্ষান্তরে গান্ধীপন্থীদের তেমন কিছু নেই। কিন্তু পালটা হিশেবে তাঁরা ধর্মীয় গান পছন্দ করেন। রলাঁ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীর আত্মিক বন্ধন (le lien qui rattache) কোথায়? এন্ড্রুজ উত্তরে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন: "নরনারায়ণ" (Dieu-Narajana), আর্ত, দরিদ্র ও পীড়িত-নারায়ণের মহান মন্ত্রটি গান্ধী গ্রহণ করেছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে।

মাদ্রাজের কিলপাংক থেকে এ. এ. পল রলাঁকে ফেডারেশন অব ইনটারন্যাশনাল ফেলোশিপ সম্পর্কে নিয়মিত পুস্তিকা পাঠাতেন। সেপ্টেম্বর মাসে রলাঁকে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিষ্ঠানের পত্রিকার জন্যে কিছু লিখতে। প্রতিষ্ঠানটি ভারতে গড়ে উঠেছে যুবশক্তির একটা সেরা অংশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মিলনকে বাস্তব করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে, যা ছিল বিবেকানন্দের

মহান নিত্য চিন্তা। দু'বছর আগেই রলাঁ এই সংগঠনটির কথা কে. টি. পলের কাছ থেকে জেনেছিলেন এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজের মতামতও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার সংকীর্ণ চরিত্র অক্ষুণ্ণই আছে। তার আয়োজিত প্রতিটি সম্মেলনে খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইসলাম, জৈন, থিওসফি, এমনকি গান্ধীবাদের প্রতিনিধিরা সমবেত হন। কিন্তু একবারও সেখানে রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করা হয় না, রামকৃষ্ণ-মিশনকে পাশ কাটানো হয়। এ. এ.পলকে রলাঁ (৩০সেপ্টেম্বর) উত্তরে লিখেছিলেন

> ....আমি সানন্দেই লিখব। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে ফেডারেশন ভুলে আছে সেই দুই মহান ভারতীয়কে—যাঁরা সর্ব ধর্মের মিলনের কথা শুধু ভাবেনই নি, সবচেয়ে বিশাল, সবচেয়ে উদার ও সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে তার উপলব্ধি করেছিলেন .....এই ভুলে-থাকার মধ্যে এক গভীর অবিচার আছে।......যাঁর প্রেম ঈশ্বরের প্রতিটি রূপকে আলিঙ্গন করেছিল,—সেই পরমহংসের পবিত্র মুখচ্ছবি, এবং মহান শিষ্যের প্রচন্ড বাণীর সেই অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনি মনে জেগে না উঠলে,আজ গোটা পৃথিবীতে বিশ্বজনীন ধর্মীয় মিলনের কথা বলাটাই আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। আমি বুঝি, তাঁরা দুজনেই আপনার ফেডারেশনের চেয়ে বড়ো ভাবে ধর্মীয় মিলন, এবং এমন কি, ধর্মীয় মনের মিলনের কল্পনা করেছিলেন: কারণ তাঁরা সেখানে স্বাধীন যুক্তি ও বিজ্ঞানের,—সত্যের সমস্ত আন্তরিক ও নিরাসক্ত অনুসন্ধান সমেত মনের যা কিছু দিব্য—তার প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন।[৩১]

ভারতীয় অভ্যাগতরা ছাড়াও এ সময়ে রলাঁর কাছে বন্ধু ও পরিচিতজনের আসার বিরতি ছিল না। সেজন্যে তাঁর লেখার কাজে এবং মনঃসংযোগে বিশেষ বাধা ঘটছিল। তিনি চাইছিলেন নিরঙ্কুশ নির্জনতা। কিন্তু তার এমনই অভাব বোধ করেছিলেন যে দিনপঞ্জীতে না লিখে পারেননি: "বন্ধুরা আমাকে বড়োই ক্লান্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের দেখলে আমি খুশী হই, কিন্তু আমার নির্জনতার প্রয়োজন আছে, সেই নির্জনতা অনেকদিন ভঙ্গ করা চলবে

না।......এই সব বিক্ষিপ্ততার মধ্যে শুরু-করে-দেওয়া দীর্ঘ কাজের সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ নয়, তার জন্যে প্রয়োজন পরিপূর্ণ মনঃসংযোগ। তবুও রোজ সকালে এক চাপা উত্তেজনায় আমি চিন্তার সূত্রকে জোড়া দেবার চেষ্টা করছি।" এবং এরই মধ্যে *রামকৃষ্ণ* ও *বিবেকানন্দ*-এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খশড়াটি তিনি তবু শেষ করেছিলেন ১২ অক্টোবর।

কিন্তু খশড়া দুটিকে সংশোধন করে টীকাটিপ্পনী দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আরও নিরুদ্বেগ অবকাশের প্রয়োজন ছিল। কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ বিষয়ক ব্রাহ্মগোষ্ঠীর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অতিশয় সতর্ক ছিলেন; ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি তা বিচারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং সেজন্যে রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র প্রসঙ্গ একাধিক বার কাটা-ছেঁড়া করতে হয়েছিল। তাছাড়া, রামকৃষ্ণের জীবনসম্পর্কিত আরও কিছু তথ্যের সমর্থনের প্রয়োজনও ছিল। খশড়া শেষ হবার মুখেই তিনি তাই চিঠি লিখেছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে (শ্রীম) ১০ অক্টোবর।[৩২] তাতে তিনি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে রামকৃষ্ণের পুথিগত শিক্ষার অভাব ছিল। তিনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষা (culture) ছিল মৌখিক। কোনো ভারতীয়কে বোঝানোর প্রয়োজন হয় না এই মৌখিক শিক্ষাদীক্ষা কাকে বলে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে এর তাৎপর্য বুঝে নিতে পারে। কিন্তু কোনো ইউরোপীয়ের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে ওঠা কঠিন। তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষার মূলে কী কী উপাদান ছিল? সেই সব উপাদানের ধ্রুপদী ভিত্তি কি মহৎ ধর্মীয় উপদেশাবলি এবং বাংলার জনপ্রিয় পদ-গান? রলাঁর কাছে এটাই ছিল বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। রামকৃষ্ণ শিশুকালে যে কাব্য ও গানের পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন তার প্রধান উৎস কী কী? রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক যে গানগুলোর উল্লেখ করা হয়, সেসব কি সুপরিচিত কবিদের লেখা এবং সেসব কি বৈষ্ণব সাহিত্যের অর্ন্তগত? রামকৃষ্ণ কোন কোন ধর্মীয় নাট্যে অভিনয় করেছিলেন কিংবা নাট্যের অভিনয় দেখেছিলেন?

সেইসঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন *কথামৃত*-এ উল্লিখিত গানের রচয়িতা প্রেমদাস, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্রের পরিচয় এবং কয়েকটি গানের রচয়িতার নাম। রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও অন্য কোনো প্রাচীন কবির

উল্লেখই নেই। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, রামকৃষ্ণ কি তাঁদের জানতেন না? রলাঁর মতে, তাঁদের গানে, বিশেষ করে চণ্ডীদাসের গানে, ভক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, তাই রামকৃষ্ণের পক্ষে অতীন্দ্রিয় প্রেমের এই বিস্ময়কর প্রকাশের প্রবল ভালোবাসাই তো প্রত্যাশিত ছিল।

এ ছাড়াও তিনি শ্রীম-র কাছে জানতে চেয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাতের বছরটি। স্বামী অশোকানন্দ তাঁকে জানিয়েছিলেন ১৮৬৯ সাল কিংবা ১৮৭০ সাল, পরে বলেছিলেন ১৮৬৩ সাল। কিন্তু শেষের তারিখটি রলাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি। কালিদাস নাগ তাঁকে জানিয়েছিলেন সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৬৪-৬৫ সালের মধ্যে।[৩৩] রলাঁর অতিরিক্ত আরও প্রশ্ন ছিল দুটি: কিছু কিছু গান (বিশেষ করে নরেনের কণ্ঠে গাওয়া) ব্রাহ্মসমাজের গানের তালিকাভুক্ত, একথা কি সত্যি? রামকৃষ্ণের উপরে চৈতন্যদেবের প্রভাবের কথা বলা হয়, সে প্রভাব তাঁর উপর কীভাবে পড়েছিল? গিরিশচন্দ্রের কোনো নাটক চৈতন্যদেবের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল কি না। (গিরিশচন্দ্রের নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে কি না তাও জানতে চেয়েছিলেন।)

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রলাঁ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার জন্যে নিবিষ্টচিত্ত হতে। রলাঁর নিজের কথায়: "গত কয়েক মাস আর কোনো কিছুতেই মন দিচ্ছি না। আমার মনপ্রাণ নিবিষ্ট হয়ে আছে আমার কাজে।" সেই কারণেই তিনি সে সময়ে যুগোশ্লাভিয়ার নিহত ক্রোশিয় নেতা স্তেপান রাদিচের মেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে যেতে দ্বিধা করেন নি। স্তেপান রাদিচ রলাঁর *মহাত্মা গান্ধী* অনুবাদ করেছিলেন এবং তার ভূমিকা লিখেছিলেন। স্তেপান রাদিচ গান্ধীর শান্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে চাইছিলেন পিতার রাজনৈতিক মতামত ইউরোপে পরিচিত করাতে এবং সে কাজে রলাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন খোঁজখবর ও যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে। রলাঁ ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি যে কাজে ডুবে আছেন, সেই কাজের জন্যেই সাহায্য করতে অপারগ। তিনি স্তেপান রাদিচের মেয়েকে সোজাসুজি গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৩৪]

কিন্তু চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটছিলই। পুলিশী হামলায় লালা লাজপত

রায়ের মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছেছিল রলাঁর কাছে। ১৯২৪ সালে একাধিক বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল রলাঁর।[৩৫] এবং তাঁর দেশপ্রেমে, তাঁর ব্যক্তিত্বে রলাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বভাবতই তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসার কথা। রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন: ‘‘কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বমুহূর্তে এই হত্যাকান্ডের ফলাফল অনুমান করা যায়। এই মৃত্যু এক প্রতীক। তেইশ বছর আগে তাঁর খামখেয়ালি গ্রেপ্তারে বাংলায় অভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছিল; ১৯০৭ সালে তাঁকে দ্বীপান্তরিত করা হয়; মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতে তাঁর থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এই মহান দেশপ্রেমিকটি অবশ্য ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না-করে ‘‘ডোমিনিয়ন’’ সরকারী যন্ত্র সংগঠিত করার পক্ষে সবচেয়ে সমর্থ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের সামনে, যাদের সঙ্গে আপস করা অসাধ্য।’’ তার কয়েক দিন পরেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লিগের আবেদনে তাঁকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির কাছে একটি বাণী পাঠাতেও হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লিগের বের্লিনের কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে পরের বছর জুলাই মাসে পারীতে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে অন্যতম সভাপতির পদগ্রহণের অনুরোধ জানানো হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশ্য সে প্রত্যাখ্যান নীতিগত কারণে এবং সে কারণটিও তিনি স্পষ্ট করে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৬]

শ্রীম-কে লেখা চিঠির উত্তর এসেছিল প্রায় আড়াই মাস পরে।[৩৭] ততোদিন রলাঁ *রামকৃষ্ণ* সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় *স্বামী বিবেকানন্দ* নামে ইতিমধ্যে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন: ‘‘আমি বেশ কিছু দিন ধরে তাঁদের (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) বিচার-বিশ্লেষণ করছি; তাঁদের মনের কিছুটা গ্রীষ্মমন্ডলসুলভ প্রাচুর্য এবং তাঁদের মধ্যেকার অতলস্পর্শী ঈশ্বরত্বের কারণে (বিশেষ করে রামকৃষ্ণের মধ্যে), কোনো ইউরোপীয়ের কাছে যতোই কঠিন হোক না কেন, আমি মনস্থ করেছি, আর এক রচনায়, তাঁদের মুগ্ধকর সৌন্দর্যের আভাস দেবার।[৩৮] বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: ‘‘আমার মতে, এই প্রথম কোনো ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ে ধ্যানের প্রাধান্য

ভেঙে ফেলা হয়েছে। যন্ত্রণা অপেক্ষা করে না; তারই জন্যে বিসর্জন দিতে হবে প্রশান্তি এবং ধ্যানময় স্বপ্ন, এমন কি স্বাস্থ্যও (যদি প্রয়োজন হয়) যাতে বেদনাকে লঘু করা যায়।" মনে হয়, বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল মুখ্যত ইউরোপীয় পাঠকদের উদ্দেশে।

শ্রীম-র উত্তরটি ছিল অতি দীর্ঘ, তাতে তিনি রলাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষাদীক্ষা কী উপাদানে গড়ে উঠেছিল ?—প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন: "ঠাকুর বলতেন যিশু চৈতন্য বা আমি শিক্ষাদীক্ষা বা সাধনার ফল নই" (not the fruit of culture or Sadhana)। অবতার অনন্তের চরমতম প্রকাশ। তাঁর কথাই বেদ বা প্রত্যাদেশ (Revelations)। মন্দিরের পন্ডিতরা বিস্মিত হয়ে যিশু সম্পর্কে বলেছিল, ওর অক্ষরজ্ঞান নেই, কিন্তু ওর মতো কথাতো কেউ বলেনি।" আর তখন যিশুর বয়স মাত্র বারো। এমন অ-শিক্ষিত বালক যিশুর সঙ্গে ইউরোপীয়রা খুবই পরিচিত। ঠাকুর নিজে তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, যখন তাঁর বয়স এগারো, মা ও অন্যান্য নারী সঙ্গিনীদের সঙ্গে আনুরে মন্দিরে যাবার পথে সমাধির অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন। তাঁকে একবার উপলব্ধি করলেই সব কিছু জানা হয়ে যায়। তাই একথা সত্য নয় (ঠাকুর যেমনটি ভক্তদের নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন), তিনি শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে, যিশুর ক্ষেত্রেও, তিনি যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছেন. জীবনবৃক্ষে প্রথমেই ধরেছিল ফল (ঈশ্বর-উপলব্ধি), ফুল ধরেছিল পরে, সাধনা, শিক্ষাদীক্ষা, গুরু, গান, শাস্ত্র সবই ছিল মুমুক্ষুদের উপলব্ধির পথনির্দেশ।

বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মের ভিত্তি নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি,—যার লক্ষ্য ঈশ্বর-উপলব্ধি। ঠাকুর বারংবার বলেছেন, এই নিষ্কামধর্ম প্রকৃত জীবনে পৌঁছাবার সাধন মাত্র, জীবনের সাধ্য নয়, সাধ্যবস্তু ঈশ্বরদর্শন (to see God)। নিষ্কাম কর্ম থেকে আসে শুদ্ধতা, শুদ্ধতা নিয়ে যায় ঈশ্বরদর্শনের পথে। কথায় ও কাজে মিশন এটার উপরেই জোর দেয়। গান্ধীজির স্বদেশপ্রেমিক কর্মও একই রকম নিষ্কাম। কথার উপরে তেমন জোর না দিলেও লক্ষ্য কিন্তু একই।

প্রভাতসূর্য যেমন প্রকৃতিকে সোনার রঙে রাঙিয়ে তোলে, অবতারও তেমনি (যেমন ঠাকুর শিখিয়েছেন) তাঁর পরিবেশকে—শাস্ত্র, ব্যক্তিত্ব, স্থান,

মাতৃভূমি এবং সমস্ত কিছুকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলেন। তিনি জীবনের গভীর আত্মিক অর্থ পুনর্জীবিত ও ব্যাখ্যা করেন—যে জীবন ধারণ করেছিলেন পূর্ববর্তী অবতারগণ, তাঁদের যে-জীবনের অভিজ্ঞতা রক্ষা করে আসছেন শাস্ত্রসমূহ বা কবিরা। একমাত্র তিনি অবতীর্ণ হন পূর্ববর্তী অবতারদের ব্যাখ্যাতা রূপে,—তিনিই দিব্য ব্যাখ্যাতা। অবতার শাস্ত্র কিংবা দিব্য গুরুদের কাছ থেকে শেখেন না। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। যিশু ধর্মবিধি ও ধর্মপ্রচারকদের ব্যাখ্যা করেছিলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বেদ-পুরাণ-তন্ত্র- বাইবেল, সেইসঙ্গে যিশু-বুদ্ধ-চৈতন্য-অবতারদের দিব্য ব্যাখ্যাতা (Divine Interpreter)। এইভাবে এই সংসারে তাঁর জীবন-বৃক্ষে প্রথমে ধরেছিল ফল, তারপরে ফুল। তিনিই শিখিয়েছিলেন, যে পরিবেশ সাধারণ মরণশীলকে প্রায় অভিভূত করে, ঈশ্বর-মানবের (God-man) উপরে তার কোনো প্রভাব নেই। "স্বর্গরাজ্যের জন্যে ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর-মানব নপুংসক হয়েই জন্মান (is a born eunuch for the Kingdom of God)।"

যে পদকর্তাদের পরিচয় রলাঁ জানতে চেয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় দিয়ে শ্রীম লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্তাদের গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু গানের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হবে *কথামৃত*-এর ইংরেজী অনুবাদের পরবর্তী খণ্ডে। গোপীপ্রেমের গান শুনলে ঠাকুর প্রায়শই সমাধিস্থ হতেন। এইসব গানের বেশ কিছু গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য যাত্রাওয়ালাদের যাত্রার গান। *সখি, সে বন কতদূর* এবং *রে মাধবী, আমায় মাধব দে* গান দুটি বৈষ্ণব কবিদের ভাবে অনুপ্রাণিত যাত্রার জন্যে রচিত গান। অন্য দুটি গান The Sacred name of God and His power এবং The Song of the machine চণ্ডী-প্রসঙ্গের গান। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। (তাঁদের নাম জানার চেষ্টায় আছেন।) তবে দ্বিতীয় গানটি রামকৃষ্ণের কণ্ঠে গীত হওয়ায় বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়, তার আগে সামান্য কিছু লোক গানটির খোঁজ রাখত।[৩৯]

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, তিনি যাত্রা দেখতেন। যাত্রা হচ্ছে মুখ্যত গীতের মাধ্যমে নাট্যাভিনয়। একবার অভিনেতার অনুপস্থিতিতে যাত্রাদলের অধিকারীর অনুরোধে কিশোর বয়সে তিনি শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু অভিনয় করতে করতে সমাধি ঘটায় তিনি চেতনা হারিয়ে

ফেলেছিলেন। লোকে ভেবেছিল তিনি মরে গেছেন। যাত্রাভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই তাঁর প্রথম ও শেষ অভিনয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে শ্রীম জানিয়েছিলেন, উভয়ের সাক্ষাতের অনুমিত বছর ১৮৬৩ তিনিই স্বামী অশোকানন্দকে বলেছিলেন। কারণ, ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি বেদিতে কেশবচন্দ্রকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হন ১৮৬২ সালে এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন ১৮৬৫ সালে। তাই সময়টা হবে ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে। ১৮৬৪-৬৫ সালে ঠাকুর সখীভাবের সাধনা করেছিলেন এবং ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন সাধনার পর্ব চলেছিল। তবু তিনি মাঝে মাঝেই মন্দিরের কাছাকাছি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত শুনতে যেতেন, বিষয়ী লোককে তিনি এড়িয়ে চলতেন।

একথা সত্য যে, ঠাকুরের সময়ে যেসব গান গাওয়া হতো তার বেশ কিছু ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের রচনা। যেমন, *চিদাকাশে হল পূর্ণ চন্দ্রোদয় হে* গানটি। এটি এবং অন্যান্য কয়েকটি গান প্রেমদাস (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রেরণায়। কারণ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা প্রায়শই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, তাঁরা অদ্ভুত অদ্বিতীয় ঈশ্বরচেতনায় অভিভূত হতেন। ১৮৮২ সালের আগে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে নরেন ব্রাহ্মসমাজের সভায় যোগ দিতেন। তাঁর মুখে গাওয়া ব্রাহ্মসমাজের গান *সত্য শিব সুন্দর ভাতি হৃদিমন্দিরে* গানটি শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

চৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে, ১৮৫৮ সালের পর থেকে মা, রাধা এবং অবতার চৈতন্যের প্রতি প্রেমাবিষ্টতা ঠাকুরকে "পাগল" করে তুলেছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর দেখা গেছে তিনি গাইছেন, নাচছেন, এমন কি সমাধিস্থ হয়েও পড়ছেন। ঠাকুরের জীবন, তাঁর উদগ্র ধর্মপ্রাণতা, তাঁর ভাবাবিষ্ট প্রেমই চৈতন্যের অতীন্দ্রিয় রাধাভাবের ব্যাখ্যা করেছে। তার আগে লোকে সেই রাধাভাবের তাৎপর্য সামান্যই বুঝতে পারত। উনিশ বছরের স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন: "গৌরাঙ্গের কুথা শুনেছিস? আগের অবতারে আমিই ছিলাম গৌরাঙ্গ।" বিবেকানন্দ বিস্মিত, বিমূঢ়, হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাদের

বলেছিলেন, তখন তাঁকে পাগল ঠাউরেছিলেন। ঠাকুর আমাদেরও বলেছিলেন: যে রাম, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, যিশু, বর্তমান যুগে সে-ই রামকৃষ্ণ।

গিরিশচন্দ্রের *চৈতন্যলীলা* মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। সেই বছরের শেষ দিকে ঠাকুর *চৈতন্যলীলা* অভিনয় দেখেছিলেন এবং তা মাত্র তিরোভাবের দেড় বছর আগে। গিরিশচন্দ্রের নাটক লেখার ছাব্বিশ বছর আগেই তিনি চৈতন্যের দিব্য প্রেমভাবে উন্মত্ত হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন ১৮৮৪ সালে। ঠাকুর ১৮৮৫ সালের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের *চৈতন্যলীলা, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র* ও *বৃষকেতু*-র অভিনয় দেখেছিলেন। যতদূর জানা যায় গিরিশচন্দ্রের কোনো নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি।

গানের রচয়িতাদের মধ্যে রলাঁ "কুবির"-কে কবির বলে ভুল করেছিলেন এবং *বুদ্ধচরিত*-কে একজন রচয়িতার নাম ভেবেছিলেন। শ্রীম সে ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ এই চিঠিতে রলাঁ বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন এবং যথাযোগ্যভাবে তার স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন।

রলাঁ *রামকৃষ্ণের জীবন* প্রথম খন্ড শেষ করেছিলেন ডিসেম্বরের একবারে শেষে। গ্রন্থে লেখকের ভূমিকায় তিনি তারিখ দিয়েছেন ডিসেম্বর ১৯২৮, পশ্চিম ও প্রাচ্য পাঠকদের প্রতি পৃথক পৃথক নিবেদনে ক্রিসমাস, ১৯২৮; আর দিনপঞ্জীতে সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি ও প্রেসকপির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে *রামকৃষ্ণের জীবন*-এর পান্ডুলিপি স্টক প্রকাশনীকে পাঠানো হয়েছিল জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই। (উৎসর্গ পত্রের তারিখ জানুয়ারি ১৯২৯।) একই সঙ্গে মিশনের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল অনুবাদের আয়োজন; অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ই. এফ. ম্যালকল্‌ম-স্মিথ।

এর আগেই *য়্যুরোপ* পত্রিকায় ধারাবাহিক সারাংশ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন রলাঁ; প্রকাশ শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর মাস থেকেই। ১৫ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল *ল্যাঁদ আঁ মার্শ, অ্যাঁত্রোদ্যুক্‌শিয়ঁ আ উন এতুদ্‌ স্যুর লা মিস্তিক্‌ এ লাক্‌সিয়ঁ, দ্য ল্যাঁদ্‌ ভিভাঁৎ*। এটি মুখবন্ধ। প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, পত্রিকার প্রকাশক ক্রেমিয়া প্রকাশনীকে তার "কিম্ভূত ধর্মবিরোধী মনোভাবের" জন্যে তিরস্কার জানানো। এই ধর্মবিরোধী মনোভাব নিজেকে নতুন বলে

ঠাওরায়। কিন্তু, রলাঁর মতে, আসলে তা হচ্ছে "ঊনবিংশ শতাব্দীর স্থূল যুক্তিবাদ এবং পিন্ডীভূত বিজ্ঞানবাদের বাতিল-করা মাল।" তিনি দাবি করেছিলেন, "মনের গভীর ও আবেগদীপ্ত সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে—খাঁটি অর্থে—এমনকি এবং বিশেষ করে ধর্মের বাইরেও—ধর্মীয় মানসিকতার সার্বভৌম অধিকার।" তিনি ভেবেছিলেন তাঁর লেখার ফলে বিদ্রোহ ঘটবে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন পেয়েছিলেন কবি মার্সেল মার্তিনের কাছ থেকে। মার্তিনে লিখেছিলেন (৭ জানুয়ারি): "আমার মনে হচ্ছে, আমি কোনো দিন আপনার এতো কাছাকাছি ছিলাম না।......যা কিছু নতুন আপনার কাছ থেকে পড়লাম, দেখা যাচ্ছে, তাদের সবই তাদের মতো করে আমার কবিতায় মূর্তি ধরেছে, এমন কি তার সারাৎসারেও......।" জাঁ-রিশার ব্লখ লিখেছিলেন: "আপনার মুখবন্ধ আমাকে অভিভূত করেছে। প্রতিটি লাইনে আপনাকে বুঝতে পারছি, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি।" এমন কি রনে আর্কও লিখেছিলেন, তাঁরও স্বভাবের অর্ধেকটাই ধার্মিক। কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম ইত্যাদি পবিত্র নামগুলো বড়োই ক্লান্তিকর এবং এগুলোকে বদলাতে হবে।[৪০]

২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ মে পর্যন্ত পুরো তিনমাস রলাঁর পক্ষে তাঁর ডায়েরি লেখা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, দ্বিতীয় খন্ড *বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী*-র (দুই খণ্ড) পান্ডুলিপি সংশোধন, প্রেসের জন্যে টাইপ করা এবং টাইপকরা কপির সংশোধন ইত্যাদিতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। দু'বছর ধরে জড়ো করা পুথিপত্রের বোঝা এতদিনে ঘাড় থেকে নামল। ইতিমধ্যে *য়্যুরোপ* পত্রিকায় তাঁর দুই খন্ড থেকে, বিশেষ করে *বিবেকানন্দ* থেকে সারাংশ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল: *অঁ গ্রাঁ মিস্তিক এ্যাঁদিয়াঁ: রামকৃষ্ণ*; মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে: *অঁনেরো দ্য ল্যাঁদ্ নুভেল: বিবেকানন্দ*। মায়াবতী থেকে স্বামী অশোকানন্দ প্রতি সপ্তাহে সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর সংশোধন পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ *রামকৃষ্ণের জীবন*-এর ইংরেজী অনুবাদ তখন শেষ হবার মুখে।

বিবেকানন্দের জীবন প্রকাশের জন্যে স্টক প্রকাশনীকে পাঠানো হয়েছিল জুনের প্রথম সপ্তাহে। মূল গ্রন্থ লেখার তারিখ দেখা যায় ৯ ডিসেম্বর ১৯২৮,

সংযোজিত অংশ শেষ হতে দেরি হয়েছিল অনেক, ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে। ততোদিনে *রামকৃষ্ণের জীবন* ছাপা শুরু হয়ে গিয়েছে পারীতে। ভারতে *বিবেকানন্দের জীবন*-এর ইংরেজী অনুবাদের কাজও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল এবং স্বামী অশোকানন্দ সে অনুবাদ খুঁটিয়ে দেখছিলেন, সেই সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে নিজের মতামত বা সংশোধনের প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন। রলাঁ জানতেন, সনাতনী রামকৃষ্ণপন্থীদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিকোণের গরমিল ঘটবেই। কিন্তু সে গরমিল কতোখানি এবং কতো গুরুতর তা তাঁর জানা ছিল না। প্রতি সপ্তাহে তা জানতে পারছিলেন। তাই তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য লিখেছিলেন: "আমার একথাও বলা উচিত যে আমি দেখছি, ইউরোপের ঈশ্বরতত্ত্ববিদদের মতোই ভারতের ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা "আক্ষরিকতার" ব্যাপারে সমান খুঁতখুঁতে। এবং রোমের মতোই তাঁদের নলের মাথায় আংটায় (ferule) আমি ভালো খাপ খাবো না।—সর্বত্র মানুষ একই রকম।[৪১]

রামকৃষ্ণের জীবন-এর ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়েছিল অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী থেকে ১৯২৯ সালের অগাস্ট মাসে (প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে), মূল ফরাসী সংস্করণের আগে।[৪২] তার আগেই প্রবুদ্ধ ভারত-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থের *To my Eastern Readers* মুখবন্ধটি। এবং আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: *The Builders of Unity*। নভেম্বর মাসে সপ্তম পরিচ্ছদ: *Ramakrishna and The King-Shephards of India*।[৪৩] জুন মাসেও মূল ফরাসী সংস্করণের ছাপার কাজ চলার উল্লেখ পাওয়া গেলেও, ছাপা শেষ হয়েছিল ১৯২৯ সালের ৪ নভেম্বর। এতো দেরির কারণ কী ছিল তা বোঝা যায় না। অথচ জুনের প্রথম সপ্তাহে *বিবেকানন্দের জীবন*-এর পান্ডুলিপি পাঠানো হলেও তা ছাপা হয়েছিল মাত্র কয়েক মাস পরেই। প্রথম খন্ড ২৭ নভেম্বর, দ্বিতীয় খন্ড ২৮ নভেম্বর। (*বিবেকানন্দের জীবন*-এর ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়েছিল দেড় বছর পরে ১৯৩১ সালের ১৫ এপ্রিল।) স্টক প্রকাশনী তিনটি খন্ডই আনুষ্ঠানিক ভাবে বাজারে ছেড়েছিলেন ৬ জানুয়ারি (উৎসর্গ পত্রের তারিখও জানুয়ারি ১৯৩০)। ডিসেম্বর মাসে ঘোষিত হয়েছিল লাহোর কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব; রলাঁ সংবাদটিকে

তাঁর দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৯২৯ সালের শেষ ঘটনা হিশেবে, আর ১৯৩০ সালের প্রথম ঘটনা তাঁর গ্রন্থের প্রকাশ। তিনি সানন্দে লিখেছিলেন: ‘‘এর প্রকাশ মিলে যাচ্ছে ২৯ ডিসেম্বর লাহোর কংগ্রেসের উদ্বোধনে জহরলাল ও গান্ধীর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে।’’[৪]

পাঁচ

রম্যাঁ রলাঁর গান্ধী-বিবেকানন্দ রচনা প্রসঙ্গে বিস্মিত মির্চা এলিয়াদ লিখেছিলেন: "আমি জেনেছি এই নির্ভেজাল ও সহজ অসাধারণ জিনিশটি: রম্যাঁ রলাঁ একেবারেই ইংরেজী জানতেন না। তাঁর বোন তাঁর জন্যে বিবেকানন্দের বইগুলো এবং রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিচারমূলক আলোচনা ও জীবনীগুলো, গান্ধীর রচনা, চিঠিপত্র ইত্যাদি পড়তেন ও তর্জমা করতেন। এবং ভারত দেশটি, তার ইতিহাস, তার কোনো ভাষা, এমন কি ইংরেজীর এই অজ্ঞতা সত্ত্বেও রলাঁ গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি খণ্ড লিখেছিলেন.......সত্যিই এতো চিত্তাকর্ষক........![১] এই বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায় যখন জানতে পারা যায়, এইভাবে রলাঁ কী বিপুল পরিমাণ তথ্য অধিগত করেছিলেন, এবং কেবল অধিগত করাই নয়, নিপুণ ঐতিহাসিকের মতো সেইসব তথ্যের বিচারবিশ্লেষণ করে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে সফল প্রয়োগ করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বিস্ময়কর ঘটনার দ্বিতীয় কোনো নজির আছে বলে জানা নেই।

রলাঁর সাহিত্যজীবনে তাঁর বোন মাদলেন রলাঁর ভূমিকা যে কতোখানি অন্তরঙ্গ ছিল, রলাঁ সম্পর্কে যাঁরা মোটামুটি খবর রাখেন, তাঁরা সবাই জানেন। ১৯১০ সালে মোটর দুর্ঘটনার পর রলাঁ যখন প্রায় প্রতিবন্ধীর পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, তখন থেকে মাদলেন নিয়েছিলেন তাঁর দেখাশোনার ভার; মায়ের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে রলাঁর ভিলন্যভের সংসারে তিনিই ছিলেন কর্ত্রী। তাছাড়া তিনি হয়েছিলেন জ্যেষ্ঠের নিত্য সঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত দোভাষী, প্রয়োজনীয় সমস্ত ইংরেজী বিষয়বস্তুর অনুবাদকর্ত্রী। বলতে গেলে, মাদলেন ছিলেন রলাঁর বহির্বিশ্বের একটি খোলা জানালা। ল্যাটিন, গ্রীক এবং মাতৃভাষা ফরাসী ছাড়া রলাঁ অন্য আধুনিক ভাষার মধ্যে কেবল জার্মান পড়তে ও বুঝতে পারতেন, অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। ইংরেজী-জানা জগতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় মাদলেনের মাধ্যমে। তাঁকে কেবল বিশ্বস্ত দোভাষীর সম্মান জানালে তাঁর মর্যাদার বিশেষ হানি ঘটবে। জ্যেষ্ঠের চিন্তাধারার সঙ্গে , বিশেষ করে তাঁর ভারত-ভাবনার সঙ্গে, তাঁর গভীর সহমর্মিতা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রলাঁর আলাপচারির প্রতিটি পর্যায়ে তিনিই ছিলেন মধ্যবর্তিনী। ভারত তথা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণে তিনি বাংলা ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন কালিদাস নাগের কাছে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও দিন কয়েক পাঠ নেবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* ফরাসী ভাষার অনুবাদ করেছিলেন।[২] গান্ধী-রামকৃষ্ণ পর্বে তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জ্যেষ্ঠের প্রেরণাদাত্রী। জ্যেষ্ঠের সঙ্গেই কনিষ্ঠার শ্রম নিষ্ঠা ও মনীষা এই পর্বে সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। রলাঁ স্নেহভরে সর্বত্র কনিষ্ঠার এই তদগত ভূমিকার কথা জানাতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী লেখার ক্ষেত্রে বোনের ভূমিকা যে কতোখানি ছিল তার প্রমাণ উৎসর্গপত্রটি। *মহাত্মা গান্ধী* গ্রন্থে তিনি যেখানে "বন্ধু" কালিদাস নাগের সঙ্গে "বিশ্বস্ত সহযোগী" বোনকে সস্নেহ ধন্যবাদ জানিয়ে তৃপ্তিবোধ করেছিলেন,[৩] সেখানে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন এই ক'টি কথায়: "আমার আত্মার তীর্থযাত্রায় আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী আমার বোন মাদলেনকে— যে না হলে এই দীর্ঘ যাত্রা আমি সম্পন্ন করতে পারতাম না।"[৪]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীরচনায় রলাঁ গ্রন্থকারের ভূমিকায় সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন রামকৃষ্ণমিশনকে। নিয়মিত পরামর্শ দান ছাড়াও মিশন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও দলিলপত্র দিয়ে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন। তারপরে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। এঁরা দুজনেই তখনো জীবিত রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তারপর জগদীশচন্দ্র বসুর ছাত্র এবং স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত বশী সেনকে; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্যতম কারণটি হচ্ছে, তাঁর মাধ্যমেই রলাঁ ভগিনী ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিবেকানন্দের বান্ধবী মিস ম্যাকলাউডকে এবং *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দকে। রলাঁর প্রতিটি চিঠির, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর স্বামী অশোকানন্দ নিরলসভাবে যথাযথ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দিনের পর দিন পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে সংযোজিত *রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ* প্রবন্ধটির (Note I) সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগকে। ধনগোপাল সম্পর্কে রলাঁ লিখেছিলেন, তিনিই "প্রথম আমার কাছে রামকৃষ্ণের অস্তিত্ব

উদ্‌ঘাটন (révelé) করেছিলেন''; আর কালিদাস নাগ তাঁর ''বিশ্বস্ত বন্ধু'', তিনি ''একাধিকবার তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন''।[৫]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন সংক্রান্ত যে সব আকরগ্রন্থ রলাঁ ব্যবহার করেছিলেন, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে প্রথম খন্ডের শেষে। সেখানে তিনি গ্রন্থগুলোর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যও বিচার করেছেন।

রামকৃষ্ণের ইতিহাসের মুখ্য আকরগ্রন্থ হিশেবে রলাঁ প্রথমে স্থান দিয়েছেন, রামকৃষ্ণের শিষ্যদের বিবরণীর সংকলন দা লাইফ অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ, কম্পাইল্ড *ফ্রম ভেরিয়াস অথেন্টিক সোর্সেস* গ্রন্থকে। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী থেকে (১৯২৫) এক খন্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬৫।গ্রন্থের গান্ধীজির লেখা সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি রলাঁ গ্রন্থপঞ্জীতেই উদ্ধৃত করেছেন।[৬] স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয়কুমার সেনের প্রভৃত পরিশ্রমে বিবেকানন্দের শিষ্য প্রিয়নাথ সিংহের সংগৃহীত স্মৃতিকথা ও শ্রীম লিখিত *কথামৃত*-এর ভিত্তিতে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল। গ্রন্থটি মূল্যবান এইজন্যে যে, এতো ছড়ানো-ছিটানো আক্ষরিকভাবে সমগ্র প্রামাণিক তথ্যসমূহ সরাসরি ধর্মীয় সতর্কতার সঙ্গে সংকলিত। কিন্তু গ্রন্থটির বড়ো অসুবিধা যে, এটি একেবারেই সুবিন্যস্ত নয়, এবং কোনো সমালোচনাই এতে নেই। সবচেয়ে অসুবিধা এতে কোনো বর্ণানুক্রমিক নির্ঘন্ট নেই, যার ফলে গবেষণার কাজ করা খুবই কঠিন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ স্বামী সারদানন্দের *শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা* প্রসঙ্গ বিষয়বিন্যাস ও যুক্তিপ্রয়োগের দিক থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। বাংলায় লেখা পাঁচ খণ্ডের এই গ্রন্থে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি এবং কাশিপুরের বাগানবাড়িতে রামকৃষ্ণের অসুস্থ অবস্থাতেই শেষ হয়েছে। শেষ দিককার বিবরণ অনুপস্থিত, দু'একজন ছাড়া রামকৃষ্ণের শিষ্যদের, বিশেষ করে বিবেকানন্দ সম্পর্কিত বিবরণও অসম্পূর্ণ। পাঁচ খন্ডের মধ্যে কেবল *বাল্যজীবন* ও *সাধকভাব* এই খন্ডের ইংরেজী অনুবাদই তখন লভ্য ছিল। প্রথম খন্ড ঠিক অনুবাদ নয়, স্বামী সারদানন্দেরই লেখা; দ্বিতীয় খন্ডটি বাংলা থেকে অনুবাদ, অন্যান্য খন্ডের কিছু পরিচ্ছেদ, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্পর্ক *প্রবুদ্ধ ভারত* ও অন্য ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকটিত করেছিলেন,

ধারাবাহিক বর্ণনা করেননি। প্রথম দুই খণ্ড এই পদ্ধতিতে লেখা। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড থেকে জীবনীর আঙ্গিকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড *গুরুভাব*-এর বিষয় রামকৃষ্ণের যৌবনকাল ও সাধনার পর্ব এবং সাধনার শেষ পর্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক। পঞ্চম খণ্ডে শিষ্যপরিবৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁর রোগের সূচনা। এই পর্যন্ত লেখার পর শ্রীমার দেহান্তর ঘটে, তারপর ব্রহ্মানন্দের। স্বামী সারদানন্দ এমনই শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি লেখা থামিয়ে দিয়ে পুরোপুরি ধ্যানের জগতে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি দেহত্যাগ করায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হয়েছিল। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও গ্রন্থটি চমৎকার। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিশেবে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। "তাঁর খণ্ডগুলো অধিবিদ্যক সংক্ষিপ্ত বিবরণে সমৃদ্ধ, যা রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আবির্ভাবকে স্থাপিত করেছে ভারতীয় চিন্তার সমৃদ্ধ শোভাযাত্রার একেবারে ঠিক জায়গাতেই।"[৭] সারদানন্দের *লীলাপ্রসঙ্গ*-এর সঙ্গে *দা লাইফ অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ*-এর যেখানে অমিল দেখা গিয়েছে, সেখানে রলাঁ অগ্রাধিকার দিয়েছেন পরবর্তীকে, কারণ সেটি রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টার ফল এবং তাতে সারদানন্দেরও হাত ছিল। স্বামী অশোকানন্দও এই অভিমত পোষণ করতেন।

তারপরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হচ্ছে দা গসপেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ *এ্যাকরডিং টু এম, এ সান অব্ দা লর্ড এ্যান্ড ডিসাইপ্‌ল অব্ দ্য আইডিয়াল ম্যান ফর্ ইন্ডিয়া এ্যান্ড দা ওয়ার্লড*, প্রথম সংস্করণ, রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ১৮৯৭; সঙ্গে ছিল বিবেকানন্দের অনুমোদিত দু'খানি চিঠি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২১; নব সংস্করণ ১৯২২-২৪। রলাঁর মতে গ্রন্থটি রামকৃষ্ণের প্রথম মহাজীবনী গ্রন্থের মতোই মূল্যবান। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮২ থেকে পরবর্তী চার বছর নিজে যা শুনেছিলেন, অপরের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন, সে সব লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তার যথাযথতা প্রায় স্টোনোগ্রাফির মতো। কিন্তু রলাঁর হাতে এসেছিল বিভিন্ন সময়ের সংস্করণের দুটি খণ্ড, প্রথম খণ্ড ১৯২৪ সালের চতুর্থ সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২২ সালের প্রথম সংস্করণ। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের বিন্যাস ও স্টাইলের সামান্যই পার্থক্য ঘটেছিল।

বিবেকানন্দের জীবন সংক্রান্ত রলাঁর উপজীব্য গ্রন্থটি ছিল অদ্বৈত আশ্রম,

মায়াবতী থেকে তিন খণ্ডে (মূলত চার খণ্ড) প্রকাশিত *দা লাইফ অব্ স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইস্টার্ন এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৪; তৃতীয় খণ্ড ১৯১৯; চতুর্থ খণ্ড ১৯১৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৯২। গ্রন্থটি কেবল বিবেকানন্দের ইতিহাস সম্পর্কেই নয়, তাঁর মহান গুরুর পক্ষেও সমান কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ এর মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ স্মৃতিকথা। এর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচ্য গ্রন্থ হচ্ছে সাত খন্ড *দা কমপ্লিট ওয়ার্কস অব্ বিবেকানন্দ*। পৃষ্ঠা। সংখ্যা ৩৬৪৪। বিবেকানন্দ প্রায়ই তাঁর গুরু সম্পর্কে সভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিউইয়র্কে একটি বিশেষ বিখ্যাত বক্তৃতা গুরুর নামে উৎসর্গ ও প্রকাশ করেছিলেন, যেটি মাই মাস্টার নামে সম্পূর্ণ রচনাবলির চতুর্থ খন্ডে স্থান পেয়েছে।

এর পরের গ্রন্থ অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী থেকে দুই খণ্ডে ১৯১৬ ও ১৯২০ সালে প্রকাশিত *শ্রীরামকৃষ্ণজ টিচিংস*। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১০। এতে ছিল রামকৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের আলাপচারি, বিশেষ করে *কথামৃত*-এ ধৃত বাণী, কিন্তু সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত। এর বিশেষ মূল্য হচ্ছে এটি ছোটোখাটো, ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক। ১৯০০ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত *প্রবুদ্ধ ভারত* ও অন্যান্য পত্রিকায় এর খণ্ড খণ্ড অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য *উদ্বোধন* অফিস, কলকাতা থেকে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের সংকলিত *ওয়ার্ডস অব্ দা মাস্টার/সিলেকটেড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ*। এই ক্ষুদ্র সংকলনটি সংকলনকর্তার ব্যক্তিত্বের কারণে কৌতূহলোদ্দীপক।

সপ্তম গ্রন্থ ম্যাকস মুলার রচিত *রামকৃষ্ণ: হিজ লাইফ এ্যান্ড টিচিংস,* লংম্যানস গ্রীন এ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৮, নব সংস্করণ ১৯২৩। ম্যাকস মুলারের সঙ্গে বিবেকানন্দের ইংল্যান্ডে পরিচয় ঘটেছিল এবং তাঁর অনুরোধেই বিবেকানন্দ গুরুর সম্পূর্ণ জীবনী তাঁকে জানিয়েছিলেন। রলাঁর কাছে এই গ্রন্থের গুরুত্ব এইজন্যে যে, এটি লেখা হয়েছিল সরাসরি পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। তাছাড়া এতে আছে তাঁর উদার ও স্পষ্ট বিচারশীল মনের পরিচয় এবং তার সঙ্গে মিলন ঘটেছে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক দাবি ও সমস্ত চিন্তার এক মহৎ বোধশক্তি। পরে দেখা যাবে রামকৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে রলাঁ ম্যাকস মুলারের স্বীকৃত *ডায়ালজিক* (Diologic) পদ্ধতি গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন।

রামকৃষ্ণের জীবন ইতিহাস বিষয়ক রলাঁর উল্লিখিত গ্রন্থ তালিকায় সর্বশেষ নাম ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দা *ফেস অব সায়লেন্স*, নিউ ইয়র্ক, ই. পি. ডাটন এ্যান্ড কোং, ১৯২৬। সর্বশেষে উল্লিখিত হলেও এটিই প্রথম গ্রন্থ যা রলাঁকে সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কৌতূহলী ও উদ্দীপ্ত করেছিল। এবং কোনো সময়েই তিনি সেকথাটি জানাতে দ্বিধা করেননি।

ধনগোপালের গ্রন্থের সঙ্গে এবং স্বয়ং ধনগোপালের সঙ্গে রলাঁর পরিচয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের বেশ কিছু আগে। গ্রন্থটি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবর্ধমান অনীহা ও বিরূপতা তখনো তাঁর জানার কথা নয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণমিশনের সম্মতিক্রমেই দেখা করতে এসেছিলেন মিস ম্যাকলাউড। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতে ধনগোপাল প্রসঙ্গ উঠলেও, তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো সাম্প্রদায়িক আপত্তিগত কোনো প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। রলাঁর দিনপঞ্জীতে আলোচনায় গ্রন্থটির নামের কোনো উল্লেখ না থাকলেও, অনুমান করতে বাধা নেই, গ্রন্থের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই উঠেছিল। মিস ম্যাকলাউডের পক্ষেও কিন্তু রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের আপত্তির কথা না-জানার কথা নয়। ধনগোপাল মিস ম্যাকলাউডের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ১৯১৪ সাল থেকে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ধনগোপালের গ্রন্থরচনার মূল প্রেরণা, গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেও ধনগোপাল সেকথা জানিয়েছিলেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে মিস ম্যাকলাউডের অবশ্যই বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এমনও হতে পারে, নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী মিস ম্যাকলাউড তথ্যগত ও তত্ত্বগত বিচ্যুতিকে এদেশীয় রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের মতো ততোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। ধনগোপালের গ্রন্থ অসামান্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, রম্যাঁ রলাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে, এটাই সবচেয়ে বড়ো বলে তাঁর মনে হয়েছিল।[৮]

ধনগোপালের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল ১৯২৭ সালের *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর জানুয়ারি সংখ্যায় *এ বায়োগ্রাফিক্যাল ফিক্‌শন* শিরোনামের সমালোচনায়। (লেখকের নামের কোনো উল্লেখ ছিল না।) তাতে লেখা হয়েছিল: "এই গ্রন্থটির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছি, তেমন নিদারুণভাবে হতাশ আমরা আর কখনো হইনি। এ যেন অপ্রকৃতিস্থতায় খ্যাপাটে একখানি সুন্দর মুখ তাকিয়ে দেখার মতো।" (It is like looking on a fair face

distraught with insanity.) গ্রন্থটি তথ্য ও অযৌক্তিক কল্পনার এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি (a strange medley)। ২৫৫ পৃষ্ঠায় অসংখ্য "অসত্য বস্তুর"(false things) সংখ্যা ২৬০টি কি তারও বেশি। তিনি যেভাবে রামকৃষ্ণ ও তাঁর সম্প্রদায়কে বর্ণনা করেছেন তা এক "অমার্জনীয় অপবিত্রীকরণ" (unpardonable sacrilege)।

প্রবুদ্ধ ভারত-এ প্রকাশিত সমালোচনাটি, কিছুদিন পরে হলেও,—মিস ম্যাকলাউডের সাক্ষাতের আগে যদি নাও নয়,—রলাঁ অবশ্যই পড়েছিলেন এবং মিশনের সূত্রে তত্ত্বগত আপত্তির কথাও সম্ভবত অবগত হয়েছিলেন, তবু জুন মাসের শেষ দিকেও (২৬ জুন ১৯২৭) পরম নৈষ্ঠিক ও পন্ডিত স্বামী অশোকানন্দকে একথা লিখতে দ্বিধা করেননি: ".......ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের কয়েকটি পাতা রামকৃষ্ণের মহৎ হৃদয়টিকে বাস্তবিক পক্ষে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে; এবং এই আলোর রেখা আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে তাঁর জীবন ও চিন্তাকে জানতে।"* অনেক পরে (৩০ মার্চ ১৯৩৮) রলাঁ নিজেই লিখেছেন: "অশোকানন্দের আপসবিরোধী কঠোরতা আমাকে মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল।"

পরের বছর অগাস্ট মাসে যখন বশী সেন এসেছিলেন, তখন রলাঁর *রামকৃষ্ণের জীবন* লেখা শেষ হয়েছে, *বিবেকানন্দের জীবন* শুরু হয়েছে, *রামকৃষ্ণের জীবন*-এর চূড়ান্ত পান্ডুলিপি প্রস্তুতির পথে। বশী সেন ধনগোপালের গ্রন্থ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অতিশয় বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, যদিও রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে একটিমাত্র লাইন লিখেছেন: "রামকৃষ্ণের জীবনকে উপন্যাস করে তোলার জন্যে (d'avoir romancé)) তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ক্ষমা করেন না।" কেবল গ্রন্থের প্রতি নয়, ব্যক্তি ধনগোপালের প্রতিও বশী সেন বিরূপ ছিলেন। ১৯২২ সালে ধনগোপাল যখন গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা করছিলেন, বেলুড় মঠে মিস ম্যাকলাউডের সান্নিধ্যে তাঁকে ও তাঁর মার্কিন স্ত্রীকে দেখে বশী সেন ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখেছিলেন (২৭ মে): ".......তিনি (ধনগোপাল) একটা খুব পালিশ করা পেতল। খুব চকচক করে, কিন্তু এক বিন্দু মৌলিকতা নেই। মেয়েদের আর ভেজাল (sophisticated) মানুষদের সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করতে পারেন। তাঁর ওজন বুঝতে (to size him up) আমার কয়েক মিনিট মাত্র লেগেছে।

লেডি বসুও আমার সঙ্গে একমত। তাঁর "স্বামীজিময়তার" (his being "Swamiji-full"),—তাঁতিন (মিস ম্যাকলাউড) যেমনটি উল্লেখ করেন,—মূল আমি কোথাও খুঁজে পাইনি, যদি না সেটা তাঁতিনকে ভাঙানো এবং বস্তুগত (material) সুযোগসুবিধার ব্যাপারে হয়,—যা এখানে স্বামীজির নামে তাঁকে দিচ্ছে।"[১০]

সব কিছু জানা সত্ত্বেও রলাঁ কিন্তু ধনগোপালের গ্রন্থটিকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হননি। *রামকৃষ্ণের জীবন*-এর পাদটীকায় বহুবার গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। এমন কি গ্রন্থের শেষে শিষ্যদের কাছে রামকৃষ্ণের সমাধির বিভিন্ন ভূমি উত্তরণের বর্ণনাটি ধনগোপালের গ্রন্থ থেকে *লে সেৎ ভালে দ্য লা মেদিতাশিয়ঁ* নামে সংযোজন করেছেন (ফরাসী সং নোট - ২) এবং গ্রন্থপঞ্জীতে *দা ফেস অব সায়লেন্স* সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন অকপট ভাবে। সেটি উল্লেখযোগ্য:

> এই গ্রন্থটি শিল্পকৃতি রূপে অসাধারণ মূল্যবান; এটি "ঠাকুরের" সময়ের ভারতের পরিবেশে তাঁর প্রতিমার এক উজ্জ্বল স্মৃতি-উদ্বোধন। মুখার্জি সমস্ত প্রধান দলিলপত্র খুঁজে-পেতে দেখেছেন। ঠাকুরকে যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জানতেন, তাঁদের সঙ্গে, বিশেষ করে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন এবং রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথাও ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য ভাষায় সময়ে সময়ে শিল্পীর জীবন্ত কল্পনায় যে স্বাধীনতা নেওয়াটা যথোচিত, রামকৃষ্ণমিশন তা ভালো চোখে দেখেননি; এবং তার কিছু "তত্ত্ববিদ্যাগত" ব্যাখ্যা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সে ব্যাখ্যার প্রকৃতিকে অত্যন্ত ব্যক্তিগত বলে (too personal a nature) মনে হয়। কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি কখনো ভুলতে পারি না যে, এই সুন্দর গ্রন্থটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ার ফলেই আমি রামকৃষ্ণের প্রাথমিক জ্ঞানের এবং গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হবার প্রেরণার জন্যে ঋণী। এখানে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি। এক অসাধারণ দক্ষতায় ও কৌশলে এই গ্রন্থটিতে রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সেইসব বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়েছেন এবং উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করেছেন, যারা কোনো অভিঘাত সৃষ্টি না-করে (without shocking) ইউরোপ ও

> আমেরিকার মনকে বিশেষ আকর্ষণ করবে। আমি তাঁর সর্তকতার গন্ডি পেরিয়ে যাবার এবং কোনো রকম ''কারুকার্য'' না-করে যথাযথ দলিল-পত্র উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করেছি।[১১]

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি মিশনের বিরূপতা চিরদিন বজায় ছিল। স্বামী শিবানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে কোনো বন্ধুর কাছে লেখা ধনগোপালের একটি চিঠির অংশবিশেষ *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ (জুলাই ১৯৩৪) প্রকাশিত হবার পর (নোটস এ্যান্ড কমেন্টস) তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এই ক'টি কথায়: ''ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সেইসব কতিপয় ভারতীয়দের মধ্যে একজন যাঁরা ইংরেজী গদ্য রচনায় এমন কি ইংরেজীভাষী দেশ গুলোতেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনায় তার কৃতিত্ব আছে।'' তিনি যে *দা ফেস অব্ সাইলেন্স* গ্রন্থ রচনা করে রলাঁকে রামকৃষ্ণজীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন, সেকথা সম্পূর্ণ অনুক্ত থেকে গেছে।[১২]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ইতিহাস সম্পর্কিত উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা আট হাজারও ছাড়িয়ে যাবে। এই সঙ্গে যোগ করতে হবে *প্রবুদ্ধভারত* ও *বেদান্ত কেশরী*-র প্রচুর প্রবন্ধ। তাছাড়া একই সঙ্গে গ্রন্থতালিকায় উল্লেখ করতে হবে সমকালীন ইতিহাস, ধর্মীয় মত, বিতর্ক ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলি; যাদের উল্লেখ করা হয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী গ্রন্থের পাদটীকায়। ইংরেজী (ও বাংলায়) লেখা এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে: এ. বার্থ-*এর দা রিলিজিয়নস অব্ ইন্ডিয়া*; স্টারবাখ-এর *দা সায়কোলজি অব্ রিলিজিয়ন*; ভগিনী নিবেদিতার *নোটস অব্ সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ, দা মাস্টার এ্যাজ আই স হিম*। ভগিনী ক্রিস্টিনের *অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা*; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *রামমোহন রায় এ্যান্ড মডার্ন ইন্ডিয়া*; এম. সি. পারেখের *রাজর্ষি রামমোহন রায়*; শিবনাথ শাস্ত্রীর *হিস্ট্রি অব দা ব্রাহ্মসমাজ*; এইচ. চন্দ্র সরকারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ *দা ব্রাহ্ম ধর্ম*; প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের *দা ফেইথ এ্যান্ড প্রোগ্রেস অব ব্রাহ্ম সমাজ*; *এইম্স এ্যান্ড প্রিন্সিপলস অব্ কেশবচন্দ্র*; প্রমথ লাল সেনের *কেশবচন্দ্র সেন, এ স্টাডি*; টি. এল. বাসওয়ানির *শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, এ সোসাল মিস্টিক*; বি. মজুমদারের *প্রফেসর ম্যাকস মুলার অন*

রামকৃষ্ণ; মণিলাল পারেখের *ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেন*; কেশবচন্দ্র সেনের *এ ভয়েস ফ্রম দা হিমালয়েজ* (লেকচার্স ইন ১৮৬৮); পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়ের ৯ খণ্ড বাংলা *কেশবচন্দ্র*; (নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে কেশবচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থাদি ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মারফতে পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। কিন্তু রলাঁর পক্ষ থেকে তার কোনো স্বীকৃতি দেখা যায় না।) লালা লাজপত রায়ের *দা আর্য সমাজ*; ফ্র্যাংক লিলিংটনের *দা ব্রাহ্ম এ্যান্ড আর্য ইন দেয়ার রিলেশন টু ক্রিস্টিয়ানিটি*; কে. টি. পলের *দা ব্রিটিশ কানেকশন ইন ইন্ডিয়া*; মহেন্দ্রনাথ সরকারের *কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন বেদান্তিজম*; কাউন্ট কাইজারলিঙের *দা ট্রাভেল ডায়েরি অব্ এ ফিলসফার* (ইংরেজী অনুবাদ); অরবিন্দ ঘোষের *এসেস অন গীতা, দা সিনথেসিস অব্ যোগ*; কালিদাস নাগের *গ্রেটার ইন্ডিয়া, এ স্টাডি ইন দা ইনডিয়ান ইনটারন্যাশনালিজম* ইত্যাদি। এদের মধ্যে মডার্ন রিভিউ ও বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি-র প্রাসঙ্গিক বহু প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইংরেজী ছাড়া এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো গ্রন্থই ফরাসী বা জার্মান ভাষায় লভ্য ছিল না। রলাঁ ফরাসীতে অনূদিত দুটি মাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। একটি সংকলন গ্রন্থ *ফ্যই দ্য ল্যাঁদ*, তাতে তিনি পেয়েছিলেন কে. এম. পন্নিকরের *ল্য মুভ্‌মাঁ রেলিজিয়স* ও *মোয়াইয়ানাজ* নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ এবং তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের *লেজাসিয়াঁ শাঁ মিস্তিক্ দ্যু বাঁগাল*, যাতে ছিল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সুনির্বাচিত কিছু পদ ও অপরটি মঞ্জুলাল *দাভের লা পোয়েজি দা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। উইলিয়ম জেমসের *ভ্যারাইটিজ অব্ রিলিজিয়াস একস্‌পিরিয়ানসেস* গ্রন্থটিও তিনি ফরাসী অনুবাদে পড়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় রলাঁ ফরাসী ও জার্মান ভাষায় (যে দুটি ভাষা তিনি জানতেন ও বুঝতে পারতেন) যত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন ইংরেজী ও বাংলার চেয়ে তা তুলনায় অনেক কম।

রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ছাপা হয়েছিল নয় হাজার কপি, তার সঙ্গে বিশেষ কাগজে সংখ্যাচিহ্নিত অতিরিক্ত এগারোশো সাত কপি, যা বিক্রির জন্যে নয়। প্রথম খন্ডের নামপত্রে গ্রন্থনাম: *এসেই স্যুর ল্য মিস্টিক এ লাকসিয়ঁ দ্য ল্যাঁদ ভিভাঁত্/লা ভী দ্য রামকৃষ্ণ*। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের

নাম: *লা ভী দ্য বিবেকানন্দ এ লেঁভাঁজিল্ উ্যানিভেরসেল*। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৪, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের যথাক্রমে ১৮৮ ও ২৪৯। মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদে কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোনামে এবং বিন্যাসে কিছু হেরফের করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে *প্রাচ্যের পাঠকদের উদ্দেশে* মুখবন্ধটি আগে স্থান দেওয়া হয়েছে; পরিশিষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় নোট *লা ফিজিওলোজি দ্য লাসেজ এ্যাঁদিয়ান্* এবং *লে সেৎ ভালে দ্য লা মেদিতাশিয়ঁ* সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। এই রকম দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বাদ হয়েছে দ্বিতীয় নোটটি: *ল্য রেভেই দ্য ল্যাঁদ, আপ্রে বিবেকানন্দ,—ল্য রোল দ্য রবীন্দ্রনাথ তাগোর এ দ্য অরবিন্দ*। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডকে ইংরেজী অনুবাদে একটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণের জীবনীতে তিনখানি ফটো ছাপা হয়েছিল, এই তিনটিকে প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। একেবারে সামনের ফটোটি তুলেছিলেন টড শ্লেম্যান। রামকৃষ্ণ সে সময়ে অধ্যাত্ম-কথোপকথন করতে করতে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পরে রামকৃষ্ণ ফটো দেখে বলেছিলেন এটি যোগাবস্থার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় ফটোটি ছাপা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র-গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে। তৃতীয় ছবিটি রম্যাঁ রলাঁকে পাঠিয়েছিলেন স্বামী অশোকানন্দ। এটি তোলা হয়েছিল ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ রবিবার লিলি কটেজে কীর্তনের সময়ে। পাশ থেকে একজন ভক্ত এগিয়ে আসছেন ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণকে ধরে রাখতে। প্রচ্ছদের ছবিটি এক অস্ট্রিয়ান শিল্পীর আঁকা। ভক্তদের মতে ছবিটি সাদৃশ্য সত্ত্বেও বড়ো বেশি রঙচঙে।

বিবেকানন্দের জীবনীর সামনের ফটোটি ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মীয় পার্লামেন্টে উপস্থিতির কালের। দ্বিতীয় ফোটোটি আমেরিকা থেকে প্রথম ফিরে এলে ১৮৯৭ সালে তোলা।

ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, রম্যাঁ রলাঁ গ্রন্থটি লিখেছেন মুখ্যত পশ্চিমের পাঠকদের লক্ষ করে এবং তিনি বিষয়বস্তুটিকে পশ্চিমের দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। "তাই লেখকের মতামত ও ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেনি। এটা খুব স্বাভাবিক;.......ভারত থেকে অনেক দূরে থাকায় এবং তথ্যের জন্যে যে সাহিত্যের উপরে তাঁকে প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর

করতে হয়েছিল, তা তাঁর মাতৃভাষায় না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তার ফলে কিছু ভ্রম-ত্রুটি ঘটেছে, কিন্তু এসবই ছোটোখাটো খুঁটিনাটির ব্যাপার।" এইজন্যে ইংরেজী-অনুবাদে রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সেন প্রসঙ্গে সম্প্রদায়ের নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র 'নোট' পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, কিছু পাদটীকা বাদ দেওয়া হয়েছে।অবশ্য রলাঁর সম্মতিক্রমেই তা করা হয়েছে একথাই বলা হয়েছে। কিন্তু মূল ফরাসী সংস্করণের সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, কিছু পাদটীকা বাদ দেওয়াই শুধু নয়, বেশ কিছু পাদটীকার অংশও বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল পাদটীকার বাক্য বা বাক্যাংশও পরিবর্তিত করা হয়েছে।

তিন খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া পাদটীকার সংখ্যা একুশটিরও বেশি। *পরমহংস, শূদ্র, ভক্ত, জ্ঞানী, চণ্ডাল* ইত্যাদি পশ্চিমের পাঠকদের উদ্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত পাদটীকাগুলো বাদ দিলেও, এমন বেশ কিছু পাদটীকা বাদ দেওয়া হয়েছে যাদের কম গুরুত্বহীন বলে মনে করা চলে না। যেমন, শিবের উপরে নৃত্যপর কালী (ইং পৃ. ২৯) সম্পর্কে রামকৃষ্ণের উক্তিটি (ফ. পৃ. ৪২।২), রলাঁ যার পুনরুল্লেখ করেছেন মূল গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকায়। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "নিরাকার দর্শনকে প্রকাশ করার জন্যে মূর্তিগঠনে উৎসাহী ভারতীয় কল্পনার রামকৃষ্ণের কল্পনার মতোই একটা ভাস্কর্যময় প্রতিমার প্রয়োজন ছিল।" অনুবাদে (পৃ.৪৯) রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের (পৃ. ৬২) ৩ পাদটীকা বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে রলাঁ মন্তব্য করেছিলেন: "আজকের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর অরবিন্দ তন্ত্রকে যথার্থ পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে না-পালিয়ে তন্ত্র তার মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং তাকে আয়ত্ত করে। আপোলোনীয়ের (Apollinien) বিপরীত এ হচ্ছে দিওনিশীয়(Dionysiaque)।এটা জানা গুরুত্বহীন নয় যে, রামকৃষ্ণই ভারতের একমাত্র যোগী, যিনি নিজের মধ্যে পরিপূরক দুইটি উপাদানের (তন্ত্র ও যোগ) সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন।" মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ৩০১-৩০৩) সংযোজিত ধনগোপালের গ্রন্থ থেকে রামকৃষ্ণের মুখে বর্ণিত ক্রমশ উচ্চতর ভূমিতে উত্তরণের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি ইংরেজী অনুবাদে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাদটীকায় রলাঁ ধনগোপালের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি এবং গ্রন্থটি সম্পর্কে রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের বিরূপতার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেও উদ্ধৃতিটি

সম্পর্কে বলেছিলেন: "এই সমস্ত আপত্তি স্বীকার করে নিয়েও, আমি ইউরোপীয় পাঠকদের এই লক্ষণীয় মূলপাঠ থেকে বঞ্চিত করা সমীচীন মনে করিনি। এ অন্তত পক্ষে তাদের উপরে ভারতীয় অতীন্দ্রিয় আলোকের প্রতিফলন অভিক্ষেপ করবে। আমাদের মহান ক্যাথলিক দিব্য দ্রষ্টারা যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, উদ্ধৃতিটি নিজের গুণেই আত্মার সেই পবিত্র অভিযাত্রার গ্রন্থে স্থান পাবার যোগ্য।" যদিও রলাঁর সন্দেহ ছিল, কাহিনীটি রামকৃষ্ণের মুখের কিনা। মূল গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকাটি ছিল লাটু মহারাজ সম্পর্কে। সেটিও বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু লাটু মহারাজের চিত্তস্পর্শী কাহিনীর বিষয়ে ধনগোপালের গ্রন্থ ছাড়াও অন্য কোনো প্রামাণিক তথ্য রলাঁর কাছে ছিল না।

সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের উক্তির সমর্থনে (ইং পৃ. ৮৯) মূল গ্রন্থের (পৃ. ১০২) পাদটীকাটি বাদ দেওয়ায় পল মার্সনুর্সেলের সুবিখ্যাত *এসকিজ দ্যুন ইস্তোয়ার দ্য লা ফিলোজফি এ্যাঁদিয়ান* গ্রন্থের তুলনীয় অংশটিই বাদ পড়েছে। ২০০ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকায় মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে রামকৃষ্ণের অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রলাঁ আরি ব্রেমোঁর গ্রন্থ থেকে সন্ত জান দ্য শাঁতাল এবং বিশেষ করে মারি দ্য ল্যাঁকারনাশিয়াঁর (যিনি নিজের এগারো বছরের ছেলেকে ঈশ্বরকে দান করেছিলেন) দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন, রামকৃষ্ণ যে এঁদের কাজ সমর্থন করতেন তার সম্ভাবনা কম; ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকায় গোপালের মা প্রসঙ্গে পশ্চিমী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হিন্দুবিধবাদের বিবাহের শাস্ত্রীয় নিষেধ এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সংস্কার আন্দোলনের উল্লেখ আছে; ২৭০ পৃষ্ঠায় গোপালের মা প্রসঙ্গেই রামকৃষ্ণানন্দের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা এবং বেদমাতার *শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ* গ্রন্থের নাম করা হয়েছে। এ সবই বাদ পড়েছে। এবং দ্বিতীয় খন্ড থেকে বাদ পড়েছে ২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকার সারদাদেবীর উক্তিটি। মিস ম্যাকলাউড সারদাদেবীকে বলেছিলেন রামকৃষ্ণের চেয়ে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত; তাঁর ভাগে পড়েছিল বীরোচিত দিকটি। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সবচেয়ে বড়ো। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তিনি ছিলেন দেহ, বিবেকানন্দ মাথা।"—রঁলা মন্তব্য করেছিলেন, তিনি অবশ্য এই মূল্যায়নের অংশীদার নন। কিন্তু এটি উল্লেখ করেছিলেন রামকৃষ্ণের বিনয়ের দৃষ্টান্ত হিশেবে। ৮৮-৮৯, ১০৬ (হেনরিয়েটা মুলারের

উল্লেখ), ১৪৩,১৮২ ইত্যাদি পৃষ্ঠা থেকেও পাদটীকাগুলো বাদ হয়েছে, যাদের মোটেই অবান্তর বলা যায় না।

ইংরেজী অনুবাদে যেসব পাদটীকার অংশ বর্জন করা হয়েছে তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। ২৪ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ১ পাদটীকা থেকে *ফ্যই দা ল্যাঁদ্* অনুবাদ গ্রন্থটির নাম এবং তৎসংক্রান্ত সমগ্র অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে পাঠকের জানারই সুযোগ হয় না যে রলাঁ কে. এম. পন্নিকর এবং তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়ে কতোখানি উপকৃত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে বাদ পড়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মঞ্জুলাল দাভের বইটির উল্লেখ। *ফ্যই দা ল্যাঁদ*-এর পুনরুল্লেখ করা হয়েছিল মূল দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় (ইং. পৃ. ১৬৩) এবং তা থেকে ফরাসী পাঠকদের জন্যে সাঁওতালদের পরিচয় সংক্রান্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে পাদটীকাটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদে প্রথম খণ্ডে ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠার ৪পাদটীকায় রামপ্রসাদের *ডুব দেরে মন কালী বলে* গানটি বাদ পড়েছে। ৯৯ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকায় প্রারম্ভিক দীর্ঘ অংশ ছিল। তাতে রলাঁ পরবর্তীকালের সংকীর্ণচেতা ইংরেজ শাসনকর্তাদের সঙ্গে প্রথম দিকের শাসনকর্তাদের পার্থক্য নির্দেশ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের বর্তমান কালের অবিবেচক কার্যাবলি, গর্বান্ধ মানসিকতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি একথা যেন ভুলিয়ে না দেয় যে, ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতের নৈতিক ঋণ আছে (les dettes morales envers l'administration anglais), যা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নবজাগরণ সম্ভবপর হতো না। ১৪৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় আর্যসমাজের অরাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লাজপত রায়ের ভূমিকাটি বর্জিত হয়েছে। ১৮৭ পৃষ্ঠায় ১ পাদটীকায় সেই অংশটুকুই বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছিল, রামকৃষ্ণমিশনে অন্তর্ভুক্তির জন্যে কীভাবে রামকৃষ্ণের নির্দেশই মেনে চলা হয়। দ্রষ্টব্য হিশেবে এখানে ধনগোপালের উল্লেখ ছিল। ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১ পাদটীকায় রলাঁ লিখেছিলেন, তিনি গিরিশচন্দ্রের বর্ণনাটি নিয়েছেন ধনগোপালের গ্রন্থ থেকে। পাদটীকায় প্রকাশকের পক্ষ থেকে বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও, "বর্ণনাটি অতি সুন্দরভাবে লেখা" (la narration si bien composée)—রলাঁর এই প্রশংসাবাক্যাংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; একই রকম বাদ দেওয়া হয়েছে ১৯৬ পৃষ্ঠায় ১ পাদটীকা থেকে

ধনগোপালের উল্লেখটি। ২২২-২২৩ পৃষ্ঠার ২ পাদটীকার শেষাংশ বিশ্বনাথ দত্তের উক্তিটি বাদ গিয়েছে, যদিও এই উক্তির আকর ছিল ভগিনী ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকার শেষে এমার্সন সম্পর্কিত অংশটি বাদ গিয়েছে।

এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল পাদটীকার বাক্য ও বাক্যাংশও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, প্রথম খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকায় প্রথম বাক্যটির স্থলে ছিল: "ভৈরবী ব্রাহ্মণীই, ১৮৬৩ সালের দিকে, প্রথম তাঁকে বলেছিলেন যে, অনেক বিশ্বস্ত ও পবিত্রমনা তাঁর কাছে আসবেন।" দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় ১ পাদটীকায় রলাঁর মন্তব্য ছিল: "যুদ্ধের ফলে বিস্তীর্ণ এক ধ্বংসস্তুপের দৃশ্য" (la vue d'un champ de ruines causées par les guerres); সেটি পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে: "The sight of the ruines and destruction of Mother's temple, the result of Mohammedan vandalism." ২২৯ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকায় "For Hindus" কথাটির বদলে ছিল "বেদান্তবাদীদের পক্ষে" (Pour les Vedantistes)। এ সব ছাড়াও দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় মূল বর্ণনীয় অংশের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে একটি সমগ্র স্তবক অনুবাদে ৪ পাদটীকায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজী অনুবাদে রামকৃষ্ণের প্রতি প্রযুক্ত একটি বিশেষণের পরিবর্তনকে সবচেয়ে গুরুতর বলে মনে হয়। রলাঁ লিখেছিলেন: "এই *পুরাণকল্প সত্তার*—এই নর-দেবগণের" (cet être mythique — de l'Homme - Dieux); তার অনুবাদ করা হয়েছে: "of the *mystic* being — of the Man-Gods"। *mythique* বিশেষণের পরিবর্তে *mystic* বিশেষণ প্রয়োগ করায় রলাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[১৫]

ইংরেজী অনুবাদে এ ধরণের পাদটীকা ও পরিশিষ্ঠাংশ বর্জন ও বিশেষণ পরিবর্তনের কোনো সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রকাশকের পক্ষ থেকেও করা হয়নি। রলাঁর গ্রন্থরচনার মুখ্য লক্ষ্য যে পশ্চিমী পাঠক, বিশেষ করে ফরাসী পাঠক, তাতে দ্বিমত নেই। পাদটীকাগুলো

তাদের জ্ঞাতার্থেই যোজিত হয়েছিল। এবং তথ্য ও তত্ত্বের সূক্ষ্মবিচারে তাদের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে তাও অস্বাভাবিক নয়। প্রতিটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রকাশকের পক্ষ থেকে অনুবাদে টীকাটিপ্পনী, এমন কি একটি পৃথক গোটা প্রবন্ধ যোগ করা, সঙ্গতই হয়েছে। রলাঁর পাদটীকাগুলো মূল গ্রন্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইংরেজী অনুবাদে সেই অঙ্গের যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টের তিনটি সংযোজন বর্জন করার কোনো যুক্তিই মানা যায় না।

ছয়

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী লেখার দুরূহ প্রচেষ্টাকে রম্যাঁ রলাঁ নাম দিয়েছিলেন "আত্মার তীর্থযাত্রা"[১] এবং সেই তীর্থযাত্রায় "বিশ্বস্ত সঙ্গিনী" তাঁর বোন মাদলেনকে উৎসর্গ করেছিলেন রামকৃষ্ণের জীবনী। তারপর গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের কথা বলার আগে যোগ করেছেন জ্যুল মিশ্‌লের *লা বিব্‌ল দ্য ল্যুমানিতে* (১৮৬৪) থেকে নাতিদীর্ঘ একটি উদ্ধৃতি, যেখানে মিশ্‌লে বিশ্রাম নেবার, নতুন করে নিঃশ্বাস নেবার এবং মহান জীবন্ত ঝর্ণা-ধারায় সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠার জন্যে সুপারিশ করেছেন ভারতবর্ষকে।

> পশ্চিম অতি সঙ্কীর্ণ। গ্রীস অতি ক্ষুদ্র: সেখানে দম বন্ধ হয়ে আসে। জুডিয়া শুকনো খটখটে: সেখানে আমি হাঁপিয়ে উঠি। তাকানো যাক এশিয়ার দিকে। সেখানেই রয়েছে আমার মহান কবিতা, ভারত-মহাসাগরের মতো বিশাল, আশীর্বাদধন্য, সূর্যকিরণে স্বর্ণাভ, দিব্য সুরসংগতির গ্রন্থ—যাতে কোনো ঐক্যহীনতা নেই।[২]

রম্যাঁ রলাঁর রচনার উদ্দিষ্ট ছিলেন পশ্চিমের পাঠকেরা। তাই প্রথমেই যোগ করেছেন *আমার পশ্চিমী পাঠকদের উদ্দেশে* শিরোনামে একটি মুখবন্ধ। তাতে তিনি লিখেছেন যে, মানুষের মিলনসাধনের জন্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইউরোপের জাতিগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে দুটি শ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানি ও ফরাসীর,—ভাই হয়েও যারা শত্রু,—মিলন সাধনের প্রয়াস করেছেন। গত দশ বছর ধরে সেই একই প্রচেষ্টা তিনি করে চলেছেন পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে। ভুল করে, ভাবা হয় যে, পশ্চিম ও পূর্ব—যুক্তি ও বিশ্বাস—দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের অধিকারী; কিন্তু যুক্তি ও বিশ্বাসকে পশ্চিম ও পূর্ব উভয়েই সমানভাবে গ্রহণ করেছে। পশ্চিম ও পূর্ব—মানবাত্মার দুই অংশ। কিন্তু এদের মধ্যে অসম্ভব বিভেদ কল্পনা করা হয়। ধরেই নেওয়া হয় যে এদের মিলন অসম্ভব, কিন্তু তা হচ্ছে দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা।

রলাঁর মতে, একদিকে যাঁরা নিজেদের ধার্মিক বলে ঘোষণা করেন, তাঁরা নিজেদের বন্দী করে রাখেন ধর্মায়তনে, কখনো তা থেকে বেরিয়ে আসেন না এবং তার বাইরে কারুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অন্যদিকে মুক্ত চিন্তার অধিকারীরা—যাঁদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ, তাঁরা ধার্মিকদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই কর্তব্য বলে মনে করেন। ধর্ম সম্পর্কে জানা, বিচার করা এবং প্রয়োজনবোধে নিন্দা করার প্রাথমিক যোগ্যতাই হচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনার সত্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। রলাঁর মতে:

> চিন্তার বস্তু নয়, চিন্তার প্রকৃতিই তার উৎসকে নির্ধারিত করে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত করতে দেয় তা ধর্ম থেকে উদ্ভূত কি না। যদি কোনো চিন্তা একলক্ষ্য আন্তরিকতার সঙ্গে স্বার্থত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অকুতোভয়ে সত্যের সন্ধানে তৎপর হয়, তাকে আমি ধর্মমূলক বলব।[৩]

রলাঁ বলেন: ''তিনি নিজে কোনো ব্যক্তিগত ভগবানে বিশ্বাস করেন না। প্রবাদের খ্রিষ্টের মতো ভগবান যে বেদনাবহনকারী, তা তো করেনই না। তিনি বিশ্বাস করেন, যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাদের মধ্যে, সুখের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত প্রকারের জীবনের মধ্যে, মানবজাতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, বিশ্বজগতের মধ্যে—একমাত্র ভগবান তিনি, যিনি নিরন্তর সৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে সৃষ্টি ঘটে চলেছে।'' ধর্ম কখনো সম্পূর্ণ হয় না। এবং তা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম এবং সংগ্রামের ইচ্ছা—এক নির্ঝরের জলোচ্ছ্বাস, কখনোই বদ্ধ জলাশয় নয়।[৪]

মানুষের ''আত্মার গভীরতম প্রদেশ, প্রস্তর, বালুকা, হিমবাহের অভ্যন্তর থেকে অনন্তকাল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে'' এক পবিত্র নদী, তারই মধ্যে থাকে আদিমতম শক্তি, তাকেই তিনি বলেন ধর্ম। এই নদী বয়ে চলে মানুষের সত্তার অন্ধকার তলহীন জলের উৎস থেকে অনিবার্য নিম্নভূমি বেয়ে চৈতন্যের সমুদ্রে—যে চৈতন্য উপলব্ধ এবং আয়ত্তাধীন সত্তায়। জলের যেমন বাষ্পীভবন এবং মেঘের মাধ্যমে আবার জলাধারে প্রত্যাবর্তন জলরূপে, সৃষ্টিও তেমনি চলে বাধাহীন পরম্পরায়। উৎস থেকে সমুদ্রে, সমুদ্র থেকে উৎসে, সব কিছুই আদি ও অনন্ত সত্তার সেই একই শক্তি। একে ভগবান বলা হোক কি শক্তি বলা হোক, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। একে বস্তুও বলা চলে, কিন্তু কোন প্রকৃতির বস্তু, যখন এর মধ্যে মানসশক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়? বিমূর্ত নয়, জীবন্ত ঐক্যই এই সবের সার। রলাঁ যেমন এই ঐক্যের পূজারী, তেমনি জগতের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী এবং শ্রেষ্ঠ অজ্ঞাবাদীরা (agnostique)—যাঁরা সচেতনভাবেন নিজেদের মধ্যে এ বহন করেন, সচেতন বা অচেতন ভাবে এর পূজারী।

নতুন ভারতে এক শতাব্দী যাবৎ এই ঐক্যকেই সকল মহাজনেরা লক্ষ্যবস্তু করেছেন। এক শতাব্দী ধরে ভারতের পুণ্য মৃত্তিকা থেকে মানুষ ও চিন্তার যেন জাহ্নবীধারা উৎসারিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য যাই হোক, তাঁদের লক্ষ্য এক—ভগবানের মধ্যে দিয়ে মানুষের মিলন। কর্মীদের সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ঐক্যই ব্যাপ্তি ও স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিরাট আন্দোলন কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব, যুক্তি ও বিশ্বাসের ক্ষমতার উপরে সম্পূর্ণ সমানভাবে ভিত্তি করে, সহযোগে গড়ে উঠেছে। এর বিশ্বাসের মধ্যে বিচারবিহীন অন্ধতা নেই, আছে এক জীবন্ত অন্তর্ভেদী স্বজ্ঞা (intuition)। এবং এঁদের মধ্যে থেকেই তিনি দুজনকে বেছে নিয়েছেন, যাঁদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধান্বিত: "কারণ, অতুলনীয় মনোহারিত্বে এবং শক্তিতে তাঁরা সর্বজনীন আত্মার অত্যুৎকৃষ্ট সিমফনি। তাঁদের বলা চলে এই সিমফনির মোৎসার্ট এবং বেঠোফেন,—দেবদূতগণের পিতা (Pater Seraphicus) এবং বজ্রধারী দেবরাজ—তাঁরা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।"[৫]

রলাঁ লিখেছেন, তাঁর গ্রন্থের বিষয় বস্তু তিনটি হলেও মূলত একটিই। এই দুটি অসামান্য জীবনকাহিনী একালেই উদ্‌ঘাটিত হলেও, তাদের অর্ধেক কিংবদন্তি এবং অপর অর্ধেক সত্যিই মহাকাব্য। এই দুই জীবনকাহিনীর সঙ্গে তাঁদের মহিমান্বিত চিন্তাধারা সংযুক্ত, এবং সেই চিন্তাধারা যেমন ধর্মসংক্রান্ত, দার্শনিক, তেমনই নৈতিক ও সামাজিক। এঁরা অতীত ভারত থেকে আধুনিক মানুষের জন্যে বাণী বহন করে এনেছেন। এঁদের করুণার আগ্রহ, কাব্যময় সৌন্দর্য এবং হোমেরীয় গাম্ভীর্যই প্রমাণ করে কেন তিনি এঁদের দুজনকে ইউরোপীয় পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

রলাঁ আরও বলেছেন, কেবল দুঃসাহসীর কৌতূহলই তাঁকে এই দীর্ঘ যাত্রায় ব্রতী করেনি। তিনি লেখেন সেই সব পাঠকদের জন্যে, যাঁরা তাঁদের খুঁজে পান তাঁর লেখার মধ্যে নিজেদের আবরণমুক্ত অনাবৃত সত্তাকে। তাঁর কাছে শতাব্দী এবং জাতির গন্ডির কোনো অর্থ নেই। তারা আত্মার আবরণ মাত্র। সমগ্র বিশ্বই তার নীড়, এবং প্রত্যেকের মধ্যেই যখন আত্মার নীড়, তখন প্রত্যেকেই আত্মার অধিকারী। রামকৃষ্ণকে জানতে গিয়ে খাঁটি ফরাসী ক্যাথলিক বংশোদ্ভূত রলাঁ এমন কিছুই জানেন নি, যা তাঁকে নতুন করে জানতে হয়েছে। তিনি তা যেন আগেই জেনেছিলেন, সে স্মৃতি তাঁর ছিল। রামকৃষ্ণকে মনে

হয়েছে যেন একখানি অতি পুরাতন গ্রন্থ যার প্রতিটি পৃষ্ঠা তার কণ্ঠস্থ ছিল।[৬]

রলাঁ মনে করেন, রামকৃষ্ণ পশ্চিমের খ্রিষ্টেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামকৃষ্ণের বাণীকে মনে হয়েছে, আত্মার এক নতুন বাণী, ভারতের ঐকতান। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই ঐকতানের মধ্যে আছে পশ্চিমী সংগীত-প্রতিভাধরদের সৃষ্টিগুলোর মতোই অতীত থেকে সংগ্রহ-করা বিভিন্ন সুরের সমাবেশ। তিনি মনে করেন, পাঠকদের কাছে হাজির-করা-তাঁর-বর্ণিত চরিত্রটি তিরিশ কোটি নরনারীর দুই হাজার বছর ব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ, এবং তাঁর আত্মা আধুনিক ভারতকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে। তিনি গান্ধীর মতো কর্মবীর নন, গ্যয়টে, রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী-প্রতিভা নন, বাংলার এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ। "কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ জীবন আলিঙ্গন করেছিল মানুষ এবং দেবতার সমগ্র বহুত্ব (multiplicité)"।[৭]

আমার পূর্বদেশীয় পাঠকদের উদ্দেশে শিরোনামের মুখবন্ধটি তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত। শুরুতেই তিনি সবিনয়ে, জানিয়েছেন যে, যতো উৎসাহই তাঁর থাক না কেন, কোনো পশ্চিমীর পক্ষে হাজার হাজার বছরের চিন্তার অভিজ্ঞতা-সমন্বিত এশিয়ার মানুষদের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রায়শই ভুল হয়। কিন্তু শুধু এইটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আন্তরিকতা নিয়েই তিনি সমস্ত প্রকার জীবনের মধ্যে প্রবেশের সাধু প্রচেষ্টা করেছেন।

কিন্তু রলাঁ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিমের মানুষ হিশেবে তিনি মুক্ত-চিন্তার বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করেননি। রামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের কাছাকাছি, কারণ তিনি তাঁর মধ্যে একজন মানুষকেই দেখেন, কোনো "অবতারকে" দেখেন না, যেমনটি তাঁর শিষ্যেরা দেখে থাকেন:

> বৈদান্তিকদের সঙ্গে একমত হয়ে আমার প্রয়োজন হয় না ভাগ্যবান মানুষদের মধ্যে ভগবানকে গন্ডিবদ্ধ করে রাখার, এ কথা স্বীকার করার জন্যে যে, দিব্য বাস করে আত্মায় এবং আত্মা সর্বভূতে—আত্মাই ব্রহ্ম; কারণ, না-জানলেও, তা এক ধরনের, মননের "জাতীয়তাবাদ" এবং আমি তা মানতে পারিনা। যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে আমি ভগবানকে দেখি। নিখিল বিশ্বে যেমন, ন্যূনতম ভগ্নাংশের মধ্যেও তাঁকে আমি তেমনি সম্পূর্ণভাবে দেখি। মূল সত্তার কোনো পার্থক্য নেই।[৮]

আর এইজন্যেই তিনি অতীতের ও সমসাময়িক কালের আধ্যাত্মিক মহাবীরদের সঙ্গে তাঁদের হাজার হাজার অজ্ঞাতনামা সহযাত্রীর মধ্যে কোনো ব্যবধান দেখতে পান না। যুগযুগান্তের অভিযানকারী আত্মার বিপুল বাহিনীর মধ্যে থেকে যেমন বুদ্ধ ও খ্রিষ্টকে বিন্দুমাত্র পৃথক করা চলে না, তেমনি পৃথক করে দেখা যায় না রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে। যে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তি গত শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতে জন্মলাভ করে তাঁদের দেশের প্রাচীন প্রাণশক্তিকে পুনর্জীবিত করেছেন এবং দেশে চিন্তার বসন্তকাল এনেছেন, এই সঙ্গে তিনি তাঁদেরও পরিচয় দেবেন।

পশ্চিম ও পূর্বের "পাঠকদের উদ্দেশের" পর রম্যাঁ রলাঁ তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন *প্রস্তাবনা* (Prélude) দিয়ে এবং স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কাহিনী শুরু করবেন "উপকথার মতো" করে (Comme un conte fabulaux)। কিন্তু এটাই অসাধারণ ঘটনা যে, এই প্রাচীন লোককাহিনী (légende), যা আপাতদৃষ্টিতে পুরাণের জগতের অন্তর্গত, বাস্তবে তা সেইসব মানুষেরই বিবরণ যাঁরা সেদিনও বেঁচে ছিলেন; তাঁরা ছিলেন আমাদের "শতাব্দীর" প্রতিবেশী এবং এখনও এমন মানুষ আছেন যাঁরা তাঁকে নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর সঙ্গীদের কারো কারো সঙ্গে রলাঁ কথা বলেছেন এবং তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। তাছাড়াও, এই সব চোখে-দেখা সঙ্গীরা বাইবেলের কাহিনীর মতো অশিক্ষিত জেলেরা নন; কেউ কেউ মহান চিন্তাবীর, তাঁরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। তবু তাঁরা কথা বলেছেন তিন হাজার বছর আগেকার মানুষের মতো।

পাদটীকায় রলাঁ জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থরচনার সময়ে (১৯২৮, শরৎ) বেঁচে ছিলেন রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে স্বামী শিবানন্দ; স্বামী অভেদানন্দ; স্বামী অখন্ডানন্দ; স্বামী সুবোধানন্দ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ; মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত; রামলাল চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে, যাঁদের খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রলাঁর মতে, এই বিংশ শতাব্দীতে একই মস্তিষ্কে একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রাচীন কালের অলৌকিক বস্তুদর্শনের মনন—এই দুই-য়ের সহাবস্থান (যেমন গ্রীক যুগে, বাইবেলের যুগে ছিল) এ যুগের বিজ্ঞেরা

ভাবতেও পারেন না। "তাঁরা আর যথেষ্ট পাগল নন। বস্তুত তার মধ্যেই আছে সত্যিকার বিস্ময়কর ব্যাপার (miracle), এই জগতের সম্পদ যা তাঁরা জানেন না কী ভাবে উপভোগ করতে হয়।" বেশির ভাগ ইউরোপীয় চিন্তাশীলেরাই নিজেদের আবদ্ধ রাখেন "মানবজাতির বাসভবনের নিজস্ব বিশেষ তলায়"। অতীতের মানুষের বাস-করা তলার ইতিহাস গ্রন্থাগারে জমা থাকলেও তাঁদের মনে হয় যে বাদবাকি বাসভবনে কেউ থাকে না, "উপরের বা নীচের তলার প্রতিবেশীদের কোনো পায়ের শব্দ তাঁরা পান না"। জগতের ঐকতানের সংগীতে গড়ে ওঠে অতীত ও বর্তমান সমস্ত শতাব্দীগুলো নিয়ে, এবং সকলে একই সঙ্গে বাজায়, কিন্তু বাদ্যকরদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে নিজের নিজের বাদ্যযন্ত্র এবং স্বরলিপির দিকেই। বর্তমানের এই অপূর্ব ঐকতানের সবটুকু শোনা চাই, যার মধ্যে মিশে আছে "সকল জাতির সকল কালের অতীতের স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা"। হাজার বছরের চিন্তারাশি আমাদের চারপাশেই আছে। কোনো কিছুই মুছে যায় না। শুধু পুথির বিদ্যায় কিছু হয় না, শুনতে হয় কান দিয়ে। এবং তার পরেই রলাঁ লিখেছেন:

> সেই আদিমতম দিন—যেদিন থেকে মানুষ তার অস্তিত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, জীবন্ত মানুষের সেই সমস্ত স্বপ্ন যেখানে বাসা বেঁধেছে, তা হচ্ছে ভারত।[১]

এ. বার্থের *দা রিলিজিয়নস অব্ ইন্ডিয়া* গ্রন্থে প্রকাশিত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত অভিমতের উল্লেখ করে রলাঁ লিখলেন: ভারতের অনন্যসাধারণ সুযোগ হয়েছিল জ্যেষ্ঠা সহোদরা হবার, তার আধ্যাত্মিক বিকাশ জনগণের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালে কখনো বাধা প্রাপ্ত হয়নি। তিরিশ শতাব্দীরও বেশি উষ্ণ মাটিতে মাথা তুলেছে দিব্য দর্শনের মহীরুহ, হাজার হাজার তার শাখা, লক্ষ লক্ষ প্রশাখা। শ্রান্তিহীন ভাবে তা নবীভূত হয়েছে, তার ক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই। সেই মহীরুহের শাখায় শাখায় সব রকমের ফল পাকে; পাশাপাশি, বর্বরতম থেকে সর্বোত্তম প্রকারের—আকারহীন, নামহীন, অন্তহীন, দেবতার দেখা মেলে। মহীরুহ সেই একই।

এই মহীরুহের জটিল শাখাপ্রশাখার সারবস্তু এবং চিন্তা,—যার মধ্যে দিয়ে একই প্রাণরস প্রবাহিত,—"এমনই ঘনসংবদ্ধ যে শেকড় থেকে সর্বোচ্চ

পল্লব পর্যন্ত গোটা মহীরুহই, পৃথিবীর মহাপোতের মাস্তুলের মতো; এবং একই মহান সিমফনি গায়, যে সিমফনি রচিত হয়েছে মানবজাতির হাজার বিশ্বাসের হাজার কণ্ঠস্বরে।" এই বহুস্বর প্রথমে অনভ্যস্ত কানে বেসুর এবং গোলমেলে ঠেকে, অভ্যস্ত কানে উদ্‌ঘাটিত করে এর গোপন ক্রমোচ্চ শ্রেণী-বিভাগ (hiérarchy) এবং মহান রূপ। তাছাড়া একবার যে তা শুনতে পেয়েছে সে আর পশ্চিমের রূঢ় ও কৃত্রিম শৃঙ্খলা নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পশ্চিমের যুক্তি এবং বিশ্বাস বা বিশ্বাসগুলো সমানভাবে স্বৈরতন্ত্রী এবং পরস্পর বিরোধী। "যে-পৃথিবীর বেশির ভাগই দাসত্বে বদ্ধ, অধঃপতিত কিংবা বিধ্বস্ত, সেখানে রাজত্ব করে কী লাভ মানুষের! তার চেয়ে ভালো জীবনের উপরে রাজত্ব করা, যে-জীবন উপলব্ধ, শ্রদ্ধান্বিত এবং মহান সমগ্রতায় আলিঙ্গিত, যেখানে মানুষ প্রকৃত ভারসাম্যে তার বিরোধী শক্তিগুলোকে সমন্বিত করতে শিখবে।" এটাই হচ্ছে পরম জ্ঞান, যা জানতে পারা যায় "বিশ্ব-আত্মাদের" কাছ থেকে এবং এই আত্মাদের কিছু সুন্দর দৃষ্টান্ত তিনি পশ্চিমী পাঠকদের কাছে হাজির করতে চান। রামকৃষ্ণের জীবনীতে তিনি বর্ণনা করবেন "জেকবের সিঁড়ির" (Jacob's ladder) কাহিনী[১০], যে-সিঁড়ি অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের অন্তরের দিব্য স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে ওঠা-নাম করে।

রামকৃষ্ণের জীবনের-এর প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছে *শৈশবের সুসমাচার* (évangile) এবং পরিচ্ছেদের শিরোনাম সম্পর্কে পাদটীকাতেই রলাঁ পশ্চিমী পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই কথা বলে যে, রামকৃষ্ণের শৈশব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সমালোচনার মনোভাব থেকে বিরত থেকেছেন, যদিও তাঁর সে মনোভাব সজাগ আছে। তিনি কেবল পুরনো কাহিনীকে ভাষা দিয়েছেন। এই মুহূর্তে ঘটনাবলির বিষয়গত বাস্তবতার প্রয়োজন নেই, শুধু জীবন্ত ছাপগুলোর বিষীয়গত বাস্তবতা থাকলেই চলবে। এ ব্যাপারে তিনি ম্যাকস মুলারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন, যিনি পশ্চিমের সমালোচনা পদ্ধতির যেমন বিশ্বস্ত অনুসারী ছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে ছিলেন অন্য ধরনের চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি বিবেকানন্দের মুখে পরমহংসের কাহিনী যেমনটি শুনেছিলেন, তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাই বিশ্বস্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সমসাময়িকদের চোখে-দেখা এবং

অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলি, বিশ্বাসপ্রবণ এবং জীবিত সাক্ষীদের দ্বারা এক ধরনের বাস্তবের বিপর্যয় (inversion), সেটাও একটা প্রণালী এবং ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান, যার তিনি নাম দিয়েছিলেন ডায়ালজিক (dialogic) বা *ডায়ালেকটিক* (dialectic) প্রণালী। "বাস্তবের সমস্ত জ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে এক বিপর্যয়। এই জন্যে সমস্ত আন্তরিক বিপর্যয়ই বাস্তব। পরে সমালোচনী যুক্তি দর্শনের মাত্রা ও কোণের মূল্য-বিচার করবে, এবং সব সময়েই হিশেবের মধ্যে রাখতে হবে মনের বিকৃত আয়নায় ধরা-পড়া প্রতিচ্ছায়াটি।"[১১]

এই পরিচ্ছেদে রামকৃষ্ণের পিতামাতার স্বপ্নাদেশ, মাতার অলৌকিক গর্ভাধান এবং জন্ম (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) থেকে ১৮৫২ সালে কলকাতায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে আসা এবং ১৮৫৬ সালে দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিতের পদগ্রহণ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। রলাঁ রামকৃষ্ণের শিল্পীসত্তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে "শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সুন্দরের জন্যে আবেগময় সহজাত বৃত্তিই প্রথম প্রণালী যার মধ্যে দিয়ে তিনি ভগবানের সংস্পর্শে এসেছিলেন।" অন্যান্য প্রণালী বা পথের সন্ধান তিনি পরে পেলেও, "কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে সরাসরি এবং স্বাভাবিক ছিল ভগবানের সুন্দররূপে আনন্দ-বিহ্বল হওয়া।" রামকৃষ্ণ গাইতেন, অভিনয় করতে ভালোবাসতেন, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে পারতেন। রামকৃষ্ণের আত্মা ছিল প্রোটিয়াসের মতো,[১২] যা দেখতেন, যা কল্পনা করতেন, তাই হয়ে যেতে পারতেন। রূপগ্রহণের এই ক্ষমতা সবসময়েই শিল্প ও প্রেমের লক্ষণ। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের জগতের সমস্ত আত্মাকে আত্মীভূত করার যে প্রতিভা, তার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছিল শৈশবেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম *মা কালী*, তাতে রলাঁ মন্দিরের কালীদেবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তোতাপুরীর কাহিনী। চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম *পরমের সঙ্গে তাদাত্ম্য*। এই পরিচ্ছেদটি রলাঁ শেষ করেছেন এই কথা বলে: "সংক্ষেপে বলতে, বিভিন্ন পথে চালিত সমস্ত ধর্মই ভগবানে পৌঁছায় এইটি তিনি মানলেন। এবং সেইজন্যেই সব পথই পরিক্রমণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন; কারণ তাঁর কাছে উপলব্ধি মানেই অস্তিত্ব এবং কর্ম।"[১৩] পঞ্চম পরিচ্ছেদের

নাম *মানুষের মধ্যে ফেরা*। ১৮৬৬ সালে শেষে ইসলাম ধর্মের পথে (এবং খ্রিষ্ট-ধর্মের পথে) সাধনার পর, রলাঁর মতে ১৮৬৮ সালে তীর্থযাত্রাকালে রামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেন, মানুষের দুঃখযন্ত্রণার চেহারা। তার আগে পর্যন্ত তিনি থাকতেন মন্দিরে কালীগত প্রাণে ভাবাবিষ্ট সম্মোহনের ঘোরে। ঘটনা হিশেবে রলাঁ উল্লেখ করেছেন দেওঘরের সাঁওতালদের সাহায্য এবং প্রজাদের বাকি খাজনা মকুব করতে মথুরবাবুর সম্মতি আদায়। রলাঁ ভগবান সম্পর্কে রামকৃষ্ণের ধারণার ধাপগুলো নির্দেশ করেছেন: ভগবান সর্বব্যাপী, সমস্ত তাঁর মধ্যে আত্তীকৃত; ভগবান সূর্যের মতো, যে সূর্য সমস্ত কিছুর মধ্যে একীভূত হয়ে থাকে। তা থেকেই সমস্ত কিছুই ভগবান। সমস্ত কিছুই ছোটোখাটো সূর্য। দুটোই সত্যি। কিন্তু আগেরটিকে পরেরটি উলটে দিয়েছে, যার জন্যে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন নয়, সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত দুটি যোগসূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত জীবনসত্তার সঙ্গে একই পরম সত্তাকে সংযুক্ত করে রেখেছে। তাই মানুষ হয়ে উঠেছে পবিত্র। রলাঁ বলেছেন ১৮৭৪ সালের কাছাকাছি (খ্রিষ্টধর্মের পথ অনুসরণের পর) রামকৃষ্ণের ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মন্ডলটি সম্পূর্ণ হয়; "তাঁর নিজের কথায় তিনি জ্ঞানবৃক্ষের তিনটি সুন্দর ফল পেয়েছেন—করুণা, ভক্তি, ত্যাগ"।[১৪]

পরবর্তী ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ দুটি মুখ্যভাবে ইউরোপীয় পাঠকদের জন্যে লেখা। পরিচ্ছেদ দুটিতে রলাঁ রামকৃষ্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালের ভারতের আধ্যাত্মিক ও জাতীয়তাবাদী মহাজাগরণের ইতিহাসের নিপুণ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেছেন। যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিক আলোচনায় দুটি পরিচ্ছেদই মূল্যবান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম *ঐক্যসাধকরা: রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ*। এই পরিচ্ছেদের প্রথমে পরিচয় দেওয়া হয়েছে রামমোহন রায়ের: "প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম প্রকৃত বিশ্বনাগরিক প্রকৃতির মানুষ।" রামমোহন রায় চেয়েছিলেন একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা, তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা যার নাম দিয়েছিলেন "বিশ্বজনীনতা"। রলাঁর মতে, রামমোহন নিজেকে "হিন্দু একেশ্বরবাদী" বলে নির্ভুলভাবে নিজেকে অভিহিত করেছেন। রলাঁ বলেছেন: "এক শতাব্দী কাল পরে অরবিন্দ

ঘোষে না পৌঁছানো পর্যন্ত পর্যন্ত রামমোহন রায়ের মতো এইরকম শ্রেষ্ঠতম মনস্বিতার সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির ও অভিজাত স্বাতন্ত্র্যের মিলন আর দেখা যায়নি।''[১৫] রামমোহন তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রবল অভিযানগুলোতে তাঁর মতবাদের ব্যবহারিক দিকটির উপরেও জোর দিয়েছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সমর্থক হন এবং প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান সংগঠক হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রেরণা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপনিষদনির্ভর। দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম নির্ধারিত চারটি মূল নীতির উপর। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম হয় একেশ্বরের ধর্ম। ঈশ্বর শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মূল গুণ করুণা, পরলোকে মানুষের মুক্তির জন্যে তাঁর পরম পূজার প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র সেনকে তাঁর সহযোগীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রলাঁ বলেছেন: ''তিনি ভিন্ন শ্রেণী ও কালের প্রতিনিধি, যে শ্রেণী ও কালের মধ্যে পশ্চিমী প্রভাব গভীরতর ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।'' তিনি এসেছিলেন সময়ের আগে। ১৮৭৩ সালে কেশবচন্দ্র সমাজ-গঠনের জন্যে যে-ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, তাঁকে রলাঁ পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের মহাভ্রমণের অগ্রদৌত্য আখ্যা দিয়ে বলেছেন: ''কেশবচন্দ্রের সামনে এই ভ্রমণ এক মহাদিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করেছিল, তিনি ভেবেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে জনপ্রিয় অনেকেশ্বরবাদ এতো বিরক্তির বস্তু তিনি তার চাবি পেয়ে গিয়েছেন, এবং তিনি তার সঙ্গে একেশ্বরবাদের মিলন ঘটাতে পারেন। কিন্তু এই মিলন যা রামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, একই সময়ে কেশবচন্দ্র তার মধ্যে বুদ্ধিগত আপসের মানসিকতা আনলেন। নিজেকে তিনি বোঝাতে বাধ্য হলেন (অনেকেশ্বরবাদীদের বোঝাতে ব্যর্থ হলেন) যে, মূলত তা তাদের দেবতাদের বিভিন্ন গুণের নাম মাত্র।[১৬] রলাঁ আরও বলেছেন, ''কেশবচন্দ্র ভগবৎজীবন ও পার্থিব জীবন এই দুটির মধ্যে কোনটি যে শ্রেয়তর তা বেছে নিতে পারেননি, অতি সরল আন্তরিকতায় মনে করতেন একে অন্যটির স্বাভাবিক ক্ষতিকারক নয়।''[১৭] ১৮৭৫ সালে *নববিধান* ঘোষণার বছরেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের যোগাযোগের সূত্রপাত। এবং রামকৃষ্ণের সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল ভগবানের সন্ধানে খিন্ন অবসন্ন কেশবচন্দ্রের গোপন ট্রাজিডিটি কী?

কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই বিশুদ্ধ ভারতীয় সমাজ (ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী) গঠনের এবং পশ্চিমীকরণের সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতার নেতৃত্ব দেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিম ভারতের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। রলাঁ দয়ানন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। রলাঁ বলেছেন: দীর্ঘ পনেরো বছর ধনী ব্রাহ্মণ সন্তান দয়ানন্দ সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন পরে ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করে পথে পথে ঘুরেছেন। এ যেন বিবেকানন্দের জীবনেরই প্রথম সংস্করণ, তরুণ বিবেকানন্দ ভারতের সর্বত্র পরিব্রাজন করেছেন। বিবেকানন্দের মতোই দয়ানন্দ জ্ঞানী ও সন্ন্যাসীদের সন্ধানে ঘুরেছেন, কোথাও দর্শন, কোথাও বেদ, কোথাও যোগাভ্যাস শিখেছেন। বিবেকানন্দের মতোই তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেছেন। ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের মতোই তিনি সকল ক্লান্তি, অসম্মান এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু দয়ানন্দ ছিলেন সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে, কারণ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা বলতেন না। এখানেই বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর একটি পার্থক্য। বস্তুত রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা না-হলে বিবেকানন্দ যা হতেন, দয়ানন্দ ছিলেন ঠিক তাই। প্রশ্রয়-দেওয়া মমতা এবং উপলব্ধির বিরল মনোভাব দিয়ে গুরুদের মধ্যে সবচেয়ে মানবিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আভিজাত্য ও নৈতিক দম্ভকে দমন করেছিলেন। ১৮৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৩ সালের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দয়ানন্দ কলকাতায় ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

দয়ানন্দের কঠোর শিক্ষার সঙ্গে তাঁর দেশীয় চিন্তার নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার গভীর যোগাযোগ ছিল। ভারতের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতায় দয়ানন্দের দান প্রচুর। এই নবজাগৃতি—যা এখন প্লাবনের রূপ নিয়েছে তার তলদেশে কোন কারণগুলো রয়েছে তা ইউরোপকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে রম্যাঁ রলাঁ বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম আক্ষরিক অর্থে *মহান মেষপালকদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ*। এই পরিচ্ছেদে রলাঁ নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় তিন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, আলোচনা ও সম্পর্ক বিচার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণ নিজে উদ্যোগী হয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন, দয়ানন্দের

সঙ্গেও তাঁর মত বিনিময় হয়েছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর কাছেও রামকৃষ্ণ নিজে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, স্নেহপরায়ণ এবং স্থায়ী হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রকৃতি ও তথ্যাদি নিয়ে কেশবচন্দ্রের ভক্তগোষ্ঠী এবং রামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে অমীমাংসিত মতবিরোধ ও মনোবিবাদ দীর্ঘ কালের। বিচার ও বিশ্লেষণ করে রলাঁ দুজনের সম্পর্ক যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিবৃত করেছেন এবং উভয় গোষ্ঠীর অত্যুৎসাহী ও আত্মম্ভরী শিষ্যদের তিরস্কার করেছেন। এই পরিচ্ছেদের শেষে রলাঁ মন্তব্য করেছেন: "রামকৃষ্ণ পরেও চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।........শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মরাও রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা জানতেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করলে তাঁরা উপকৃতই হবেন।" অন্যদিকে কেশবচন্দ্র তথা ব্রাহ্মদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে রামকৃষ্ণ তাঁর দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং তাঁদের মাধ্যমে প্রগতির ও পশ্চিমী চিন্তাধারার অগ্রদূতদের সংস্পর্শে আসেন, যাঁদের মানসিকতার সম্পর্কে কার্যত তাঁর কোনো পরিচয়ই ছিল না।[১৮]

অষ্টম পরিচ্ছেদ *শিষ্যদের প্রতি আহ্বান*-এ বলা হয়েছে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে রামকৃষ্ণের কাছে আগত ২৫ জন শিষ্য ও ভক্তের কথা। তাঁদের মধ্যে একমাত্র লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ছাড়া শিষ্যদের অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চ বর্ণের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর,—কেউ বা কিশোর কেউ বা যুবক। অনেকে এসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশ থেকে। নবম পরিচ্ছেদের নাম *ঠাকুর ও তাঁর সন্তানেরা*। এই পরিচ্ছেদের বর্ণিতব্য বিষয় রামকৃষ্ণের অনুগামীদের দুটি বিভাগ,—যাঁরা সংসারে থেকে ভগবানের সেবা করবেন এবং যাঁরা বাছাই-করা শিষ্য, যাঁরা তাঁর বাণী প্রচার করবেন। এই পরিচ্ছেদে রলাঁ মন্তব্য করেছেন যে, পরহিত (charité) শব্দের অর্থে অস্পষ্টতা আছে; তাকে লোকহিতৈষণার (philanthropie)) সঙ্গে এক করে দেখা হয় এবং রামকৃষ্ণের লোকহিতৈষণা সম্পর্কে এক কৌতূহলজনক অবিশ্বাস ছিল। এই ব্যাপারে রামকৃষ্ণের মনোভাবের উপরে আলোকপাতের জন্যে তিনি স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অশোকানন্দকে অনেক প্রশ্ন কবেছিলেন। তাঁরা সযত্নে উত্তরও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রলাঁর মতে, রামকৃষ্ণের সক্রিয়

। এমন প্রমাণ দিতে পারেননি যে লোকহিতকর্ম তাঁর অপরিহার্য শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়েছিল। এটা পশ্চিমী দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর অভিযোগের বিষয় হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বার্থশূন্য প্রেম ব্যতীত লোকহিতৈষণার মতোই ব্যক্তিগত মুক্তিরও তিনি নিন্দা করেছেন: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি মনে পরহিতের প্রদীপ জ্বালানোর। রামকৃষ্ণ যা তাঁর নিজের কর্মের সীমার মধ্যে, জীবনের পরিধির মধ্যে করতে পারেননি তা ন্যস্ত করে যান তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দের উপরে। মানুষের নিষ্কৃতির জন্যে মানুষের মধ্যে থেকে বিবেকানন্দকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য ছিল। যেন অনেকখানি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর সংসারে কাজ করার, "দীন দরিদ্রের দুর্দশা দূর করার" ভার দিয়েছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ *প্রিয় শিষ্য নরেন* সম্পূর্ণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্কের কাহিনী। একাদশ পরিচ্ছেদ *শেষ সংগীত* এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদ *নদীর সমুদ্রে পুনঃপ্রবেশ*। এই দুই পরিচ্ছেদে ১৮৮১ থেকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তশিষ্যগণ পরিবৃত, পরে অসুস্থ হবার পর ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণেশ্বর থেকে স্থানান্তরিত রামকৃষ্ণের তিরোভাব পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় ও ভঙ্গিতে যা একমাত্র রলাঁর পক্ষেই সম্ভব।

উপসংহারে-এর নাম দেওয়া হয়েছে: *মানুষটি আর নেই। আত্মার যাত্রা শুরু*। এতে শিষ্যদের সংঘবদ্ধ হওয়া, বরানগরে আশ্রম স্থাপন, বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এবং আঁটপুরে ১৮৮৬ সালে খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বরাত্রিতে অগ্নিকুন্ড ঘিরে তাঁর কাহিনী বর্ণনার এবং ধ্যানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রলাঁর মতে, "জন্মের সময় থেকেই এই নতুন সংঘের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অনন্য। এ কেবল পূর্ব ও পশ্চিমের বিশ্বাসের শক্তিই ধারণ করেনি, কেবল এক সর্বব্যাপী বিজ্ঞানের এবং ধর্মীয় ধ্যান-উপাসনার অনুশীলনের ঐক্যই সাধন করেনি, ধ্যানের আদর্শের সঙ্গে এর মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হয়েছিল মানবসেবার আদর্শ।" রলাঁ লিখেছেন: সরল রামকৃষ্ণের কাছে অবনত হয়েছিলেন আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে দাম্ভিক ধর্মনেতা বিবেকানন্দ। তিনিই রামকৃষ্ণের-সম্প্রদায় এবং ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গোটা পৃথিবী ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন নির্গমের (aqueduc) পথ, যে-পথ দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তা ভারতে এবং ভারতের চিন্তা ইউরোপ-আমেরিকায় পৌঁছেছে; বৈজ্ঞানিক

যুক্তিকে বিশ্বাসের সঙ্গে, বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে, যুক্ত করেছে। এবং পরবর্তী খণ্ডে সেকথাই তিনি বলবেন।

পরিশেষে পশ্চিমের পাঠকদের উদ্দেশে রলাঁ বলেছেন: "বর্তমান খণ্ডে আমি ইউরোপীয় চিন্তাকে ধর্মীয় পুরাণকথার সেইসব দেশে নিয়ে গিয়েছি, যেখানে.........বিশাল বটবৃক্ষ, যাকে প্রায়শই পশ্চিম ভেবে থাকে শুষ্ক এবং জীর্ণ,—এখনো পুষ্পিত শাখাপ্রশাখা মেলছে। (পরবর্তী খণ্ডে) আমি সেই চিন্তাকে নিয়ে যাবো অসন্দিগ্ধ পথে তার নিজের ঘরে, যেখানে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আধুনিক যুক্তি। এবং ইউরোপের চিন্তা অবশেষে আবিষ্কার করবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধান একটি দেশ থেকে অন্যকে পৃথক করে রাখলেও, যখন স্বাধীন বোঝাপড়ার "বেতারের" বিষয়াধীন হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যবধান এক চুল এবং এক মুহূর্তের চেয়ে বেশি ব্যবধান নয়।"[১৯]

রামকৃষ্ণের জীবনী সম্পর্কে এ কালের অন্যতম বিদগ্ধ বহুজ্ঞানী এক সমালোচক যথার্থই লিখেছেন: "আমরা একে মূল্য দিই চিরকালের জন্যে কোনো ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়া রামকৃষ্ণের গভীরতম চিন্তাবলির পরিশ্রুত সারবস্তু বলে; উপস্থিত করা হয়েছে এমন এক স্টাইলে যা প্রায়শই পৌঁছে গেছে কাব্যের স্টাইলের কাছাকাছি।"[২০]

দ্বিতীয় খণ্ড *বিবেকানন্দের জীবন*, দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই গ্রন্থে রম্যাঁ রলাঁ পশ্চিমী পাঠকদের সামনে বিবেকানন্দের জীবন এমন যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থিত করেছেন যে, তা যে-কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। তৃতীয় খণ্ড, যার নাম দিয়েছেন *বিশ্ববাণী* (L'evangile Universel), তাতে সম্পূর্ণভাবে বিবেকানন্দের মত ও পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইংরেজী অনুবাদে খণ্ড দুটিকে একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে *The life of Vivekananda and the Universal Gospel*। এটি বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রথম বিদেশীর লেখা গ্রন্থ শুধু নয়, নিঃসন্দেহে এক মহাগ্রন্থ।

গ্রন্থের *প্রস্তাবনায়* রলাঁ প্রথমেই বলেছেন: "রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করায় এবং তার চিন্তার বীজ বপন বিশ্বময় করার দায়িত্ব যে মহান শিষ্যের উপরে পড়েছিল, দেহ ও মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন ঠিক বিপরীত।" বিবেকানন্দের কথা ভাবলেই রলাঁর বারবার মনে হয়

বেঠোফেনের কথা। বেঠোফেনের মতোই তাঁর কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল "কর্ম"। বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর রাজকীয়তা। তিনি সম্রাট হয়েই জন্মেছিলেন । কি ভারতে, কি আমেরিকায় কেউ তাঁর কাছে আসেনি তাঁকে রাজকীয় মর্যাদা না-দিয়ে। তাঁর কাছে জীবন এবং সংগ্রামের অর্থ ছিল এক। রলাঁর মতে বিবেকানন্দের চিতাভস্ম থেকেই "ফিনিক্স" পাখির মতো উঠেছে নতুন করে ভারতের বিবেক,—তার ঐক্যে বিশ্বাস; এবং সেই মহাবার্তা,—বৈদিক কাল থেকে স্বপ্নদ্রষ্টারা যার গভীর ধ্যান করে এসেছেন,—যে মহাবার্তা আজ ভারতকে অবশিষ্ট মানব জাতির সামনে পেশ করতে হবে।

বিবেকানন্দের জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে আঁটপুরে ১৮৮৬ সালে খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বরাত্রির উদ্‌যাপনের পর থেকে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম *পরিব্রাজক*, ভ্রাম্যমাণ আত্মার প্রতি ধরিত্রীর আহ্বান; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: *ভারতে তীর্থযাত্রী*। এই দুই পরিচ্ছেদে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ: *পশ্চিমে মহাযাত্রা* এবং *ধর্মমহাসম্মেলন*। বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের সমকালে আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ভাবধারার অনুপ্রবেশ এবং মার্কিন মানবিকতার পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে ঐতিহাসিক বিচার করা হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে: তাতে এশীয় ভাবধারার অনুপ্রেরিত এ্যাংলো স্যাকসন পূর্বাচার্যগণ—এমার্সন, থোরো, ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতাদর্শের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রলাঁ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, বিবেকানন্দের আমেরিকায় যাবার বহু আগেই সেখানে বেদান্ত সম্পর্কে একটি প্রবণতা ছিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম: *আমেরিকায় প্রচার*। কিন্তু রলাঁ দ্বিধাহীনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, বিবেকানন্দের কাজ ইউরোপের চেয়ে আমেরিকায় অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করলেও পরে তিনি ইংল্যান্ডে যেমনটি অনুভব করেছিলেন, আমেরিকায় তাঁর পায়ের তলার মাটিকে তেমন শক্ত বলে অনুভব করেননি।[২১]

কিন্তু আমেরিকায় যা কিছু ভালো, বিবেকানন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে সেসব বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন; স্বদেশবাসীর কাছে সেসব প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রূপে তুলে ধরেছেন। *ভারত ও ইউরোপের সাক্ষাৎ* নামে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিকে সামগ্রিক

ভাবে ইংল্যান্ডে তথা ইউরোপের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় ও তার পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। রলাঁ বলেছেন, আমেরিকার চেয়েও ইংল্যান্ড তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ইংল্যান্ড ও ইউরোপে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়নি। ইউরোপে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ম্যাকস মুলার এবং পল ডয়সনের মতো অতিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদদের। বিবেকানন্দ এঁদের শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সপ্তম পবিচ্ছেদ *ভারতে প্রত্যাবর্তন*, অষ্টম পরিচ্ছেদ *রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা*। মিশনের আদর্শ, কর্মপন্থায় ও প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দের সর্বাত্মক প্রয়াস বর্ণনা প্রসঙ্গে রলাঁ মন্তব্য করেছেন: "তাঁর মধ্যে *হিন্দু স্বরাজের*, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো চিন্তা ছিল না। তিনি ব্রিটিশের সহযোগিতার উপরে নির্ভর করেছিলেন, যেমনটি নির্ভর করেছিলেন বিশ্বের সহযোগিতার উপরে।"[২২] নবম পরিচ্ছেদ *দ্বিতীয়বার পশ্চিমযাত্রা* এবং দশমপরিচ্ছেদ *প্রস্থান।* অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের ক্রোধোদ্গার এবং হীনতম, দীনতম, পতিততম মানুষের সেবার আহ্বান প্রসঙ্গে রলাঁ বলেছেন, অস্পৃশ্যদের হৃত অধিকার ও হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার জন্যে পবিত্র সংগ্রাম শুরু করেছেন যে এম. কে. গান্ধী তিনিই বিবেকানন্দের মশালবাহী উত্তরাধিকারী।[২৩]

তৃতীয় খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদে দ্বিতীয় খন্ড) *বিশ্ববাণী* (*The Universal Gospel*)। পাঁচটি পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্টে অন্তর্ভূত 'নোট' (Note) আখ্যাত চারটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে সমাপ্ত। শুধু এই খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৯; ইংরেজী অনুবাদে পরিচ্ছেদের একটি নিবন্ধ বাদ দেওয়া হয়েছে। *মায়া ও মুক্তির পথে অভিযান* নামে প্রথম পরিচ্ছেদে রলাঁ বলেছেন: আধুনিক কালে বিবেকানন্দের মুখে যে-বৈদান্তিক চিন্তাধারা যে-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তিনি কেবল তার কথাই বলবেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করবেন, ইউরোপের চিন্তাধারা, তার বিশেষ প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা কতোখানি প্রাসঙ্গিক, কতোখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। আধুনিক মানুষদের মধ্যে, সর্বপ্রথমে চিন্তার বিভিন্ন শক্তির মধ্যে,

এক সমুন্নত ভারসাম্য যাঁরা ঘটাতে পেরেছেন বিবেকানন্দ তাঁদেরই একজন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মতো এমন বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তিনি কমই দেখেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণিতব্য বিষয়: *কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ* ও *জ্ঞানযোগ*। পাশ্চাত্য জগতে হাতুড়েদের হাতে পড়ে *যোগ* ব্যাপরটি বিকৃত হয়ে পড়েছিল। রলাঁ সেই বৈদান্তিক যোগকে পাশ্চাত্য মনের কাছে উপস্থিত করেছেন, ঠিক যেভাবে বিবেকানন্দ সেগুলোকে উপস্থিত করেছিলেন। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে রলাঁর কৌতূহল অনেকদিনের। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং যোগ সম্পর্কে অরবিন্দ ঘোষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার বুঝতে ও জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম *সর্বজনীন বিজ্ঞান-ধর্ম*। রলাঁ বলেছেন, বিবেকানন্দ কখনো জ্ঞানের আন্তরিক এবং সুস্থ মানসিক কোনো অংশই অস্বীকার করেননি। ধর্ম কথাটি তাঁর কাছে মনোভাবের *সর্বজনীনতার* সঙ্গে একার্থক ছিল। তাঁর কাছে যতোদিন ধর্ম এই সর্বজনীনতায় না-পৌঁছোয় ততোদিন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল: "বিজ্ঞান ও ধর্ম একদিন মিলবে ও করমর্দন করবে। কাব্য ও দর্শন পরস্পরের বন্ধু হবে। এটাই হবে ভাবীকালের ধর্ম; এমন ধর্ম গড়ে তুলতে পারলে তা হবে সকল কালের সকল জাতির ধর্ম। এটা একটা পথ যা আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় এই পথেই এসে পৌঁছেছে।" রলাঁ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, বিবেকানন্দ তাঁর সুন্দরতম *সর্বজনীন ধর্ম* উদ্বোধনের জন্যে জ্ঞানযোগের শেষ প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ *Civitas Dei; The City of Mankind.* এই পরিচ্ছেদে রলাঁ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, বিবেকানন্দ চারটি যোগাভ্যাস, সেবা, শিল্প-বিজ্ঞান, ধর্ম (একেবারে আধ্যাত্মিক থেকে একেবারে ব্যবহারিক কর্ম) —মনের সমস্ত পথকেই আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শান্তির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির পূর্ণ প্রকাশ। তিনি মানবজাতির মহানগরী গড়ে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়, কেন্দ্রীয় মঠ ইত্যাদির পরিকল্পনা করেছিলেন। রলাঁ বলেছেন: "বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত জাতি নিয়ে গঠিত এই মহাজাতির ঐক্যের পূর্ণ প্রকাশ ছিলেন তিনি।......তাঁর আদর্শ ছিল চিন্তা ও কর্ম উভয়ের ঐক্য। তাঁর মহান তত্ত্বের দাবি এই সত্যে যে, তিনি শুধু যুক্তি দিয়েই সেই ঐক্য প্রমাণ করেননি,

আলোর চকিত উদ্‌ভাসের মতো ভারতের অন্তরেও ছাপ মেরে দিয়েছেন।"[২৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *Cave canon.* রলাঁ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এই কথা বলে: ভারতের এই মহান শিক্ষা যে একেবারে নিরাপদ নয় তা তিনি গোপন করতে চান না; এর কিছু যে বিপদ আছে তা মানতেই হবে। "আত্মার (পরমাত্মার সত্তার) ধারণা এমনই কড়া মদ যাতে দুর্বল মস্তিষ্কের বিগড়ে যাবার ঝুঁকি আছে।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে রলাঁর সর্বশেষ মর্মস্পর্শী স্বীকৃতিটি এই: "হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে, রামকৃষ্ণের পরম প্রেমে, এবং বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ বাহুতে, মানবজাতির মধ্যে বিদ্যমান সকল দেবতার, সত্যের সকল দিকের, মানবস্বপ্নের সমগ্র রূপের,—যে উদ্‌ঘাটন হয়েছিল, তার চেয়ে নতুনতর, সজীবতর, বলিষ্ঠতর অন্য আর কিছু আমি সকল কালের সকল ধর্মীয় ভাবের মধ্যে দেখতে পাইনি।"[২৫]

এবং সেই সঙ্গেই রলাঁ *উপসংহারে-এ* ইউরোপকে আহ্বান করেছেন এই কথা বলে:

> আমার ইউরোপীয় সহযোগীরা,—প্রাচীর ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে আপনাদের আমি শোনালাম যে আঘাত আসছে এশিয়ার কাছ থেকে.......এশিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে চলুন! এশিয়া আমাদের জন্যে কাজ করছে, আমরা তার জন্যে কাজ করছি। ইউরোপ ও এশিয়া একই আত্মার দুই অর্ধ।.......মানুষ এখনো হয়নি। সে হবে।........ভগবান বিশ্রাম করছেন এবং আমাদের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সপ্তম দিনের ভার দিয়েছেন: তা হচ্ছে বন্দী আত্মার ঘুমন্ত শক্তিগুলোকে মুক্ত করা, মানুষের মধ্যে ভগবানকে জাগ্রত করা, সত্তাকেই নতুন করে সৃষ্টি করা।[২৬]

তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত *বিবেকানন্দের পরে ভারতবর্ষের জাগরণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা* ইউরোপীয় পাঠকদের জন্যে লেখা হয়েছিল এই যুক্তিতে ইংরেজী অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছিল [পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন]। পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত এবং ইংরেজী অনুবাদে রক্ষিত অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ: *রামকৃষ্ণমঠ ও মিশন*; *অতীন্দ্রিয় অন্তর্মুখিতা এবং সত্যকে জানার পক্ষে তার বৈজ্ঞানিক মূল্য*; *প্রথম শতাব্দীগুলোর হেলেনিক খ্রিষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে।*

সাত

রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী রচনার কথা ঘোষিত এবং *য়্যুরোপ* ও *প্রবুদ্ধ ভারত*' পত্রিকায় ফরাসী ও ইংরেজীতে কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই-অনুসন্ধিৎসু মহলে প্রবল কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রন্থ প্রকাশের পর শুরু হয়েছিল এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিমহলে বিস্ময়ের আলোড়ন। তিনটি খণ্ডেরই বিভিন্ন ভাষাতে দ্রুত অনুবাদের উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল।

ইংরেজী অনুবাদ অদ্বৈত আশ্রম, লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল জুরিখ, লাইপৎজিগ থেকে জার্মান (১৯২৯-৩০), হল্যান্ড থেকে ডাচ (১৯২৯-৩০), স্টকহল্ম থেকে সুইডিশ (১৯৩১) এবং মাদ্রিদ থেকে স্প্যানিশ (১৯৩১) অনুবাদ।

রামকৃষ্ণের জীবনী-র সম্ভবত প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৫ মার্চ *য়্যুরোপ* পত্রিকায়। সমালোচক লেঅঁ পিয়ের-কাঁ্যা (Léon Pierre-Quint)। প্রথম খণ্ড *রামকৃষ্ণের জীবনী* ফরাসী সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড। কিন্তু পিয়ের-কাঁ্যা যখন রামকৃষ্ণের জীবনীর সমালোচনা করেন, তখন জানাচ্ছেন যে বিবেকানন্দের জীবনী সংক্রান্ত দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *য়্যুরোপ* পত্রিকার ১৫ অগাস্টের সংখ্যায়। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, সুদূর বুয়েনোস এয়ার্সে *নোস্‌ত্রোস্‌* পত্রিকার মার্চ সংখ্যাতে তিন খণ্ডেরই সুদীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন আরতুরো মোন্তেসানো দেল্‌চি (Arturo Montesano Delchi)। তিনি তিনখন্ড ফরাসী সংস্করণই পড়েছিলেন।

পিয়ের-কাঁ্যা সমালোচনা শুরু করেছিলেন এই কথা দিয়ে: "ভগবান না মানুষ? প্রথম খন্ডে এই প্রশ্নই বিচার করা হয়েছে।" তিনি লিখেছিলেন র‍্যাঁ রলাঁর বিষয়বস্তু সেই সব ভাবনার অতি-বিশাল চিত্রাবলি, যে-সব ভাবনা সমকালের ভারতকে কর্মে প্রবৃত্ত ও পরিচালিত করছে; রম্যাঁ রলাঁ সেটাই ফুটিয়ে তুলেছেন "বিরাট এক সমন্বিত ও সহানুভূতিতে স্পন্দিত মহাকাব্যের আকারে" এবং তা কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি 'আমাদের

কালে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের চরম ও বিভ্রান্তিকর ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে জড়ো করেছেন দুই নায়ক রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে ঘিরে বিষয়বস্তুর উপাদান ও ঘটনাবলি। তাঁর এই গ্রন্থ লেখার অপর উদ্দেশ্য ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদকে পাশ্চাত্য অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে তুলনা করা, উভয়ের পার্থক্য দেখিয়ে ও উভয়ের মধ্যে যেখানে মিল তার উপরে জোর দেওয়া। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছে,—আজকের বেশির ভাগ ধর্মীয় মহাপ্রাণদের মতোই,—সকল ধর্মের ঈশ্বরই সত্য ঈশ্বর। যিশু, মহম্মদ বা শিব পরম আত্মার সীমাহীন নানা রূপের মূর্ত প্রকাশ। ভারতের বহু ঈশ্বর সেই রকম একই দিব্যের গুণাবলি। "এই ভাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় অভিব্যক্তির ঐক্যের মানসিকতা........সমকালীন ভারতের সবচেয়ে উন্নত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অতিপ্রবণ ভাবে জীবন্ত রয়েছে। তাই রম্যাঁ রলাঁ এই দিব্য ঐক্যের মধ্যে যা চান, তা হচ্ছে মানবতার ঐক্য। যদি তাঁরা অভিন্ন হন, তাহলে একই ভাবে মানুষও অভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর মিলতে পারে, আর সেই সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে মানুষ বেরিয়ে আসবে মহৎ হয়ে।"

কিন্তু পিয়ের-ক্যাঁ সমালোচনা প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন যে, রলাঁ ভারতের কোনো কোনো সামাজিক দুর্দশা,—যেমন কোটি কোটি অস্পৃশ্য কিংবা বিধবাদের সম্পর্কে কিছু পরিষ্কার ভাবে লেখেননি।

> ভারতের মতো এখনও প্রায়-সামন্ততান্ত্রিক কোনো দিব্যতন্ত্রে অনমনীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবর্তন হয় খুবই ধীরে। তবুও নতুন এক বিরাট প্রেরণায় ভারত দেশটিতে সত্যি সত্যি আলোড়ন হচ্ছে; সর্বত্র যেমন হয়, এখানেও তেমনি মৌলবাদীরা সর্বপ্রকারের বিপ্লববাদীদের সঙ্গে লড়াই করছে। ভারতের নবজাগৃতির কথা বলতে গিয়ে রলাঁর উচিত ছিল ব্যাখ্যা করা, কেমন করে ঘুম থেকে সে জেগে উঠছে। অল্প কথায় হলেও উচিত ছিল, সেই বিপুল নিরক্ষর এবং হতভাগ্যদের প্রশ্নটিকে তার যথাযথ মাত্রায় দর্শানো; এবং সেটা করা উচিত ছিল, জনগণের নতুন পথ প্রদর্শক, মহান সাধক এবং তাপসদের চিন্তা ও মহৎ কর্ম আমাদের কাছে বর্ণনার আগে।

তাঁর মতে, রম্যাঁ রলাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করে ব্যক্তি এবং বিশেষ করে, উচ্চস্তরের ব্যক্তি। *সম্ভবত তিনি ভুলে যান যে, সেই ব্যক্তি প্রায়শই শুধু—*

যার থেকে তার জন্ম—সেই যৌথতার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি।

অবশেষে তিনি লিখেছেন যে, রম্যাঁ রলাঁর এই কাজে পরস্পর-বিরোধিতা আছে অন্যত্র। সেটা প্রাচ্যের সত্যিকারের মানসিকতা বোঝার জন্যে তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টায়। সেইসব দিব্যশক্তির অধিকারীরা, যাঁরা ভাবের ঘোরেই থাকেন অন্তহীন দিব্যত্বের মধ্যে হারিয়ে যেতে, তাঁরা ইউরোপীয় বোধগম্যতার বাইরেই থাকেন। রম্যাঁ রলাঁ চেষ্টা করেছেন তাঁদের মানসিক অবস্থা আবার যুক্ত করতে তাঁর নিজের হৃদয়ের ধর্ম দিয়ে, তাঁর প্রেমের ধর্ম দিয়ে,—যে ধর্ম অনির্দিষ্ট। একটা গভীর ব্যবধান থেকেই যায়: সেই ধর্ম রলাঁকে নিয়ে যায় মানুষের কাছে, রামকৃষ্ণকে সবার আগে দিব্যত্বের কাছে। দু'টির অবস্থান একেবারে পৃথক।

পিয়ের-ক্যাঁ-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *য়্যুরোপ* পত্রিকায় ১ অগাস্ট সংখ্যায়। তিনি লিখলেন: বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের শিষ্য, কিন্তু গুরুর চেয়ে একেবারে ভিন্ন তাঁর চরিত্র; তাঁর জন্ম অভিজাত বংশে, তিনি বুদ্ধিজীবী, অত্যন্ত বিদগ্ধ, আমেরিকায়-ইউরোপে দীর্ঘভ্রমণ করেছেন। ভারতে তিনি একটি নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন: মঠ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রচারের জন্যে পত্রিকা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, নারীর সম্মান রক্ষার পক্ষে লড়াই করেছেন। আরও সাধারণভাবে তিনি লড়াই চালিয়েছেন সেই আদর্শের জন্যে, ভিক্তর উ্যগো যার সারার্থ বলেছিলেন: শিক্ষা, ন্যায়বিচার, আলো, দাক্ষিণ্য। বিবেকানন্দের ব্যবহারিক কর্মোদ্যোগ দেখে পিয়ের-ক্যাঁ-র মনে হয়েছে, তিনি পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর সেকথার সমর্থন পাওয়া যায় রলাঁর লেখা *ভারতের পুনর্জাগরণ* রচনাটি থেকে [যেটি ইংরেজী অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে]। উনবিংশ শতাব্দীতে একদল মহৎ চিন্তাবীর এবং কর্মদ্যোগী ভারতের জড়ত্বের মূলে প্রচন্ড নাড়া দেন, যে জড়ত্বে ভারত পাঁচশো বছরেরও বেশি অসাড় হয়ে ছিল। রাজা রামমোহনই প্রথম, যিনি দেশের পুরোহিত-তন্ত্র, কুসংস্কার, সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতি, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, নারীদের শিক্ষার জন্যে। যদি ভারতীয় রহস্যবাদের মানসিকতা তাঁর না-থাকত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের সমগোত্রীয় বলে তাঁকে মনে করা

চলত। তিনি যুক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (তাকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন)।

আধুনিক ভারতের অন্যান্য নির্মাতারা, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন, তাঁরা সকলের আগে ইউরোপকে নিজেদের ঘরোয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সমাজ গভীরভাবে ইউরোপীয় খ্রিষ্ট ধর্মে ও সেবাধর্মে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠী ভাগ হয়ে গিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী রূপে। ইউরোপীয় প্রভাব শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল সংখ্যালঘু একদল সীমিত সংখ্যক অভিজাতদের। অন্যরা কম বেশি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বহু ভারতীয় চিন্তাশীল—যাঁদের রলাঁ উপস্থিত করেছেন, তাদের বাসনা এবং স্বয়ং রলাঁর বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে ঠিক এই কারণেই যে, প্রাচ্য পুরোপুরি আমাদের সভ্যতা আত্মীভূত করবে না। আমাদের যথার্থই অপেক্ষা করতে হবে, পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার নতি স্বীকারের জন্যে। রম্যাঁ রলাঁ যেমনটি চান, যেমনটি আশা করেন ও বিশ্বাস করেন যে, ভারতে তার মিস্টিক আদর্শ এবং আমাদের মিস্টিক আদর্শের এক ধরনের একীভবন হবে,—তা কি সম্ভব? সেটা স্বপ্ন........দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নতুন নতুন শক্তিকে আকর্ষণ করার জন্যে "সক্রিয় প্রতিরোধ", যা ভারতের চরিত্র লক্ষণ,—তার সঙ্গে সক্রিয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের বিরোধভঞ্জন বা মিশ্রণ—কেমন করে হবে? প্রথমটি দ্বিতীয়ের পথ ছেড়ে দেবে?—একই ভাবে, ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার ধারণা—যা প্রাচ্যের উপর আধিপত্য করে, তা ব্যষ্টির দায়িত্বের আদর্শের পুরোপুরি বিপরীত, এবং তা হচ্ছে, ইউরোপীয়দের বিস্ময়কর সক্রিয়তার রহস্য।

পিয়ের-কঁ্যা মনে করেন না যে, *ভারতীয় মিস্টিকতা* বা *রহস্যবাদ ইউরোপীয়দের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে*। রম্যাঁ রলাঁ ইউরোপীয়দের বিবেকানন্দের *বিশ্ববাণী* বোঝাতে গিয়ে দেখিয়েছেন, বিবেকানন্দ খ্রিষ্টধর্ম সমেত সমস্ত ধর্মকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, এমন কি বিজ্ঞানকেও। কিন্তু পিয়ের-কঁ্যা মনে করেন যে, ইউরোপ এই বাণী গ্রহণ করবে না। যাঁদের ধর্মীয় মানসিকতা আছে তাঁরা গ্রহণ করবেন না উগ্র গোঁড়ামির জন্যে। পন্ডিতেরা একে বর্জন করবেন তাঁদের নিজেদের জগতের ধারণার জন্যে

অপ্রয়োজনীয় বলে। *তাছাড়া, তাঁর আশঙ্কা যে মিলনসাধনের এই সারগ্রাহিতা কিছুটা ভাসা-ভাসা এবং তার নীচেই বিদ্যমান অক্ষত প্রতিটি বিরোধিতা।*

পিয়ের-ক্যাঁ-র মতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে, রলাঁ সংক্ষেপে ইউরোপীয় রহস্যবাদ সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার চরিত্র-লক্ষণের বেশির ভাগই ভারতীয় চরিত্র-লক্ষণের সদৃশ। এমন কি অভিজাতদের প্রয়োজন একই ভাবাবেশ, পরমের সঙ্গে তাদাত্ম্য, সর্বজনীন নিয়তিবাদে একই বিশ্বাস। তিনি বলেছেন: "এইভাবে, প্রাথমিক খ্রিষ্টানদের সময় থেকে আমাদের আজকের দিনটি পর্যন্ত, পাশ্চাত্যে সর্বকালে, আমরা দেখতে পাই রহস্যবাদীদের একটি ধারা, যা বিস্ময়কর ভাবে ভারতীয় ধারার সদৃশ। সম্ভবত, এটা ভুললে চলবে না যে খ্রিষ্টধর্ম এসেছে প্রাচ্য থেকে এবং সে ধর্ম মূলের কিছু বৈশিষ্ট্য মনে ধরে রেখেছে। বর্তমান কালে রহস্যবাদ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে ইউরোপে সবচেয়ে অধঃপতিত হয়েছে। রহস্যবাদ আর বিশুদ্ধ অবস্থায় নেই।"

১৯৩০ সালের মার্চ মাসেই আর্জেনটিনার বুয়েনোস এয়ার্সে *নোজোত্রোস* (NOSOTROS) পত্রিকায় তিনটি গ্রন্থেরই সমালোচনা করেন আর্তুরা মন্তেজানো দেল্‌চি। তাঁর লেখা সমালোচনাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

তিনি শুরু করেছেন এই কথা দিয়ে: মহাত্মা গান্ধীর জীবন, কর্ম ও ব্যক্তিত্ব বিচার করতে গিয়ে রম্যাঁ রলাঁ সুযোগ পেয়েছিলেন এক নতুন জগৎ সন্ধানের; জগতটি ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক জগৎ। গান্ধীকে তাঁর মনে হয়েছিল বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী। রলাঁর মতো বীক্ষণশীল মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দৃশ্যপট ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি বিচার করেছেন এবং লিখেছেন তিনখানি গ্রন্থ—*রামকৃষ্ণ* ও *বিবেকানন্দের জীবন* এবং *বিশ্ববাণী*।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং তাঁদের অধ্যাত্মদর্শন সম্পর্কে আর্জেনটিনার কিছুই জানা ছিল না। রাজধানীতে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে (তখন এর নাম হয় *যোগ প্রকাশন কেন্দ্র*)। এই কেন্দ্র থেকে ছাপা হয়েছিল বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের কিছু কিছু মতামত। প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ছিল শিকাগোয় প্রদত্ত *বিবেকানন্দের বক্তৃতা* (১৯০৫); *রামকৃষ্ণবাণী* (১৯০৯), বিবেকানন্দের *কর্মযোগ* (১৯১৪);

জ্ঞানযোগ (১৯২২)। বেদান্তদর্শন এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাবলির লেখকদের এবং ম্যাকস মুলার সম্পর্কে জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাঁদের লেখা গ্রন্থাদি যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করে। তাদের সংস্করণ হতে থাকে। রম্যাঁ রলাঁর গ্রন্থ তিনটি যখন প্রকাশিত হয় তখন ভারতবিদ্যা সম্পর্কে আর্জেনটিনায় উপযুক্ত ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করেছে।

এই বিবরণের পর দেল্‌চি মোটামুটি বিস্তৃত ভাবেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীর উল্লেখ করেছেন, তবে এই বিবরণের পর সমালোচনার চেয়ে জীবনকথার বর্ণনার অংশই পরিমাণে অনেক বেশি। তিনি লিখেছেন: "প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে বেদান্ত কোনো ধর্ম নয়, এমন দার্শনিক প্রণালী বা রীতি নয়, যাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিগত মান দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়।........*বেদান্ত কোনো মতবাদ নয় কিংবা তত্ত্বের অথবা প্রকল্পের যৌগিক কিছু নয়, দিব্য চিন্তাও নয়। বেদান্ত তার চেয়েও বেশি কিছু।* আবেগের প্রতি টান থেকে, এক বুদ্ধিগত পরিচ্ছন্নতায়, প্রশংসনীয় বিশ্লেষণী ও তুলনামূলক ক্ষমতায় রম্যাঁ রলাঁ আমাদের দিয়েছেন এক পরিপূর্ণ ব্যাখান।"

তাঁর মতে, রলাঁ এই *প্রত্যয়ে* পৌঁছেছেন বেশ দেরিতে, কমবেশি ৬০ বছরের পরে। এই অভিজ্ঞতা হজম করার পক্ষে তিনি সময় পাননি। কিন্তু রলাঁ বলেন, বৃদ্ধ সেই যে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে এবং যখন সে মনে করে একাজে সে অশক্ত।

দেল্‌চির মতে রলাঁর লেখাতে *অসম্পূর্ণতা* আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ এক মহৎ কর্ম। "এটি রচিত হয়েছে উপযুক্ত সময়েই; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে প্রাচীর পৃথক করে রেখেছিল তাকে এ ভেঙে দিয়েছে। এর কোনো সীমান্ত নেই, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো বিভাগ নেই, বর্ণ ধর্ম জাতির কোনো পার্থক্য নেই। প্রাচ্যপন্থীরা বলেন, শিষ্য যখন তৈরি হয়, তখন গুরু অন্তর্ধান করেন। আর পাশ্চাত্যপন্থীরা বলেন, আত্মা যখন পরিপক্ক হয় তখন তাতে জন্ম হয় খ্রিষ্টের। এ বিবেকের সক্রিয়তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে এবং মুক্তির উদ্বেগকে জাগ্রত করে যার ধ্বংস হয় না।"

দেল্‌চির স্প্যানিশ সমালোচনাটি লেখা হয়েছিল মূল ফরাসী সংস্করণকে অবলম্বন করে। কারণ ইংরেজী ও জার্মান অনুবাদ দ্রুত প্রকাশিত হলেও,

স্প্যানিশ অনুবাদের ক্ষেত্রে দেরি হয়েছিল। প্রথম স্প্যানিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রিদে ১৯৩১ সালে। অনুবাদ করেছিলেন কাম্পো মোরেনো (CAMPO MORENO), তারপর বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১৯৪০, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৫৩ সালে) আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ার্সে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় হেক্তর দে মোরেলের (HECTOR DE MOREL) নতুন অনুবাদ।

তিনটি গ্রন্থেরই জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল অতিদ্রুত ১৯২৯-৩০ সালে (দ্রুত অনুবাদের পেছনে ছিল সম্ভবত মিস ম্যাকলাউডের আর্থিক এবং নৈতিক প্রেরণা)। অনুবাদ করেছিলেন ড. পল আমান। প্রকাশিত হয়েছিল এরলেন- বাখ-জুরিখ এবং লাইপৎজিগ থেকে। জার্মান অনুবাদে এমনকি ইংরেজী, ডাচ অনুবাদে—Der Götten-Mensch, Man-Gods, Godmens (ফরাসী Homme-dieux) রামকৃষ্ণের নামের বিশেষণে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। [ইংরেজী-অনুবাদের *প্রস্তাবনা*-র ২য় পাদটীকায় বহুবচনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে: "The Plural is used to indicate that Ramakrishna was (or was believed to be) the incarnation not only of the Divine Essence, but of the other Gods." - *Translator*]

সমালোচনা করেছিলেন ফ্রিডরিশ লিপসিয়াস, কিন্তু কোন পত্রিকায় তা জানা যায় না। সেটিরই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর জানুয়ারি ১৯৩২ সংখ্যায়। মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছিলেন কে. অমৃত রাও, এম. এ.।

ফরাসী ও স্প্যানিশ সমালোচনার চেয়ে জার্মান সমালোচনাটি চরিত্রগত ভাবে স্বতন্ত্র। মনে হয়, সমালোচক পূর্বাহ্ণেই দীক্ষিত কোনো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পন্থী না-হলেও তাঁদের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাশীল। সমালোচনায় পূর্বোক্ত দুই সমালোচকের মতো তিনি কোনো প্রশ্ন তোলেন নি, কোথাও মতপার্থক্য প্রকাশ করেননি, মুগ্ধচিত্তে বর্ণনাত্মক ভাষায় রলাঁর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আদ্যন্ত সপ্রশংস মতামত প্রকাশ করেছেন।

রলাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন: "সাম্প্রতিক ভারতের, ঈশ্বরগত দুই ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে রলাঁ চেয়েছেন ভারতের

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এই রহস্যাচ্ছন্নদেশটিকে ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠকদের সাক্ষাৎ গোচরে এনেছে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গান্ধীর "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" কাহিনী সাম্প্রতিক কালে এদেশের লোকের মুখে মুখে ফিরছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসার কেউ বা তাঁকে বিদ্রুপ কেউ বা প্রশংসা করছে। অবশ্য ইউরোপের মানুষদের কাছে তিনি হয়ে আছেন শুধুমাত্র একজন সর্বহারার নেতা এবং বিপ্লবী।[২] লোকে দেখছে এক পদদলিত এবং শোষিত জনসাধারণ গান্ধীর নাম এবং ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সংঘবদ্ধ হচ্ছে, অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। কিন্তু কেউ জানে না যে, এই নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি কতোখানি শক্তি যোগাচ্ছে।"

শিক্ষিত লোকেরা হয়তো বেদের প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা জানে, কিন্তু তারা এটাই ভাবতে অভ্যস্ত যে ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বহু শতাব্দী আগেই নিভে গেছে। এর চেয়ে ভুল খুব কমই আছে। ধর্মীয় ভাবাবেশ (ecstasy)—যার মধ্যে ভক্ত তার দিব্যকে তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যতার স্পষ্টতায় দেখতে পায়,—ভারতে আজ তা সাধারণ বস্তু। "প্রতিটি ভক্ত হিন্দু অতি সহজেই নিজেকে এই স্তরে উন্নীত করতে পারে; সেখান থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তরতাজা ঐশ্বর্যময় সৃজনশীল জীবনের নির্ঝরিণী।" যে মানুষটি সম্পর্কে প্রথম বইটিতে লেখা হয়েছে তিনি ভাবাবেশের এই স্তরটিকে জীবনে অসংখ্যবার তুরীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হতেন, তিনি সক্ষম হতেন "একমেব" ব্রহ্মের মূর্তিহীন সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভেদ করতে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার দুটি পথ আছে,—একটি জ্ঞানের পথ, অপরটি প্রেমের পথ। রামকৃষ্ণ সেই ভক্ত যিনি জ্ঞানে পৌঁছেছিলেন প্রেমের মধ্যে দিয়ে। সর্বোত্তম হিশেবে তিনি দিব্যত্বের এক বিশেষ রূপ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে তা ছিল মহামাতা (Great Mother) কালী, ক্রমে ক্রমে তিনি তাকে চোখে দেখতে, হাত দিয়ে ছুঁতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু একটি মাত্র ভাবের সামনে অন্য সমস্ত ভাব ম্লান হয়ে যায়, অবশেষে অদৃশ্য হয়ে যায় যতক্ষণ না অহং-এর নির্দ্বিধ আত্মসমর্পণে "পরম একত্ব" লাভ হয়।

রলাঁর রচনাটি "শুরু হয়েছে রূপকথার মতো। অবশ্য এটা আশ্চর্যজনক যে এই অদ্ভুত উপকথা, যাকে মনে হয় যেন ধার করে আনা হয়েছে পুরাণ-

কাহিনী থেকে, এমন এক মানুষের জীবনী যিনি প্রয়াত হয়েছেন সম্প্রতি অষ্টাদশ শতকে (?), যাঁকে যেসব সমকালের লোকেরা দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন।" "*যে মানুষটির রূপকে আমি কল্পনা করছি তিনি যেন তিরিশ কোটি মানুষের দু'হাজার বছরের অভিজ্ঞতার দেহধারণ করেছেন। তাঁর প্রয়াণের চল্লিশ বছর পরেও, তিনি বর্তমান ভারতের জীবনের উৎস*। তিনি গান্ধীর মতো সক্রিয় মানুষ নন, গ্যয়টে কী রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্প ও চিন্তার প্রতিভা নন। তিনি ছিলেন বাংলার এক গরিব ব্রাহ্মণ চাষী (?) এবং তাঁর বহির্জীবন কেটেছিল এক সীমাবদ্ধ গন্ডিতে যাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না, যা ছিল তাঁর সময়ের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনাবর্তের বাইরে। কিন্তু তাঁর আন্তর অভিজ্ঞতা পরিবেষ্টন করেছিল মানুষ ও দেবতার এক বিচিত্রতা। তিনি অংশগ্রহণ করেছেন দিব্য শক্তির আদিম উৎসে,.....কম সংখ্যকই উৎস পর্যন্ত ঢুকতে পারে। গরিব চাষীটি (?) অবশ্য নিজের অন্তরে উঁকি দিয়ে খুঁজে পেয়েছিল আবার ক্ষুদ্রতম সৃষ্টির পথটি।"

রলাঁ তাঁর অন্তর্বিকাশ আমাদের দেখিয়েছেন অত্যন্ত বিশদ করে, বর্ণনা করেছেন কেমন করে তাঁকে ঘিরে শিষ্যদের জড়ো করেছেন, কেমন করে মানুষেরা তাঁর পাশে ভিড় জমিয়েছে এবং সর্বশেষে কেমন করে বিন্দু সিন্ধুতে গিয়ে মিশেছে। রামকৃষ্ণ গোমড়ামুখো অনুতাপী ছিলেন না, অনুতাপের প্রচারকও ছিলেন না, তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং এক সাধু, তুরীয় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ, যাঁর কাছে মানবিক কোনো কিছুই পরদেশী নয়। রামকৃষ্ণ জানতেন সকল মানুষকে তিনি প্রেমে আলিঙ্গন করেছেন এবং একই সত্য খুঁজে পেয়েছেন সকল ধর্মের মধ্যে। "সময়ের ব্যবধানের কথা মান্য করলে রামকৃষ্ণ আমাদের খ্রিষ্টের ছোটো ভাই।"

সমস্ত সত্তা এবং বাস্তব বস্তুর সঙ্গে ঐক্যই আলোকিতকরণ। "পশ্চিমের মুক্ত ভাবুক আমরা,—আমরা যারা যুক্তি অথবা প্রেমের মাধ্যমে সমস্ত জীবন্ত সত্তার ঐক্য স্বীকার করে নিয়েছি, তারা কী করি? এটাই কি আমাদের প্রচেষ্টার নিরন্তর লক্ষ্য নয়, যে প্রবল আবেগ আমাদের উদ্দীপ্ত করে, আমাদের গভীর বিশ্বাস যা আমাদের জীবনে বাঁচিয়ে-রাখে এবং আমাদের সমর্থ করে তোলে মানুষের মধ্যেকার রক্তাক্ত ঘৃণার সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে?......*এই কি আমাদের আকাঙ্ক্ষা নয় যা এক দিন না একদিন জাতি, ধর্মগুলোর ঐক্যসাধন*

সুসম্পন্ন করবে? এবং সেক্ষেত্রে আমরা কি রামকৃষ্ণের অসচেতন শিষ্য নই?''

রামকৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মহান শিষ্য ''যিনি হবেন তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন তাঁর চিন্তার বীজ'' এবং যিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ছিলেন গুরুর ''সম্পূর্ণ বিপরীত।'' নরেন, পরবর্তী কালে যাঁকে বলা হতো বিবেকানন্দ, ছিলেন কলকাতার মহৎ তরুণ এক ব্যক্তিত্ব, শরীর ও মনের সমস্ত উৎকর্ষই তাঁর ছিল। ''মধ্যযুগীয় ক্ষাত্রধর্মের'' কলাকৌশল তিনি অভ্যাস করেছিলেন এবং ''নিজের দীপ্তোজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।'' অত্যন্ত সতর্কভাবে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের বিজ্ঞান পড়েছিলেন। তিনি দর্শন ও গণিত শাস্ত্র পড়েছিলেন, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন, রাত্রে বেদান্তের গভীর অনুশীলন এবং ''খ্রিষ্টের অনুকরণ'' করতেন। কেশবচন্দ্র সেনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং কিছু কিছু খ্রিষ্ট অনুরাগী ব্রাহ্মদের সম্প্রদায়ের সদস্য হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের যখন আঠারো বছর বয়স দেবদূতোপম গুরুটি প্রথম তাঁর দিকে ''ঈশ্বরপূর্ণ'' গর্বিত তরুণ ক্ষত্রিয়টিকে আকর্ষণ করেছিলেন, যদিও তখন বাহ্যিক ও আন্তর তোলপাড় চলেছিল তাঁর গর্ব ধূলিসাৎ না-হওয়া পর্যন্ত, অবশেষে বন্দী হিশেবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই ''ধর্মান্তরণ'' নয়, তাঁর অন্তরতম নিয়তির পরিপূর্ণতা সাধন। এই সুন্দর স্বাধীন আবেগপ্রবণ তরুণ যিনি জীবনে পেয়েছিলেন সমস্ত সুখ ও আনন্দ, তিনিই নিজের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন কঠিনতম ব্রহ্মচর্য। তিনি জানতেন : '' মনের ও দেহের পবিত্রতা এক আধ্যাত্মিক শক্তি, পবিত্রতার হানি ঘটলে তা নিভে যায়।''

রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়ে প্রথমে তিনি তীর্থযাত্রী রূপে গোটা মাতৃভূমি ঘুরেছিলেন; আঠাশ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে ও শিকাগোর ''ধর্মীয় পার্লামেন্টে'' বাগ্মিতায় বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তর আমেরিকা ঘোরার পরামনের মধ্যে ভগবানের ডাক শুনতে পেলেন তাঁকে ইউরোপ ডাকছে, এক সময় যেমনটি সন্ত পলকে ডেকেছিল। ইউরোপ তাঁর মনে প্রবল ছাপ ফেলেছিল এবং তিনি সেখানে

কম সাফল্য লাভ করেননি। তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন ম্যাকস মুলার, হার্বার্ট স্পেনসার, পল ডয়সন। ভারতবর্ষে ফিরে, অসুস্থ হয়ে পড়লেও রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠন করেন। সেটি সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তি সমস্ত ধর্মের ঐক্যের জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপরে। দ্বিতীয়বার ইউরোপ ঘুরে আসার পর কিছুদিন রোগের সঙ্গে লড়াই করে চল্লিশেরও কম বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর ভাগ্য মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে, যে বিশ্বাস তাঁকে প্রাণিত করেছিল তা মহিমান্বিত এবং স্বাধীন।

দুই জীবনীগ্রন্থের মহান রচয়িতা গভীর ভালোবাসার এবং স্বজ্ঞামূলক বোধশক্তিতে আমাদের সামনে দুটি ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন—একজন গুরু এবং একজন শিষ্যকে, আর এইভাবে তিনি আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের একটা বৃহৎ অংশের সঙ্গে। এই দুটি দানের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আট

রম্যাঁ রলাঁ যে মহৎ উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তা সিদ্ধ হয়েছিল আশ্চর্য দ্রুততায়। ফরাসী ও ইংরেজী সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের প্রধান কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় প্রায় গোটা ইউরোপে এক বিরাট সংখ্যক উৎসুক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অসংখ্য পাঠকের লেখা চিঠিতে রলাঁ অভিনন্দিত হয়ে চলেছিলেন। তিনটি গ্রন্থেরই সংস্করণ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

গান্ধীজিকে যেমন করেছিলেন, এবারে রলাঁ তেমনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে গোটা ইউরোপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯৩২ সালেও ৬ খন্ডের *লারুস* বিশ্বকোশের বিষয়সূচিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাঁরা যে ইউরোপে কতো অপরিচিত ছিলেন এটাই তার চাক্ষুষ প্রমাণ।[১] তার পর থেকে *লারুস* বা *রবের*-এর ছাত্রপাঠ্য ক্ষুদ্রায়তন বিশ্বকোশেও এই দুটি নাম অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

এদেশের মতোই ইউরোপেও কোনো কোনো মহলে গ্রন্থদুটি বিরূপতা লাভ করেছিল। বিরূপ সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন আমাদের অতি পরিচিত ভারততত্ত্ববিদ সিলভ্যাঁ লেভি। রলাঁ তাঁর সমালোচনা শুনেছিলেন কালিদাস নাগের মুখে সেপ্টেম্বর মাসে। সিলভ্যাঁ লেভি অনেক আগেই (১৯২৫ সালে) রলাঁর *গান্ধী*-র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে: রলাঁ ভারতের গৌরব গাইতে গিয়ে ভারতের অহিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি উদ্ভট কল্পনার (fantaisie) প্রাচ্যকে ইউরোপের বিপরীতে হাজির করে এশিয়ার ক্ষতি করেন।[২] রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০): "আমার *গান্ধী*-র পর, আমার *বিবেকানন্দ*-এর জন্যে তিনি (লেভি) আমাকে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া তিনি বিবেকানন্দকে ঘৃণা করেন, যেমন করেন আমাকে (Il hait d'ailleurs Vivekananda, comme il me hait.)। তিনি বলেছেন: "ওই দুটি বাক্যবাগীশ (rhétoriqueurs..........)।" রলাঁর ধারণায় লেভি চান, ভারতবর্ষ হয়ে থাকুক মিউজিয়াম এবং পুথিপত্র, প্রত্নতত্ত্বের বিষয়, তার নবজীবন পাওয়াটা নিষিদ্ধ (défense de revivre)। কিন্তু

ভারতবর্ষ তাঁর অনুমতি ছাড়াই নবজীবন লাভ করবে।" রলাঁ তিক্ত মন্তব্য করেছেন: "......এই শ্রেণীর ইহুদিরা এশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমের (অতিশয়িত) প্রতিনিধি হিশেবে নিজেদের দেখাতে গিয়ে হাসির খোরাক জোগায়! নিজেরা যে কতোখানি বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে সে বোধও (যদি কখনো তাদের সে-বোধ থাকে) এই বিদ্রূপকারীরা হারিয়েছে।"[৩]

রলাঁ ফ্রান্সের এবং ইউরোপের যে গুণীজ্ঞানী বিশিষ্টদের গ্রন্থ তিনটি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঁরি বের্কসন (Henri Bergson), সিগমন্ড ফ্রয়েড। বের্কসন ও ফ্রয়েড ইহুদি হলেও লেভির গোত্রের ছিলেন না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন বিনয়ের সঙ্গে, নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা গোপন না-করে। তিনি লিখেছিলেন: "আপনার তত্ত্বাবধানে আমি ভারতীয় জঙ্গলে ঢুকতে চেষ্টা করেছি। আজ পর্যন্ত আমি এ থেকে আলাদা হয়েছিলাম গ্রীক সুমিতি, ইহুদি সংযম এবং ফিলিস্টিন সংশয়বাদের এক ধরনের মেশামিশির ফলে। আমার সত্বর এর মধ্যে ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল, কারণ সেই জগতের ফল আমার কাছে অপরিচিত থাকা উচিত নয়; শেকড় খুঁজে পাওয়ার জন্যে আমি অনেক—অনেক গভীরে খুঁড়েছি। কিন্তু নিজের সীমা লঙ্ঘন করাটা সহজ নয়।"[৪] বের্কসনের অভিমত জানা যায় রলাঁর মন্তব্যে। রলাঁ বের্কসনের উল্লেখ করেছেন আঁরি ব্রেমঁর সঙ্গে। আঁরি ব্রেমঁ গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ রলাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন ৫ জুলাই। তাতে স্পষ্টই বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ "তাঁর পড়াশোনায় বিরাট সহায়ক হবে; এরা যে পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করছে তা যে চিরস্থায়ী স্থায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলছে তাতে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।" বেশ কিছু পরে রলাঁ নিউ ভাইলার (Neu Weiller)-কে লিখেছিলেন:

> ....রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কথা আজ ফ্রান্সের সবচেয়ে বিনম্র হৃদয়ে পৌঁছেছে........এবং আঁরি বের্কসন ও পাশ্চাত্য ক্যাথলিক গূঢ়বাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পাদ্রী আঁরি ব্রেমঁর মতো মহানদের উপরে স্থায়ী ছাপ রেখেছে।........সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমার তৃপ্তি এই যে আমি কয়েকটা পাথর গেঁথেছি।[৫]

রলাঁ যতগুলো জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ* যে শ্রেষ্ঠ তাতে কোনো মতভেদ নেই। একজন সমালোচক সত্যি

সত্যি লিখেছেন: "কেউ বলতে পারে না এই দুটি জীবনী গ্রন্থে কোনটি সবচেয়ে প্রশংসনীয়, কাহিনী বলার আর্ট, না ঐতিহাসিক সততা, না কি আবিষ্কারকের উদ্দীপনা।"[৬] তিনটিই প্রশংসনীয়, কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসনীয় আবিষ্কারের উদ্দীপনা। গান্ধীর পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতের আবিষ্কারই শুধু নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধনের নিশ্চিত উপাদান আবিষ্কারেই রলাঁ বেশি উদ্দীপনা বোধ করেছেন। বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার দাবি করলেও বিষয়ের সঙ্গে তিনি তাদাত্ম্য বোধ করেছেন এতোটাই, যে তাঁকে যে-কোনো পাঠকেরই মনে হতে পারে তিনি বর্ণনীয় বিষয়বস্তুতে আত্মনিবেদিত, অনুরাগে উদ্দীপ্ত।

রলাঁ শিবানন্দকে ৩ খণ্ড বই পাঠানোর পর উত্তর পান মার্চ মাসেই । স্বামী শিবানন্দ লিখেছিলেন:

> সহস্র ধন্যবাদ......শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সামনে রক্তমাংসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আপনি তাঁকে বিশ্বস্তভাবে এঁকেছেন সম্ভবত তিনি যদি পুরোপুরি তা না-হয়েও থাকেন। আপনি যা করেছেন তা জমকালো এবং চমৎকার। আমি ভাবছি, তা অন্তত কাউকে কাউকে খাঁটি হিন্দু এবং কাউকে কাউকে খাঁটি মুসলমান হতে সাহায্য করবে,—এবং আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান—একথা বলতে পারার মতো অনুসরণ যোগ্য পথ তাদের দেখাবে.........[৭]

রলাঁর পাঠানো বই পড়ে এমা কালভে মার্চ মাসের শেষেই তাঁকে লিখেছিলেন যে, বিবেকানন্দের মূর্তি তিনি নতুন করে দেখতে পেয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁর কাছে ছিলেন পরিত্রাতা (Sauveur)।[৮] উৎসাহিত রলাঁ সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে লিখেছিলেন:

> .....মহান স্বামীকে দেখার এবং তাঁর প্রতিচ্ছবি ভক্তিভরে জিইয়ে রাখার সৌভাগ্য হয়েছিল যে-দুটি চোখের, আমার বইটি যে কোনো ভাবেই তাকে নিরাশ করেনি, তাতে আমি কতো আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এবার আমার মনে হচ্ছে আমার দুই চোখও তাঁকে দেখেছে। শেষের কয়েক বছরে আমি তাঁর সঙ্গে এবং পরমহংসের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে বাস করেছি যেন আমি গঙ্গার পাড়ে দক্ষিণেশ্বরের ছোটো

ঘরটিতে দিনের পর দিন থেকেছি।[৯]

রলাঁর অধ্যাত্ম-ভাবনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে শুধু সাধর্ম্য খুঁজে পায়নি, বলা চলে, তার পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের শুভাশুভে, মঙ্গলামঙ্গলে মানসিক দিক থেকে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণেই, গুরু-শিষ্যের জীবনী প্রকাশের পর থেকে, ফ্রান্সের তো বটেই, ইউরোপের উৎসুক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুর কাছে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীপ্রচারক রূপে গণ্য হয়ে পড়েছিলেন; অন্যদিকে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভারতের যে-কেউই তাঁকে তাঁদের নির্ভরযোগ্য সুহৃদ বলে মনে করতেন। রলাঁ এই ধারণা খন্ডন করার চেষ্টা কখনো করেননি, উপরন্তু সর্বতোভাবে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীর সৌহার্দ রক্ষা করে চলেছেন। এমন কি পরে রামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষে (১৯৩৬-৩৭) নিজেকে পশ্চিমের রামকৃষ্ণপন্থী বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি (Le Ramakrihniste d'Occident que je suis.)।[১০]

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত যতোদিন ইউরোপের বেদান্ত প্রচারকেন্দ্রগুলোর জন্যে রামকৃষ্ণমিশনের পক্ষে মনোনীত স্বামীজি-প্রচারক পাঠানো সম্ভব হয়নি,[১১] রলাঁ ছিলেন বেদান্ত সম্পর্কে উৎসুক এবং অধ্যাত্ম প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত ইউরোপের মানুষের চোখে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং যোগসূত্র। পরামর্শ চেয়ে, মতামত জানিয়ে বহু চিঠি তাঁর কাছে আসতে শুরু করেছিল। তিনি সেসব চিঠির লেখকদের কার্যকর উপদেশ দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন।

এই সময়ে রলাঁ কৌতূহলী আগ্রহী পাঠকদের যেসব চিঠি পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি লিখেছিলেন (৮ এপ্রিল) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে আলজিরিয়ার কনস্তাঁতিনের (Constantine) মাদ্রাসার অধ্যাপক ড. প্রবস্ত্ (J. H. Probst)।[১২] তিনি লিখেছিলেন: উদারপন্থী খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের কাছে এই বই তিনটি এক সত্য উদ্‌ঘাটন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষকরে, সুফি-পন্থীরা চাইবেন রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে। অধ্যাপক প্রবস্তের মতোই তাঁরা মনে করেন রামকৃষ্ণের সর্বধর্মের সারগ্রাহিতা (éclectisme) উত্তর আফ্রিকার ইউরোপীয়, ইহুদি, আরবদের মধ্যে অতি দীর্ঘস্থায়ী জাতি-ধর্মের ঘৃণা কমাবার

উপায় উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ক্যাসাব্লাংকা, রাবাত, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়ার যেসব সরকারী কর্মচারি, অবসরপ্রাপ্তরা, সংবাদপত্রের লেখকেরা,—যাঁরা তাঁকে চিঠিপত্র লেখেন, এরকম ব্যাপার সৃষ্টি করতে ঝুঁকবেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক প্রবস্ত্ রলাঁর পরামর্শ চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে চেয়েছেন ব্রেজিলের বেদান্ত-গোষ্ঠীর ঠিকানা, যাতে পোর্তুগিজ অনুবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কারণ ইংরেজী এবং জার্মানের চেয়ে আফ্রিকার পাঠকদের পক্ষে পোর্তুগিজ পড়াটা সহজ।[১৩] রলাঁ তাঁকে ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালের শুরু থেকেই রলাঁর ভাবনায় নতুন করে জুড়ে বসেছিল ভারত। জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছে, গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়েছেন, দেশব্যাপী সত্যাগ্রহীরা জেল-হাজত ভরিয়ে ফেলেছে। ইউরোপের বহুজনের কাছ থেকে আবেদন আসছে রলাঁর কাছে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে। তিনিও প্রতিবাদ করে চলেছেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন ধারাবাহিক রচনার। রলাঁর উদ্বেগ শুধু গান্ধী ও সত্যাগ্রহীদের নিয়ে নয়, তাঁর উদ্বেগ রামকৃষ্ণমিশনের প্রকৃত বর্তমান অবস্থা নিয়েও, যে মিশনকে তিনি ইউরোপের সামনে হাজির করেছেন, বিবেকানন্দের প্রেরণার সর্বতোমুখী কর্মোদ্যোগ রূপে। উদ্বেগ ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও, ১৯২৬-এর নভেম্বরের পর থেকে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের লেনদেন নেই।

এই সময়ে জুন মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ওডেনভাল্টের *নববিদ্যালয়*-এর শিক্ষিকা শ্রীমতী ফন কেলের।[১৪] প্রায় এক বছর তিনি ভারতে কাটিয়ে এসেছেন, তিনি গান্ধীর আশ্রমে গিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বেলুড়ে তিনি দু'তিন মাস ছিলেন। স্বভাবতই মিশন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে রলাঁ আগ্রহী ছিলেন।

মঠাধ্যক্ষ প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি-জড়ানো রামকৃষ্ণ-মঠ শ্রীমতী কেলেরের মনে "স্মৃতি ও প্রেমের কাব্য" দিয়ে গভীর ছাপ ফেললেও, বর্তমানে আবহাওয়া "কম সন্তোষজনক"। আবহাওয়া "সাধারণ স্তরের এবং অনিশ্চিত" (médicore et incertaine)। শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ শিবানন্দ শান্তশিষ্ট,

"এক জ্যোতির চক্রে বলয়িত"। লোকের চোখে তিনি রামকৃষ্ণের এক প্রতিবিম্ব; কিন্তু সক্রিয় নন, ধ্যানী, সমাহিত। ওঙ্কারানন্দ কর্মশক্তিপূর্ণ এক বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অশোকানন্দ এক বিচ্ছিন্ন মানুষ, "সম্প্রদায়ের সাধারণ মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত" হলেও তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত। "বেলুড়ের অবস্থা স্থিরবদ্ধ, কিছুটা ভারিক্কি ও শ্বাসরোধকারী (La température de Belur parait stagnante, un peu épaisse et étouffante)। এই অবস্থার সহজাত ত্রুটি—আলস্য, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা সমেত রক্ষণশীল যাজকদের পথ ছেড়ে দিতে হয়। "শ্রীমতী কেলেরের মুখে রলাঁ শুনেছিলেন, মিস ম্যাকলাউড আদর্শের এই স্খলনের জন্যে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত। প্রতিবেশী মুসলমানদের যাওয়ার পথ আটকাতে পাঁচিলে ভাঙা কাচ বসানোয় এবং পুলিশ ডাকার প্রস্তাবে তিনি সন্ন্যাসীদের কঠোর তিরস্কার করেছিলেন। বড়ো দিন উদ্‌যাপনে রামকৃষ্ণের ছবির নীচে শিশু-যিশু-কোলে মেরির ছবি রাখায় একদল তরুণ সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে, তাঁদের এই বুঝিয়ে শান্ত করতে হয়েছিল যে, খ্রিষ্ট এশিয়ার মানুষ ছিলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ঢুকেছে (Le nationalisme s'infiltre chez eux.), তাঁরা অত্যাচারী ইউরোপ এবং খ্রিষ্টধর্মকে সমীকৃত করছেন। "মানবিক দুর্বলতা দীর্ঘকাল বড়ো মনকে অনুসরণ করতে পারে না, উঠতে গিয়ে সে পড়ে যায়, তাকে তুলে ধরতে হয়।" সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, বাঁধাধরা কর্মসূচি মনকে গ্রাস করে ফেলে। কেবল লিখিত কথাকেই মানা হয়। সাহসী-প্রতিষ্ঠাতারা কী চান তা স্পষ্ট করে লিখে রেখে যাওয়াটা অপরিহার্য। সন্ন্যাসীরা বাগানের কাজ করেন, কারণ তা লেখা আছে। কিন্তু কী রকম বাগান হবে তার ব্যবস্থাপত্র না-থাকায় তাঁরা শুধুই বাঁধাকপি ফলান। পশ্চিম সম্পর্কে এক বিপুল অজ্ঞতা, ইউরোপের কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচয় নেই। জার্মানি-ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবিদের সম্পর্কে, তাদের শিল্প ও ধর্মীয় জীবন, গথিক গির্জা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানা নেই। রলাঁ শ্রীমতী কেলেরের মুখ থেকেই শুনলেন, তাঁর লেখা বইগুলো যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সত্যি সত্যি গর্ববোধ করছেন। বড়ো বড়ো শিষ্যরা মুগ্ধ হয়েছেন। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে ভগিনী ক্রিস্টিন মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে রলাঁর *রামকৃষ্ণের জীবন* তিনি পড়ে যেতে পেরেছেন। তা জেনে রলাঁ অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছিলেন। (চিঠিখানি মিস

ম্যাকলাউড রলাঁকে পাঠিয়েছিলেন।) শ্রীমতী আরও জানালেন যে, তিনি ইউরোপে বিবেকানন্দের রচনাবলির তর্জমা এবং প্রকাশের অনুমোদন পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী পেলেট *রামকৃষ্ণ কথামৃত* জার্মানে প্রকাশ করতে চলেছেন।

জুন মাসেই এসেছিলেন লন্ডনের পথে কালিদাস নাগ। ইংরেজী-অনুবাদের আগে রলাঁ তাঁর গ্রন্থের ফরাসী খসড়াটি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।[১৫] কিন্তু জুন মাসে কালিদাস নাগ যখন রওনা হয়েছিলেন তখন ইংরেজী সংস্করণ লভ্য হয়েছে। তাঁর মুখ থেকেই রলাঁ শুনতে পেলেন জীবনী-গ্রন্থগুলো ভারতে কী আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কালিদাস নাগ স্বীকার করলেন, তিনি সব সময়েই সঙ্গে জীবনী দুটি রাখেন। ভারতে তারা এক জাতীয় সুসমাচার (Evangile national) হয়ে উঠেছে।

কালিদাস নাগের মুখেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত সংবাদ পেলেন: রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে নিঃসঙ্গতার পীড়া অনুভব করছেন। আদরের বড়ো মেয়েটি মারা গিয়েছে; ছোটো মেয়ের বিবাহিত জীবনও বিড়ম্বিত; ছেলেও সুস্থ নয়। সর্বোপরি অর্থকৃচ্ছ্র। রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশেই বিচ্ছিন্ন। যুব সম্প্রদায় তাঁর দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। গান্ধী তাঁর কাছ থেকে ভারতের সমস্ত প্রাণশক্তি কেড়ে নিয়ে নিয়েছেন। নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে ছবি-আঁকা ধরেছেন। বাইরে ঘোরার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকেন। তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

অরবিন্দের বর্তমান বিবর্তন সম্পর্কে কালিদাস নাগের ধারণা ভালো নয়, অনুকূল ধারণা রলাঁরও নয়। "সবাই জানে (আমরাও জানি), এই মহাগুরু তাঁর পন্ডিচেরির বাড়িতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকেন: তাঁর শিষ্যদের দেখা-শোনা পুরোপুরি তাঁর স্ত্রী (sa femme)[১৬] মীরার (ভূতপূর্বা শ্রীমতী রিশার) হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের সামনে বছরে দর্শন দেন মাত্র একবার। বাকি সময়ে তাঁদের সঙ্গে এবং বাইরের সঙ্গে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। এরই মধ্যে ভারতে এমন রসিকতার অভাব ঘটছে না, যা বলছে: "অরবিন্দ অনেক দিন মরে গেছেন। তাঁর হয়ে অন্য কেউ কথা বলে।" রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সঙ্গে এই সাক্ষাতের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলেছেন। কালিদাস নাগ মানতে চাননি যে অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের উপরে কোনো প্রভাব ফেলেছেন।

রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কে কালিদাস নাগ শ্রীমতী কেলেরের ধারণা এবং মতামতই সমর্থন করলেন। বড়োই দুঃখের বিষয় রামকৃষ্ণমিশন এখন গিয়ে পড়েছে মঠধারীদের মানসিকতার অতি সাধারণ স্তরে। রলাঁ মন্তব্য লিখেছেন: "......এটা লক্ষ করার ব্যাপার এই যে, যাঁরা বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর থেকে নেতৃত্বে এসেছেন সেই বড়ো বড়ো মহারাজরা, রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যেরা উদাসীন ভাবে আবার ঢলে পড়েছেন তুরীয় আনন্দের ধ্যানের মধ্যে (insensiblement retombés dans la contemplation extatique), দেশের মানুষের সেবার জন্যে যা-থেকে বিবেকানন্দ তাঁদের বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁরা বড়োই দূরে সরে গেছেন, সম্প্রদায়ের আচার-আচরণকে নৈরাজ্যের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যেন বুঝতে পারা যায়, আজ সবচেয়ে বড়ো যে-প্রভাব বাইরে থেকে পড়েছে, তা গান্ধীর প্রভাব।"[১৭]

জুলাই মাসে এসেছিলেন মহীশূরের তরুণ এইচ. কে. রাজা. রাও। গত দশ বছর তিনি ইউরোপে আছেন, পড়াশোনা করেছেন মঁপোলিয়ে-য়, সামনের বছর পারী যাবেন পশ্চিমের অতীন্দ্রিয়বাদের উপরে একটা থিসিস তৈরি করতে। তিনি রলাঁর কাছে *জাঁ ক্রিস্তফ* কন্নড় ভাষায় অনুবাদের অনুমতি চাইলেন। *জাঁ ক্রিস্তফ* তাঁর বাইবেল। তিনি রামকৃষ্ণের *কথামৃত* বয়ে নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় যেতে রাজী। তিনি যে পরিবার থেকে এসেছেন সেখানে যোগের চর্চা হয়, নিজেও যোগাভ্যাস করেন।

রলাঁর আক্ষেপ ছিল যে, তাঁর *য়্যুরোপ* পত্রিকার বন্ধুদের তাঁর ভারত সংক্রান্ত লেখাগুলো খুব বেশি আকর্ষণ করেনি, তাঁদের বোধগম্যই হয়নি। (যদিও তাঁরা অতি সংখ্যাল্প)। তাঁদের কাছে এসব "মৃত চিঠি" (lettre morte)। এই রকমই তাঁর বেঠোফেন। অতি দুঃখে রলাঁ মন্তব্য লিখলেন: "আমার চিন্তার ব্যাপারে পুরোপুরি চোখকান-বুঁজে থাকা (aussi hermétiquement fermé) এক গোষ্ঠীর মধ্যে কী করে দিন কাটালাম, পরে এ এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। (কিন্তু ফ্রান্সে আমার সম্পর্কে সব কিছুরই চোখকান- বোঁজা; এবং আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই (et je n'ai pas où aller)।"

অথচ ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বইগুলো ফ্রান্সে সবচেয়ে কৌতূহলজনক

প্রতিধ্বনিও জাগাচ্ছে। এদের কবলে-পড়ার মতো বলে যাদের
মনে হয় না, তেমন লোকদেরও এরা নাড়া দিয়েছে। এঁদেরই একজন পারী ও হল্যান্ডের ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এ. উদো ১৯ অগাস্ট তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে: "যে-অন্ধকারের মধ্যে তিনি এ পর্যন্ত দিন কাটিয়েছেন, মনে হচ্ছে তার মধ্যেই আলোর রশ্মি দেখতে পাচ্ছেন।" তিনি সবিনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন যে, রলাঁ যেন তাঁকে পথ দেখান।[১৮]

অগাস্ট মাসেই রম্যাঁ রলাঁর দেখা হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি চলেছেন রাশিয়ায়, পথচলতি দিন পনেরোর জন্যে জেনিভায় থাকবেন। খবর পেয়ে বোন মাদলেনকে নিয়ে রলাঁ জেনিভায় দেখা করতে এলেন ২৮ অগাস্ট। জেনিভার একটু বাইরে, মালভূমির উপরে তাঁর জন্যে একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে একটা বিরাট বাগানের মধ্যে, যেখানে গ্রীষ্মাঞ্চলের বাঁশের বিশাল ঝাড় গজিয়ে উঠেছে। ঝলমলে আকাশের নীচে তিনি সেখানে নিজের পরিবেশে আছেন। আর তাতে নতুন করে সঞ্জীবিত হয়েছেন। প্রথমে দর্শনে মনে হলো, তিনি একটু ঝরে গেছেন........; সেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক চালচলন আর নেই। জামাকাপড়ের নীচে দেহটা রোগারোগা মনে হলো। কিন্তু মুখখানা ভরাট, রাঙা। রলাঁদের সঙ্গে কথা শুরু হবার পর থেকেই সুহৃদজনের সান্নিধ্যে নিজেকে উদ্ঘাটিত করার আনন্দে তিনি প্রাণময় হয়ে উঠলেন, নতুন করে যেন তারুণ্য ফিরে পেলেন। তাঁর এতো উঁচু-তারে-বাঁধা চিরদিনের কণ্ঠস্বর বড়োই মিহি হয়ে গেছে: বলা চলে স্বরটা "খাদে বাঁধা"; অনন্ত পিতার মতো তাঁর এই শুভ্র মস্তক আর পয়গম্বরের মতো শ্বেত শ্মশ্রুর সঙ্গে (avec cette tête de Père Eternel et cette longue barbe de prophète) এক অনন্য বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে এই কণ্ঠস্বর। পেছনে বসে দুই সেক্রেটারি নিঃশব্দে শর্টহ্যান্ড নিচ্ছেন,[১৯] আরও একজন ভারতীয় আছেন শ্রীরাও, স্ত্রীর সঙ্গে জেনিভার স্থায়ী বাসিন্দা।

কিছুক্ষণ সাধারণ শুভাশুভ জিজ্ঞাসাবাদের পর রবীন্দ্রনাথ সোজাসুজি গুরুতর প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বসলেন। রলাঁ লিখছেন: "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার বইয়ের কোনো কোনো কথা পড়ার পর (তিনি তা না-বললেও তা সুস্পষ্ট) তাঁর মনে যা জেগেছে, স্পষ্টই বোঝা গেল, তার উদ্গার

দিয়ে তিনি প্রথম শুরু করলেন।[২০] তিনি রামমোহন রায়, তাঁর বাবার কথা,—তাঁদের ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টার কথা, (যা ছিল ঘোষিত একেশ্বরবাদ),—বলতে গিয়ে মেনে নিলেন যে, *তা সহিষ্ণু ছিল না*। তাঁর মতে, "সত্যকে অপরিহার্য ক্ষেত্র হিশেবে অসহিষ্ণু হতেই হবে, কারণ কোনো ভ্রান্তি বা চিত্তকলুষিত-করা কোনো মূর্খতা সহ্য করা চলে না।" তারপরেই তিনি চলে এলেন হিন্দু বহুদেবত্ববাদ এবং বিশেষ করে কালী-উপাসনার বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণে। তাঁর আক্রমণে ঘৃণার আবেগদীপ্ত তীব্রতা (un accent de haine passionée) দেখতে পেয়ে রলাঁ লিখেছেন: "এমনটি তাঁর মধ্যে আর কখনো দেখিনি।........অত্যধিক ভাবপ্রবণ মানসিক গতিশক্তির এই মানুষটির কাছে শৈশবের এমন কোনো ছাপ সারা জীবনের চিন্তাধারাকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে-দেখা কালীমন্দিরের বলির দৃশ্যের বর্ণনা এমনভাবে দিয়েছিলেন, রলাঁর মনে হয়েছিল তিনি নিজেই যেন তাঁর শৈশবের শিহরণ অনুভব করেছিলেন। পথ-চলতি শিশু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, রক্তের একটা স্রোত চৌকাঠের নীচের থেকে উপচে উঠছে আর পথ-চলতি নিম্নশ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক নিচু হয়ে রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিয়ে কোলের সন্তানের কপালে তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। বর্ণনা করতে করতে তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন: ".......*এই ধরণের রক্তমাখা নিম্ন স্তর থেকে চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে খুনির হিংস্রতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেশের উপাসনা, রক্তপানে রুচি*।" কোনো অধিবিদ্যার প্রলেপ দিয়ে বা প্রতীকের স্তরে নিয়ে গিয়েও এর সঙ্গে কোনো আপস তিনি মানেন না। (রলাঁর মন্তব্য: "এটা স্পষ্টই বোঝা গেল, তাঁর চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ।) তিনি এমনও বলেছিলেন যে, "*কালীর উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ, সঠিক এবং সৎ-মানসিকতার লোক হতে পারেনা*। (On ne peut point être une âme sainte, droite et honnête en conservant le culte de Kali.)" ।এই বীভৎস দেবীকে (l'abominable déesse) তিনি ধ্বংস করতে চান।(রলাঁর মন্তব্য: "এই ভয়ংকরী মাতা সম্পর্কে নিবেদিতাকে বলা বিস্ময়কর কথাগুলো নতুন করে পড়া যাক!")[২১]

রবীন্দ্রনাথ ভারতের লোকের বিরুদ্ধে, যে-স্তূপীকৃত কুসংস্কার তাদের

পিষ্ট করছে তার বিরুদ্ধে, জ্বলে উঠেছিলেন। এমন কি, *স্বাস্থ্যকর নাস্তিক্যকে* (L'athéisme salutaire)), পশ্চিমের যুক্তিবাদী অস্বীকরণকে (négation rationaliste), যুগযুগান্তের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার জন্যে সাময়িক ভাবেও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। মঙ্গল-অমঙ্গলের বাইরে ব্যতিক্রম হিশেবেও তিনি অধিবিদ্যার মহৎ চিন্তাকে সহ্য করতে পারেন না। রলাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন পশ্চিমের মানুষের মতো, যিনি ব্যবহারিক স্তরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং সত্যিকারের দর্শনকে, এমনকি সত্যিকারের ধর্মকেও, একমাত্র সামাজিক এবং সকলের মঙ্গলের জন্যে ফলপ্রদভাবে কার্যকর বলে বিবেচনা করেন। এই মূল্যেই তিনি মানব-ঐক্যকে গ্রহণ করেন (Il n'accepte d' Uanité humaine qu'à ce prix.)। কথাবার্তায় তাঁকে মনে হলো ক্যাথলিক চিন্তাবিদদের চেয়ে তিনি পশ্চিমের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তকদের বেশি কাছাকাছি।

রলাঁ বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এতো বিরূপতার মূলে আছেন তাঁরই *বিবেকানন্দ*। তিনি তর্ক না-করে রবীন্দ্রনাথকে বলার সুযোগ দিলেন এবং পরে খ্রিষ্টান হিশেবে তাঁর শৈশবের প্রতিক্রিয়া জানালেন। পরিশেষে বললেন যে, "ভারতবর্ষে কালীর নামে যা কলঙ্কিত তারই মতো একই রক্তাক্ত উৎস সেরা একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর।" প্রাচীন বাইবেলে যা বলির পশুর মেদধূমে কলঙ্কিত, তাই সুসমাচারের শ্রেষ্ঠ ফুল: ঈশ্বরের মেষশিশু, নিষ্পাপ বলিপ্রদত্ত খ্রিষ্ট হয়ে উঠেছে। বন্ধনীর মধ্যে রলাঁ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন: ("আমি নিশ্চিত যে এর অনপেক্ষিত হৃদয়-গ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথের মনে অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

সেবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জেনিভা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এন্ড্রুজ। ২৯ অগাস্টের আলাপচারি শেষ হবার মিনিট পনেরো আগে ঢুকেছিলেন ঘরে; তিনি রাশিয়া যাবেন না, সেখানে বাঞ্ছিত ব্যক্তি নন (Persona grata)।[২২] পরদিন (৩১ অগাস্ট) প্রাতরাশের সময়ে রলাঁর সঙ্গে পৃথক আলাপচারির সময়ে, রবীন্দ্রনাথের উপরে অরবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে কালিদাস নাগের বিপরীত মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: রবীন্দ্রনাথের উপরে অরবিন্দ যে প্রভাব ফেলেছেন তা অসাধারণ (extraordinaire), তা এতোদূর যে তাঁদের সর্বশেষ সাক্ষাৎকার রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রায় পালটে দিয়েছে (a faille persque transformer la vie)......একথা সত্যি নয় যে তাঁরা

একরকম নীরব ধ্যানাবস্থায় ছিলেন (à une sorte de méditation silencieuse ensemble)।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আবার এসেছিলেন কালিদাস নাগ এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে সিলভ্যাঁ লেভির অতিশয় বিরূপ মন্তব্যের কথা জানিয়েছিলেন।

রুমানিয়ার অতিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এউজেন রেল্‌জিস (Eugène Relgis) রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে। তিনি ছিলেন আন্তরিকভাবে শান্তিবাদী এবং আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক শান্তি সম্পর্কে রলাঁর কাছে তিনি কয়েকটি লিখিত প্রশ্ন রেখে যান। রলাঁ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন ২০ অক্টোবর।

রেলজিসের প্রশ্নগুলোয় শান্তিবাদ ও আন্তর্জাতিকতা ছিল যে-ইউরোপের প্রসঙ্গে, রলাঁর মতে, তা বর্হির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইউরোপেই সীমাবদ্ধ। তা ইউরোপীয়বাদের ছদ্ম-আবরণে প্যান-ইউরোপ, ইউরোপীয় ফেডারেশন ইত্যাদি নামের সমতুল্য এক নতুন ধরনের সাংঘাতিক জাতীয়তাবাদ। তাই রেলজিসের সহযোদ্ধা হওয়া রলাঁর পক্ষে অসম্ভব। রলাঁ এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, "প্রত্যেক দেশে একই প্রকৃতি ও একই ধারার চিন্তা প্রবাহিত। বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বিচারবুদ্ধি আর কারুর নেই, এমন মনে করাটা কূপমন্ডুক প্রাচীন ইউরোপের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, ...সর্বত্র মানুষ এক। তারতম্য যা কিছু তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের জন্যে।" রেলজিসের প্রশ্নে রাজনীতির প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল, যাকে রলাঁ মসীকৌলীন্য আখ্যা দিয়ে, প্রকৃত রাজনীতি বলতে তিনি কী বোঝেন তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন অন্ন আহরণ ও বন্টনের জন্যে মানব-স্বার্থের সংগঠন এবং কোনো দেশের, অথবা সমগ্র মানব সমাজের সাধারণ স্বার্থ-শক্তি সুশৃঙ্খল ভাবে সংঘবদ্ধ করাই রাজনীতি।" এই রাজনীতি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীর উদাসীন থাকা কখনোই উচিত নয়। অমর্ত্য মানসলোকের নামে মর্ত্য জীবনের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার অধিকার কারুর-নেই। যদি ব্যক্তি মানুষ হিশেবে ইহলৌকিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মনের স্বাধীনতা কিনতে চায়, তাহলে রলাঁর মতে, বিপুল জনগণের কাছ থেকে এই সন্ন্যাসজীবন যাপনের ক্ষমতা চেয়ে নেবার

অধিকার তার নেই। কারণ, জীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মনের এতোখানি সম্পদ সাধারণ মানুষের নেই। তাই, সর্বাগ্রে সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের কথা নিজেদের ভাবতে হবে। তারপরেই তিনি লেখেন:

> সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী ভারতের ফ্রাঁসোয়া দাসিজ, আমার *শিয়রের ঠাকুর* (le saint de mon chevet) রামকৃষ্ণের দুঃসাহসী ঘোষণা আমার কানে বাজছে: "খালিপেটে ধর্ম হয় না।" মনের কাজও খালি পেটে হয় না। রামকৃষ্ণের শক্তিমান শিষ্য, ভারতবর্ষের সেন্ট পল বিবেকানন্দের বিজয়পতাকায় লেখা ছিল এক বিষণ্ণ মহৎ বাণী— "দরিদ্র নারায়ণ"। তিনি বলতেন: "যতোদিন আমার দেশের একটি কুকুর ক্ষুধার্ত থাকবে ততো দিন তাকে খাওয়ানোই হবে আমার ধর্ম।" আমার ধর্মও তাই। ক্ষুধিত নিপীড়িতের সেবক আমি। আমার মনের ঐশ্বর্য তাদেরই জন্যে, কিন্তু সকলের আগে আমার কাছে তাদের দাবি: অন্নের, সুবিচারের, স্বাধীনতার।.........তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করে তুলতে হবে। ....রাজনীতির দিক থেকে মুখ ফেরালে চলবে না। চিন্তা ও কর্মে মহাসমন্বয়কারী গান্ধীজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি ওই দুইয়ের মিলন ঘটাতে প্রচেষ্টা করব।[২৩]

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণের জীবনী পড়ে ব্রাসেলসের দ্যনিজ এস. গিজো নামে এক নার্স তাঁর আবেগের কথা রলাঁকে বলেছিলেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন বেলুড়ে রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে। রলাঁ তা করেছিলেন। এক বছর পরে (৩১মে ১৯৩১) সেই মহিলা রলাঁকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তাঁর জীবনে যে-স্বপ্নকে অচিরতার্থ মনে করেছিলেন, রলাঁর মধ্যস্থতার কল্যাণে তা সফল হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন:

> ......আমি সেই দীক্ষা পেয়েছি যা আমাকে তন্ত্রের পথ ধরে মায়ের কাছে নিয়ে গেছে; এই দীক্ষা আমি পেয়েছি স্বয়ং স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে। আমি এই ভাবে সেই ঐশ্বর্য পেয়েছি যার জন্যে এতো

কেঁদেছি: মন্ত্র এবং গুরু।

আমার আধ্যাত্মিক জীবন এর ফলে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে; আর তার সঙ্গে নিরসন হয়ে গেছে আমার সমস্ত সন্দেহ। *অসংখ্য পথ ধরে ঈশ্বরে পৌঁছানো যায়। একমাত্র ঈশ্বর যদিও কাম্য, তবু তাঁকে লাভ করতে নিজের পথই অনুসরণ করতে হয়।* এইটেই ছিল আমার পথ। এর বাইরে আমি কিছু করতে পারতাম না। প্রতিদিন আমি নিজেকে বেশি শক্তিশালী মনে করছি। একমাত্র এখনই শুধু আমি বেঁচে আছি। স্বাধীন হতে এ কোনো বাধা ঘটায় না। আমি জানি, উপায়গুলো কিছু নয়। তাদের ছাড়িয়ে যেতে হয়, কিন্তু তা না-হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজে লাগাতে হয়। আমার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে-অন্তর অবশেষে আনন্দ ও শান্তিকে খুঁজে পেয়েছে।[২৪]

রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য লিখেছেন: "এই ভাবে গান্ধী[২৫] ও রামকৃষ্ণকে উৎসাহী ইউরোপীয় শিষ্যা দিয়েছি।"

মাস দেড়েক পরে (২৫ অগাস্ট) রলাঁ এক ইংরেজের কাছ থেকে মর্মস্পর্শী দীর্ঘ এক চিঠি পেলেন।[২৬] ইংরেজটির নাম জে. ই. গুজ (J. E. GOUDGE) ১৮৯৩ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ভারত সরকারের আই. সি. এস. কর্মচারী। বর্তমানে তিনি বেডফোর্ডশায়ার, কেমব্রিজশায়ার, হার্টফোর্টশায়ার, হানটিংডনশায়ার, নরফোক এবং সাফোকের জন্যে লিগ অব্ নেশনসের ভ্রাম্যমাণ সচিব। তিনি সেই সমস্ত ইংরেজদের একজন, যাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে কখনো ইতস্তত করেন না। তিনি সদ্য রলাঁর ভারত সংক্রান্ত বইগুলো পড়েছেন এবং খুবই অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু কাজ করতেন যুক্ত প্রদেশে, অবসর নিলে সেই প্রদেশের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। রলাঁ যে-যুগটির কথা লিখেছেন তিনি সেই পুরো যুগটির মধ্যে ছিলেন। "কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার আড়ালে" (derrière l'écran opaque de l'Empire Britanique)। তাঁর দুঃখ এই যে, এইসব মহান ঘটনাবলি ও মহান মানুষদের পাশেই থেকেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেননি। জরিপ-বিভাগের কর্মচারি হিশেবে ১৮৯৮ সালে সেরভিয়ের-দম্পতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, মায়াবতীর (মাইপৎ)

জমি দখলের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তিনি তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি মায়াবতীর সেরভিয়ের-দম্পতির এবং তরুণ সন্ন্যাসীদের দেখেছেন। এক বছরের জন্যে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর গ্রাহক হয়েছিলেন, এখন আবার নতুন করে হতে যাচ্ছেন। তিনি বিবেকানন্দকে দেখেছেন আলমোড়ায়। এছাড়াও, ১৮৯০ সালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে আই. সি. এসের একই বাহিনীতে ছিলেন। অরবিন্দ এসেছিলেন কেমব্রিজ থেকে, গুজ অক্সফোর্ড থেকে। কিন্তু তাঁরা যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করেননি। একথা মনে করতে গুজের লজ্জা হয় যে, অরবিন্দ ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন, পরীক্ষাটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। (রেকাব ছাড়াই ঘোড়ায় উঠতে হতো।) এই ব্যর্থতাই সম্ভবত ইংরেজের সেবা থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দিয়েছিল (cet échec a peut-être décidé de sa carrière, en détournant du service anglais.)।

রলাঁর কাছে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি (১৩ সেপ্টেম্বর) এসেছিলেন সুন্দর শাদা-পাগড়ি-মাথায় অভিজাত বুদ্ধিজীবী আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পি. শেষাদ্রি। তাঁর আক্রোশ গান্ধীর বিরুদ্ধে, তাঁর সম্পর্কে প্রবল অবজ্ঞা, গান্ধী সাহিত্যের সামান্যই মূল্য দেন। ভারতীয় মিস্টিকদের প্রতি, এমনকি অরবিন্দের প্রতিও তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভাব। অরবিন্দের আত্মীকৃত যোগাভ্যাস সম্পর্কে বললেন: "যোগ হচ্ছে মনের ইতির আরম্ভ (Le yoga est la commencement de la fin de l'esprit.)।" অবশ্য নিজের মুখের স্বীকার করলেন রলাঁর বইগুলো থেকেই তিনি রামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেছেন।[২৬]

রম্যাঁ রলাঁ নভেম্বর মাসে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি (১০ নভেম্বর ১৯৩১) পেয়েছিলেন। ধনগোপাল বেশ কয়েক বছর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন; মানসিক যন্ত্রণাবোধ করছিলেন এই ভেবে যে, আমেরিকা ভারতের নৈতিক মহিমার কোনো মূল্যই দেয় না। তিনি রলাঁর *রামকৃষ্ণ* পড়েছিলেন তাঁর এই মানসিক অস্থৈর্যের দিনে। তিনি লিখেছিলেন:

> আমি যখন আপনার *মাইকেল এঞ্জেলো* কিংবা *বেঠোফেন* বা *রামকৃষ্ণ* পড়ি, যে জীবন্ত বস্তু আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা আপনার পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত আপনার গতির প্রচণ্ডতা (Your

fury of movement)—ব্রহ্মের নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে দিওনুসাসের উন্মত্ততার ঘনিষ্ঠ মিলন।...... কোনো রকম পরিবর্তন না-করে আমি বলতে পারি, আপনার এই বইটি *বেঠোফেন* ও *জাঁ-ক্রিসতফ*-এর সমতুল্য। এটা কোনো বই নয়। আমাদের কালের পূতচারিত্রের এক মহাকাব্য। প্রতিটি বাক্যে আপনি মানবজাতির পূতচারিত্রকে খুঁজে বার করেছেন। আপনার বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোয় যে-রামকৃষ্ণ মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠেন, তিনি শুধু একজন পূতচরিত্র হিন্দু সাধু নন, তিনি আমাদের আধুনিক আত্মার ঈশ্বরত্বের নিদারুণ যন্ত্রণাও বটেন। তলস্তয় তাঁর স্বীকারোক্তি লেখার পর, বিশ্বসাহিত্যে কোথাও আমি দেব-মানবের জন্যে মানব-দেবতার বেদনা এমন তীক্ষ্ণ-তীব্র ভাবে পাই না.........এই বই ভারতের সীমাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আলিঙ্গন করে পবিত্রতাকে এবং ....সমগ্র মানবতাকে। পবিত্রতার মহাকাব্যের তো এমনটিই হওয়া উচিত। আপনার *রামকৃষ্ণ* যেমন সরল, তেমনি প্রচন্ড, যেমন তাঁরা—তাঁর প্রচারকেরা বলতেন। ইচ্ছা করে, তাঁর গুরুর যে ছবি আপনি এঁকেছেন তা দেখার জন্যে বিবেকানন্দ যদি বেঁচে থাকতেন! একমাত্র তিনিই করতে পারতেন আপনার উপযুক্ত প্রশংসা। একমাত্র আপনারই রামকৃষ্ণকে ভারতবর্ষ স্বীকার করে.........আপনার *রামকৃষ্ণ* যদি শাশ্বত ভারত হয়, আপনার *বিবেকানন্দ* আমাদের ইতিহাসের শাশ্বত আলোড়ন। *রামকৃষ্ণ অস্তিমান* (is), *বিবেকানন্দ* চলিষ্ণু (moves).......আমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় আপনার *রামকৃষ্ণ* পড়েছি। তার তূর্যধ্বনি আমাকে নৈতিক আশাবাদ এবং আধ্যাত্মিক আনন্দে পূর্ণ করেছে। *এখন আমি অনুভব করছি, স্বর্গে যাবার পাসপোর্ট অর্জন করেছি। কারণ আমিই আপনাকে পরিচয় করিয়েছিলাম রামকৃষ্ণের সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল না যে প্রমথিউস্‌কে নিয়ে আসছি অনন্ত অগ্নিশিখার গোপন উৎসে (I was bringing Prometheus to the hidden source of the Flame eternal.)*।[২৭]

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে গান্ধী ছিলেন সুইট্‌জারল্যান্ডে রম্যাঁ রলাঁর অতিথি। সেখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে ঠাসা-কার্যক্রমের মধ্যেও রলাঁ বহু প্রশ্নের মধ্যে রামকৃষ্ণমিশন

সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে ভোলেননি। তিনি লিখেছিলেন: "রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কেও আমি গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলাম। গান্ধীর রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। আফ্রিকা থেকে প্রথমবার ভারতবর্ষে ফিরে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর আশ্রমেও গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ সেখানে ছিলেন না। এবং তাঁদের কখনো দেখা হয়নি।[২৮] তিনি বললেন, রামকৃষ্ণমিশন খুবই শ্রদ্ধেয়। মিশনকে সব সময়েই নিজের কাজের সহযোগী হিশেবে পেয়েছেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ভাবে সীমাবদ্ধ: বিশেষ করে সেবাশুশ্রূষার কর্মে (রোগীর সেবা ইত্যাদি), এই কর্মে গোটা ভারতবর্ষে মিশন অনেক মঙ্গল করেছে, কিন্তু রামকৃষ্ণের চিত্তের ঔদার্য বজায় রাখা থেকে অনেক দূরে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম থেকে খুব ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে।"

সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ কতিপয় ভারতপ্রেমিকের (?) বিরূপতা ছাড়া রলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী সম্পর্কে অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু এদেশেই দেখা দিয়েছিল তাৎক্ষণিক বিরূপতা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের (নববিধান) পক্ষ থেকে ইংরেজীতে একখানি সম্পূর্ণ বই লেখা হয়েছিল ১৯৩১ সালে *কেশবচন্দ্র এ্যান্ড রামকৃষ্ণ* নামে, লেখকের নাম জি. সি. ব্যানার্জি। বইটি রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিচার, উভয় পক্ষের চাপান-উতোর এবং সেই সূত্রে রামকৃষ্ণের জীবনী লেখার জন্যে রম্যাঁ রলাঁকে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে আক্রমণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ জুড়ে।

গ্রন্থের সম্পর্কে সোজাসুজি লেখক লিখেছেন: "রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁ যা লিখেছেন তার এখানে-ওখানে গভীর সত্য আছে বলে মনে হবে। কিন্তু অন্যত্র এতো বেশি আজে-বাজে কথা আছে (so much nonsense) যে, কেউ আর বেশিদূর এগুতে পারে না।" রম্যাঁ রলাঁ একজন সাহিত্যিক, একজন ঔপন্যাসিক, কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর স্বজ্ঞা (intuition) আছে, কিন্তু র‍্যনাঁ বা আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে। র‍্যনাঁ (Renan) খ্রিষ্টের গভীরতার পরিমাপের চেষ্টা করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণের জীবন নিয়ে তাই করেছেন। সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিশেবে আকর্ষণীয় হতে পারে। কিন্তু সেটা *অনধিকার চর্চা* কি না

প্রশ্ন হতে পারে।

মনে হয়, রম্যাঁ রলাঁ প্রভাবিত হয়েছিলেন ধনগোপাল মুখার্জির *Face of Silence* (?) পড়ে। কিন্তু দু'জনেরই কথাবার্তা ও কাজকর্ম কেশব সম্পর্কে সরাসরি জানা ছিল না, যা ব্রাহ্মরা জানতেন। কেশবের সহ-প্রচারকদের—শিষ্যদের নয়—সেই সব ইংরেজী লেখার সূত্র থেকে তিনি কেশবের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটির ঐতিহাসিক বিচার করেছেন। মনে হয়, তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের *কেশবের জীবন ও শিক্ষা* পড়েছেন। কিন্তু কেশব সম্পর্কে জেনেছেন রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কথা ও লেখা থেকে। রম্যাঁ রলাঁ লিখেছেন: "কেশব সক্রেটিস ও চৈতন্যের সঙ্গে খ্রিষ্টের অদ্ভুত মেলবন্ধনের (allying) চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনে ও চিন্তায় প্রত্যেককে নিজের অংশ বলে মনে করেছেন। অবশেষে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টীয় ত্রিত্ব (Trinity) বিশ্বাস স্বীকার করেছেন।"[২৯]

ভূমিকায় লেখা হয়েছে, আমেরিকা এবং ইউরোপের স্বার্থান্ধ, ভুল-সংবাদ-পাওয়া ব্যক্তিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অসমীচীন সব মন্তব্য করেছেন, সরাসরি এবং খাঁটি সংবাদ না-পেয়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের বেশির ভাগ লেখাই বাংলায়। এই সব বিদেশী সমালোচকদের উচিত ছিল কলম ধরার আগে বাংলায় লেখা এই সব দলিলগুলো দেখা। যাঁরা স্বার্থান্ধ এবং যাঁরা কিছুই জানেন না কিংবা যাঁরা তথাকথিত ও পরোক্ষ সংবাদ সংগ্রহ করেন সেই গালগল্পবলা-লোকদের কাছ থেকে, যাঁরা হয়কে নয় করেন—তাঁদের উপরে এতোটা বিশ্বাস না-রাখাটাই ভালো ছিল। তাঁদের একজন হচ্ছেন ধনগোপাল মুখার্জি, যিনি এতোদূর পর্যন্ত বলতে পারেন যে, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্রের মুখ থেকে রামকৃষ্ণের কথা শুনে। এমন কথা রামকৃষ্ণপন্থীরাও বলেন না।[৩০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক অভিযোগ করেছেন পরিশিষ্টে (নোট-২) *শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র* নামে প্রকাশকদের পক্ষ থেকে পৃথক প্রবন্ধটি যোগ করায়। তাঁর মতে এটির লেখক স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। তাঁর মতে ভারতীয় প্রকাশক তাঁর যুক্তি খাড়া করেছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) এবং গিরিশচন্দ্র সেনের লেখা থেকে, কিন্তু তাঁরা কেউই কেশবের শিষ্য নন, সহ-প্রচারক (apostles), যাঁরা সত্যের কঠোর

অনুবর্তিতার জন্যে খ্যাত। লেখক লিখেছেন, রলাঁ পরিষ্কার বলেছেন, কেশব রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন না; ভারতীয় প্রকাশক সেকথা মেনেছেন কিন্তু শর্ত যোগ করে: কেশব তথাকথিত আক্ষরিক অর্থে রামকৃষ্ণের শিষ্য নন। কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই শিখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে ধার করেছেন। কার্যত পার্থক্যসূচক ধারণা যা কেশবের নববিধানকে সমৃদ্ধ করেছে তার মূলে আছে রামকৃষ্ণের মৌলিকতা।[৩১]

পরিচ্ছেদের পরিশেষের অনু-শিরোনাম: *রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণের জীবনী*। তাতে রলাঁ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : রম্যাঁ রলাঁ সংগীত ও কলাসমালোচক এবং বেঠোফেন, মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনীলেখক; নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন, তাঁর 'ম্যাগনাম ওপুস' *জ্যাঁ-ক্রিসতফ*; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শান্তিবাদীদের গুরু হয়ে ওঠেন। তাঁর যুদ্ধবিরোধী *Above the Battle* বইটি গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের পর তিনি আমেরিকার মাসিক পত্র *দা সেঞ্চুরি ম্যাগাজিন*-এ ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজীতে (?) গান্ধীর জীবনী লিখতে শুরু করেন। সেই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জীতে বন্ধু ও সহকর্মী লক্ষ্ণৌয়ের সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ ছিল। সে সময়ে অনেকে জানতেন যে, এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখবেন। কিন্তু ১৯২৭ সালে জানা গেল, রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী লিখতে মনস্থ করেছেন। এরই মধ্যে রম্যাঁ রলাঁ *মা ও ছেলে, আনেৎ ও সিলভি* এবং *গ্রীষ্ম* নামে তিন খণ্ডের একটি উপন্যাস লেখেন (Soul Enchanted)। তিনি অনেকগুলো উপন্যাস এবং জীবনী লিখেছেন। ধর্মে তিনি ক্যাথলিক এবং মতবাদে মানবতাবাদী হলেও তাঁর সকল লেখায় গূঢ়বাদের (mysticism) ছোঁয়া আছে, যাকে বিংশ "শতাব্দীর মানবতাবাদী গূঢ়বাদ" বলা চলতে পারে।

এই ধরনের মানুষকে আমাদের *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বন্ধুরা তাঁদের দুই গুরুর জীবনী লিখতে এবং প্রসঙ্গক্রমে গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর র‍্যানেসাঁসের আলোড়নের গতিপ্রকৃতি উল্লেখের জন্যে প্ররোচিত (induced) করেন।* ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায় এবং একজন রামকৃষ্ণপন্থী স্বামীজি তাঁদের গুরু সম্পর্কে তাঁকে কৌতূহলী করে তোলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যাঁরা নববিধানপন্থী (কেশবপন্থী) তাঁরা তখন সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক

অন্তর্কলহে মত্ত।

যখন ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় রম্যাঁ রলাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন, তিনি রলাঁকে কিছু বই পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থপঞ্জী এবং পাদটীকায় তাদের সকলের নাম আছে। তিনি বই না-পাঠালে অন্য আর কেউ পাঠাতই না।

রলাঁর কাজ খুব কঠিন ছিল। তিনি ইংরেজী জানতেন না। তাঁর বোন ইংরেজী জানতেন, বাংলা পড়তে পারতেন। বোনের সাহায্য ছাড়া একাজ তিনি করতেই পারতেন না। "এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, ওই বই দুটিতে, অন্য জীবনীগুলোর চেয়ে আমরা বেশি পাই ব্যক্তি রলাঁকে। এদের মধ্যে রলাঁ নিজেকে বেশি ব্যক্ত করে ফেলেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যদিও এখানে-ওখানে তাঁর প্রতিভার ঝলক চোখে পড়ে, কিন্তু যা লিখেছেন তার সব কিন্তু গ্রহণ করা যায় না, যেমনটি গ্রহণ করা যায় না, স্যর অলিভার লজ এমন বিষয়ে যা-কিছু লিখবেন তার সব কিছু। কারণ, স্যর অলিভারের বিশেষ বিদ্যা হচ্ছে পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব বা ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মতামত সমান সত্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়। সমালোচনার প্রথমেই একথা মানতে হবে যে, মঁসিয়্য রলাঁ অনেক দূরের ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমীক্ষণে খুব সফল হতে পারেননি। সোজা কথায় বলা হলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লেখাটা রলাঁর পক্ষে *"অনধিকার চর্চা"*(handling matter not within one's own province)।[৩২]

অবশ্য রলাঁ একথা বলেছেন যে, কেশবের কাহিনী লেখা খুবই কঠিন, তাঁর চরিত্রে দ্বৈততা আছে যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ও বেমানান উপাদানে গঠিত।[৩৩] এটা অতি স্পষ্টই যে, *দুর্ভাগ্যক্রমে রলাঁ কেশব-পন্থী কোনো কারুর সঙ্গেই আলোচনা করেননি।* ১৯২৬ সালের গ্রীষ্মে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমেরিকা থেকে ভারতের পথে যখন ফ্রান্সে ছিলেন, তিনি সুইট্‌জারল্যান্ড গিয়ে রলাঁর সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তা বাতিল হয়। অবশ্য তিনি দেশে ফিরে রলাঁকে লেখেন এবং কিছু বই-পত্র পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রলাঁর দিক থেকে-সব প্রাপ্তির কোনো স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। বিস্মিত হয়ে তিনিও আর এগিয়ে যাননি।

দুঃখের বিষয়, *রলাঁ কেশবের কোনো প্রামাণ্য জীবনী পড়েননি।* তাঁর

সম্পর্কে যা কিছু জেনেছেন তা গৌণ বা স্বার্থান্ধ সূত্র থেকে এবং সেই সূত্রেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লিখেছেন, অথচ, সে সব সূত্র মুখ্য এবং প্রামাণ্য বলেই মনে করেছেন। রামকৃষ্ণপন্থীরা এখন যে কেশবের মহত্ত্ব স্বীকার করতে চান না তা অবতার-তৈরির বাতিকে (craze for the avatar-making) কিংবা কেশবের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা বা তাঁকে ছোটো করার গোপন ষড়যন্ত্রের জন্যে (the secret conspiracy to misrepresent and belittle)

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, *কথামৃত*-কার 'শ্রীম' ছিলেন কেশবের এক তুতো-বোনের স্বামী; বি. মজুমদার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কোনো আত্মীয় নন, কেশবের শ্যালক।[৩৪] নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও কেশবের স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আত্মীয়। এঁরা সকলেই হিন্দু। কেউই কখনো কেশবের অনুগামী নন। এঁরা সকলেই কেশবকে পছন্দ করতেন, কিন্তু কেউই বেশি দূর যাননি, ঘোর সমালোচকও ছিলেন না, আবার অত্যুৎসাহী অনুগামীও ছিলেন না। কিন্তু বি. মজুমদার মন্দিরে এবং কেশবের বাড়িতে (কলুটোলায় লিলি কটেজে) প্রায় নিয়মিতই সভায় যেতেন, তাই অন্যদের চেয়ে তাঁর কথা বেশি নির্ভরযোগ্য। ১৮৭৪ সালে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইউরোপে ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে "সাধনা" শুরু করা, নির্বাচিত ভক্তদের কাছে কেশবের যোগ, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান ব্যাখ্যা—যার মধ্যে থাকত ঈশ্বরের গুণাবলি এবং হিন্দুদের দেব ও দেবীর সঙ্গে তাদের co-relation ইত্যাদি—শোনা সম্ভব হয়নি। রলাঁর কাছে এসবটাই হয়তো অজ্ঞাত থেকেছে। এ সব তথ্য খাঁটি সমালোচক এবং ইতিহাসলেখকদের অবশ্যই বিচার করতে হবে। কেশব সম্পর্কিত অংশটি চূড়ান্ত রূপ দিতে রলাঁ তিন তিন বার লিখেছিলেন। কেশবপন্থীরা বলতে চান রলাঁ যেন শেষ দুই পরিচ্ছেদ নতুন তথ্য এবং গভীর বিবেচনার আলোতে আবার নতুন করে লেখেন।

অবশ্য লেখক একথা স্বীকার করেছেন যে, অনেক অক্ষমতার (disabilities) মধ্যে দিয়ে রলাঁ যে-ভাবে কেশবকে এবং তাঁর কর্মকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তা যে ভারতীয় প্রকাশকদের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, এটাই কেশবপন্থীদের কাছে খুশির ব্যাপার। এদেশের ভাষা না জেনে, বিদেশের—বিশেষ করে উনবিংশ শতকের শেষভাগের বাংলাদেশের

পরিস্থিতির সঙ্গে অপরিচিত থেকেও, রলাঁর পক্ষে কেশবের অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা বাধাগ্রস্ত হয়নি। *মঁসিয়্য রলাঁকে যে নির্ভর করতে হয়েছে ভুল তথ্য, অপব্যাখ্যা, মন-গড়া গাল-গল্পের উপরে তার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা না-করা, বর্ণিত অসম্ভাব্য কাহিনীগুলোকে মার্জনা করা এবং কেশবের অবমূল্যায়ন ক্ষমা করাটা সহজ হয়ে ওঠে।*

রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী লেখার সংবাদ প্রথম থেকেই এদেশের রামকৃষ্ণপন্থী ও কেশবপন্থীদের বিশেষ কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছিল। ১৯২৯ সালে *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ রামকৃষ্ণের জীবনীর দুটি পরিচ্ছেদ বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। তার সঙ্গে জড়িত ছিল দিলীপ রায়ের *প্রবুদ্ধ ভারত*-এর প্রতিবেদন এবং রলাঁর প্রতিবাদ। গ্রন্থপ্রকাশের এক বছরের মধ্যে জি.সি. ব্যানার্জির ইংরেজীতে লেখা প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার বইটি প্রমাণ করে রলাঁর রামকৃষ্ণ-জীবনী কতো দ্রুত এদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

নয়

১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে পাঠানো হলো পুনা জেলে। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত কংগ্রেস নেতাও গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। গোটা ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারি হয়ে গেল। রম্যাঁ রলাঁ আহ্বান জানালেন, বার্ট্রান্ড রাসেল, ফ্রেনার ব্রকওয়ে, লরেন্স হাউসম্যান, হ্যারল্ড ল্যাস্কিদের, গান্ধীজির গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে, যে-অবৈধ এবং নির্মম পন্থায় (illégale et brutale) বড়োলাট দিল্লি-চুক্তির নির্ধারিত বিধি ভঙ্গ করেছেন,—তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ গড়ে তুলতে। রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য লিখলেন: "রক্ষণশীল পার্টির সাম্প্রতিক বিজয়ে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেনের বিশ্বাসঘাতকতায় অতিউত্তেজিত, জরাগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের এই শেষ লাফঝাঁপ (C'est le dernier sursaut.)।"[১]

সামরিক আইন জারি সত্ত্বেও মহাদেব দেশাইয়ের কাছ থেকে, তিনি গ্রেপ্তার হলে, অন্যদের কাছ থেকে রলাঁ ভারতের খবর নিয়মিত পাচ্ছিলেন। সেলার এ্যাডিসন (Celar Addison) নামে এক ইংরেজ রলাঁকে ভারতের পক্ষে ইউরোপের জনমত জাগিয়ে তোলার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। রলাঁ দুঃখ করে মন্তব্য লিখলেন: "কোথায় ওয়েলস ও বার্ণাড শ'র কণ্ঠস্বর? আহা, ই. ডি. মরেলের মৃত্যু কী শূন্যতাই না সৃষ্টি করেছে!" তিনি নিজে *ভারতবর্ষের সংবাদ* (Courrier de l'Inde) নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রথমেই লিখলেন: *ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের যুদ্ধঘোষণা* (২৫ জানুয়ারি)[২], *রাজা আটকেছেন* (২৫ ফেব্রুয়ারি)[৩], *বিপ্লব—অদৃশ্য নেতা* (২০ এপ্রিল)[৪]।

রলাঁর মন জুড়ে আছে গান্ধী ও ভারতবর্ষ। এই সময়ে রলাঁর কাছে এলেন সস্ত্রীক এদমঁ প্রিভা (৩ মার্চ ১৯৩২)। তাঁরা এসেছিলেন ভারত সফরে। বোম্বাইতে নেমে গান্ধীজির গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী ঘটনাবলি নিজেদের চোখে দেখেছেন; গান্ধী-আশ্রমে গিয়ে থেকেছেন; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছেন; বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সবকিছু জেনেছেন। তাঁরা দু'মাস ধরে সর্বত্র ঘুরেছেন। জনতার উপরে পুলিশের লাঠিচার্জ,— সত্যগ্রহীদের দেহে লোহা-বাঁধানো লাঠির আঘাতের প্রচন্ড শব্দ তখনো যেন

তাঁদের কানে বাজছিল। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একেবারে খেপে গেছেন (qui est exaspéré)। তাঁর আর কিছুই রাখঢাক নেই। *তাঁর বিদ্রোহ প্রচণ্ডতায় গান্ধীবাদীদেরও ছাড়িয়ে যায়*। তিনি আর ইংরেজ নাগরিক থাকতে চান না (Il ne veut pas rester citoyen anglais.) এবং প্রিভাকে অনুরোধ করেছেন এক্ষুনি যেন তিনি ব্যবস্থা করেন (faire sur le champ) যাতে তিনি সুইস নাগরিক হতে পারেন।[৫]

প্রিভারা বেলুড়ে রামকৃষ্ণমিশনে বৃদ্ধ শিবানন্দকে দেখেছেন। তিনি নড়তে-চড়তে পারেন না, কথা প্রায় বলেনই না। কিন্তু প্রিভাদের কাছ থেকে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সুখবর পেলেন তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মারফতে তিনি রলাঁকে নমস্কার জানিয়েছেন। প্রিভাদের বিস্তৃত বিবরণ শুনতে শুনতে বিস্মিত রলাঁ দিনপঞ্জীতে লিখলেন: "(ভারতে) সর্বত্র লোকে আমাকে জানে, আমাকে ভালোবাসে। যা আশ্চর্য তা এই-যে, গান্ধী সম্পর্কিত আমার বইটির চেয়ে লোকে আমার রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বইগুলোই বেশি উল্লেখ করে।"[৬]

পরের মাসেই (১৭ এপ্রিল) রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জেনিভার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শ্রমিক প্রতিনিধি ও স্বরাজ্য-পার্টির তরুণ নেতা দেওয়ান চমনলাল, মালিক প্রতিনিধি সম্মুখম চেট্টি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক ব্যুরোর দিল্লির সেক্রেটারি ডাঃ পিল্লাই। তাঁদের সঙ্গে জেনিভার অধিবাসী সস্ত্রীক মিঃ রাও। তাঁরা জানালেন, তাঁরা এসেছেন: তাঁরই কাছে তীর্থযাত্রায় (faire une pèlerinage), যিনি ইউরোপে ভারতীয় স্বার্থের মিশনারি। তাঁদের সকলের হাতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও অন্যান্য বিখ্যাত মানুষদের জীবনী।

কেবল ভারতবর্ষেই নয়, রলাঁ তখন ইউরোপ তথা সমগ্র জগতের সংকট— যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিপদ নিয়ে চিন্তিত। ১৯৩২ সালেই তিনি আঁরি বারবুসের সঙ্গে *বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের ফ্রন্ট* গঠনের আহ্বান জানান: তাঁদের রণধ্বনি ছিল: *আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই*। *পিতৃভূমি বিপন্ন*।[৭] অগাস্ট মাসের ২৭-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমস্টারডামে মহাসম্মেলন। সেখান থেকে ডাক দেওয়া হয় সমস্ত যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলোকে সম্মিলিত হবার। এই সম্মেলনের ফলেই সমস্ত যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলো একত্র হয়

এবং *আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কমিটি*-র জন্ম হয়, যার সভাপতি হন স্বয়ং রলাঁ।[৮] সেই মাসেই রলাঁ পেয়েছিলেন এক বিস্ময়কর চিঠি।(২০ অগাস্ট নাগাদ।)

সত্যিই অতি বিস্ময়কর এক চিঠি। সেটি লিখেছেন বেলজিয়ামের সেই দ্যনিজ এস. গিজো নামে নার্সটি, ১৯৩০ সালে রামকৃষ্ণের জীবনী পড়ে মনের আবেগে, যিনি রলাঁকে অনুরোধ করেছিলেন রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে। যোগাযোগ ঘটলে স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তিনি রলাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন (৩১ মে ১৯৩১)। তার পরের বছরই আবার এই চিঠি। চিঠিতে শুধু নামের আদ্যক্ষর ছিল D.S. G., রলাঁ ভেবেছিলেন হয়তো Deo Soli Gloria কথাগুলোর আদ্যাক্ষর। রলাঁর লিখেছেন: "এই বিস্ময়কর চিঠিটি লিখে রাখতেই হবে যুগের নৈতিক দলিল হিশেবে (document moral du temps)। চিঠিটি দেখিয়ে দিচ্ছে, *প্রবল প্রবাহের কালে, কেমন করে সকল পথই রোমে, অর্থাৎ আজকের দিনে মস্কোয় গিয়ে পৌঁছোয়*। স্রোতের তোড়ে ভেসে-যাওয়া মন নিজেকে বোঝায় যে, যা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে তা সে-ই বাছাই করে নিয়েছে, আর ভেসে-থাকার জন্যে যে-কোনো পন্থা আঁকড়ে ধরে (fait flèche de tout bois)।........দ্যনিজ এস. গিজোর চিঠিটি দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য:

> ....একবছরের কিছু আগে, আমার পূর্ব-ইতিহাসের কোনো জিনিশ মহদেবীর দীক্ষিতা (l'initiée de Grande Déesse) ও শিবানন্দের শিষ্যা হবার সেই অদ্ভুত ভবিতব্যের প্রতি আমাকে অনুরক্ত করে থাকতে পারে, আপনারই অনুরোধে, আমি তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার চিঠিটা অত্যন্ত খারাপ লেখা হয়েছিল, কারণ তখন আমি মানসিক ও শারীরিক এক গভীর ধকলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিন মাসের অসুস্থতার পর তার জের মিটেছিল।
>
> এই চিঠির শেষে আমি আপনাকে লিখেছিলাম: "সব কিছুই আমার করার রইল।" *তখন আমি দেখতে পাইনি যে, আমার জন্যে শান্তি এতো কাছে, দেখতেও পাইনি, আমার ভবিতব্য কী হবে এবং যা আমার একমাত্র বাসনা—সত্তার (Réalité) সঙ্গে সেই মিলন কোন*

রূপের (quelle forme) মধ্যে উপলব্ধি করব। আর সেই মিলনে পৌঁছুবার জন্যে ও আমার পথ বেছে নেবার জন্যেই সবার আগে প্রয়োজন হয়েছিল,—রুচি, অরুচি, ছোটোখাটো সমস্ত খেয়াল-খুশি—যারা প্রকৃত বস্তু থেকে আমার কাছে স্বচ্ছদৃষ্টিকে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের সঙ্গে আমার "আমির (mon moi) প্রতিরোধকে জয় করার। আর সেই জন্যেই—আন্তর নিয়মানুবর্তিতার কর্মে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—আমার দীক্ষা গ্রহণের প্রথম বছরটি ছিল এক নিদারুণ সংগ্রামের পথ, তা আমাকে দৈহিক ভাবে বিধ্বস্ত করেছিল, কিন্তু আমাকে জয় এনে দিয়েছিল। *আমার আন্তর-প্রতিরোধের অবসান হয়েছিল*, আমার ও বাস্তব সত্তার মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল।

তখন, আমার বৃত্তির (vocation) স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করেছিলাম, এবং এইটেই দেখেছিলাম: দশ বছরেরও বেশি আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা, আমার ধ্যান, আমার অনুসন্ধান, আমার সংগ্রাম আমার বিশ বছরের বিশ্বাসে সোজাসুজি পৌঁছে দিয়েছিল;—এই সেই বিশ্বাস, যাকে তখনও পর্যন্ত অজানা সমস্ত কিছুর সামনে সন্দেহ করেছি, কিন্তু যাকে পুরোপুরি পরিত্যগ করিনি,—সেই বিশ্বাসটি হচ্ছে: *কম্যুনিজম*।

কম্যুনিজমের মধ্যে—আমি শুধু "ধর্মকে", আমাদের "যুগের" নিয়মকে দেখিনি,—বিশ্বজনীন শৃঙ্খলার সম্পূর্ণীকরণকে, ঐক্যের উপলব্ধির একমাত্র বুনিয়াদকে দেখেছি এবং সবার উপরে, এর মধ্যে আমি দেখেছি মহা-জাগতিক শক্তির ধ্বংস ও সৃষ্টির (dans son double aspect destructeur et créateur) বিপুল অভিব্যক্তি (la manifestation grandiose)। মুহূর্তের জন্যে আমি ইতস্তত করেছিলাম: হিন্দু গোঁড়ামি থেকে মার্ক্সীয় গোঁড়ামিতে ঝাঁপ-দেওয়াটা একটা বড়ো ঝাঁপ।—কিন্তু তা কি ভিন্ন রূপে, অনন্য সত্তার (l' Unique Réalité) একই অনুসন্ধান ও একই স্বীকৃতি নয়? জগতে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে সত্তার কাজে লাগার জন্যে সত্তার ক্ষয়িষ্ণু অতীতের রূপগুলোকে কি পরিত্যাগ করব না? আর যতো অদ্ভুতই ঠেকুক না কেন, এইভাবেই বলশেভিজমের মধ্যে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ ও উপলব্ধিকে খুঁজে পেয়েছি। আর এই একই ভাবে

আমি খুঁজে পেয়েছি শান্তি ও আনন্দ, সত্তার সঙ্গে সংযোগের, বিশ্বজনীন জীবনে আমার "আমিকে" আত্মীভূত- করণের বিপুল আনন্দ। এখন আমার সব সন্দেহ, আমার সব উদ্বেগ চিরকালের জন্যে মিটে গেছে। আমার জীবনের, আমার "আমির" কোনোই গুরুত্ব নেই। আমি সর্বহারার বিপ্লবের সেই বিশাল আন্দোলনের শুধু একটি অণু, যার নেতৃত্বে রয়েছে লেনিনের পার্টি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমার বর্তমান বিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো প্রভাব ফেলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। জ্ঞান অথবা ভক্তির ধ্যানের ব্যক্তিগত সুখ থেকে,—নিজের জন্যে সমস্ত অনুসন্ধান থেকে—তিনিই আমাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমি স্থূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন, জনগণের সেবাই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, একমাত্র ভক্তি, যার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এইভাবেই তিনি আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন অন্য একজনের কাছে, যাকে এই জীবনে গুরু বলে মানতে পারি,—"যিনি" আমাদের মহান নেতা,"—স্তালিন।

আপনি নিঃসন্দেহে ভাবছেন যে, আমার সেই ধর্মীয় প্রত্যয়গুলোর কী হলো। বলতে কি, সেখানেও আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমি শুধু তাঁরই শিক্ষাকে অনুসরণ করেছি। "অভিজ্ঞতা-লব্ধ না-হলে কোনো কিছুই বিশ্বাস করা উচিত নয়"—এই কথাটাই কি তিনি নিরন্তর বলে চলেননি? যতো দিন না ধর্মীয় শিক্ষা মানবসাধারণের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রদর্শনযোগ্য হবে, এই অন্ধ বিশ্বাস (cette foi aveugle), যা কারুর কারুর ক্ষেত্রে পীড়নের একটি অস্ত্র,—জনগণের পক্ষে কুসংস্কার, আফিং, তার পরিবর্তে জনগণের পক্ষে নাস্তিকতা কি ততোদিন তুলনামূলক ভাবে বাঞ্ছনীয় নয় (préférable)? যদি এইসব জিনিশের একই সত্তা থাকে, তা হলে একদিন নিশ্চয়ই সকলের দ্বারা তা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হবে। কিন্তু আমার পক্ষে, ধর্মের ক্ষেত্রে একমাত্র জিনিশ অপরিহার্য, তা হচ্ছে এক অনন্য সত্তায় বিশ্বাস—চেতনা ও মহাজাগতিক শক্তি—এবং সেই ঐক্যের সঙ্গে সচেতন মিলনের অনুসন্ধান (প্রকৃতপক্ষে

সেই মিলন—বরং সেই তাদাত্ম্য, চিরকালই আছে)।—কিন্তু কোনো ধর্ম, কোনো রহস্যবাদের চেয়ে বলশেভিকদের মহৎ সামাজিক কর্মের মধ্যেই আর এইটেই আমি ভালো উপলব্ধি করেছি।

আর অন্য সব—আত্মার অমরত্ব, আবার দেহধারণ, অলৌকিক অবস্থা ও ক্ষমতা এরা সবই প্রকল্প (hypothèses), এখনো প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়নি,—একদিন হবে,—কিন্তু তাদের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব, আমার একমাত্র ধর্ম—ঐক্যের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে না, কিছুমাত্র আঘাত করে না।

এই ভেবে আমি আপনাকে লিখছি যে, এক দিকে শাক্তদীক্ষার আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা,—অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব—কোন কার্যকর সিদ্ধান্তে আমাকে চালিত করেছে, তা দেখার জন্যে এ আপনার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ যুগের সঙ্গে ও বর্তমান সমস্যাগুলোর সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাকে খাপ খাওয়াতে নিজেকে খাঁটিভাবে বাধ্য করেই আমি আমার পুরোনো কমরেডদের সঙ্গে মিলেছি। *আর তাছাড়া, শ্রমিকশ্রেণী কি মানবতার সমস্ত মহৎ স্বপ্নের সত্যিকারের উত্তরাধিকারী নয়?—অত্যন্ত সৌহার্দের সঙ্গে, ডি. এস. জি.*[১]

আবার রলাঁ গভীর ভাবে বিচলিত হলেন, পৃথক নির্বাচন প্রত্যাহার করার দাবিতে গান্ধীজির আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তে। অনশন শুরু হয়েছিল ২০ সেপ্টেম্বরের পর। গান্ধীজির অনশনে ইউরোপের আদর্শবাদীদের (idèalistes) নির্বোধ ঔদাসীন্যে (la sotte indifférence) তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। গান্ধীজিকে সাহায্য করতে কেউ আঙুল নাড়াননি। কোয়েকাররা চব্বিশ ঘন্টার হাস্যকর অনশন করেই কর্তব্য শেষ করেছেন। লন্ডনে সক্রিয় একমাত্র এন্ড্রুজ। শ্রীমতী কাজিন্স (এক ইংরেজ থিওসফিস্ট) ৬ অক্টোবর ভারতবর্ষের জন্যে জেনিভায় আন্তর্জাতিক দিবসের আয়োজন করেছেন। তাতে অংশগ্রহণের জন্যে কোনো ফরাসীকে পাওয়া যায়নি। সবাই এড়িয়ে গেছেন, এমন কি অ্যালবের্ট শ্‌ৎসোহ্বাইৎসার (Albert Schweitzer) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (যদিও ভিন্ন কারণে)। অবশেষে রলাঁর দুশ্চিন্তা গেল,

সংকট-মুহূর্তে এন্ড্রুজের টেলিগ্রাম এলো, গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেছেন। রলাঁ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ৬ অক্টোবর জেনিভায় আয়োজিত শ্রীমতী কাজিন্সের আন্তর্জাতিক ভারত দিবসে রলাঁ বাণী পাঠালেন, "ভারতবর্ষের খ্রিষ্ট" শিরোনামে, যার পরিসমাপ্তি—এই সাবধান বাণীতে: "সক্রিয় হতে হবে। এই দূষিত সমাজকে বদলাতেই হবে, এ টিকে আছে একমাত্র অবিচারের জোরে। সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা, দুই পথই চাইছে নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করতে: হিংসা ও অহিংসা। দুটোই বিপ্লবী। বেছে নিন।"[১০]—এই বাণী পাঠাবার দু'দিন পরে রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন রামকৃষ্ণমিশনের স্বামী বিজয়ানন্দ। বলা বাহুল্য এই প্রথম রামকৃষ্ণমিশনের কোনো স্বামীজির সঙ্গে রলাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয়।

স্বামী বিজয়ানন্দ এসেছিলেন সুইট্জারল্যান্ডের ব্রিসাগো থেকে। তিনি কয়েক সপ্তাহ ছিলেন জার্মানিতে, সেখানে যোগের কিছু উপদেশ দিয়েছেন, এখন চলেছেন আর্জেনটিনার বুয়েনোস এয়ার্সে এক বছরের জন্যে যোগশিক্ষার একটা ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম নিয়ে। রলাঁর কাছে এসেছেন শিবানন্দের নমস্কার নিয়ে। বিজয়ানন্দ ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের স্নেহধন্য। দেখতে তিনি নাকি বিবেকানন্দের মতো ছিলেন। ভারত থেকে ইউরোপে যাবার সময় তাঁকে স্ট্রাট-ফোর্ড-অন-আভনে[১১] নিয়ে আসার জন্যে মিস ম্যাকলাউড জার্মান নৃত্যশিল্পী মার্গারিটা ভালমানকে পাঠিয়েছিলেন ভেনিসে। শ্রীমতী ভালমান বিজয়ানন্দকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন।[১২]

রামকৃষ্ণের তৃতীয় প্রজন্ম সম্পর্কে জানতে রলাঁর খুবই কৌতূহল ছিল। কিন্তু বিজয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতে, আলাপচারিতে তিনি বিস্মিত, ব্যথিত, এমনকি ক্রুদ্ধও হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ রলাঁর প্রত্যাশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।[১৩]

কোনোরকম রাখঢাক না-করে স্পষ্ট ভাষায় রলাঁ তাঁর সম্পর্কে একেবারে প্রথমেই লিখেছেন:

> তিনি আমার মনে ভালো ছাপ ফেলতে পারলেন না। মানুষটি তরুণ, ৩৫ বছর বয়স, অত্যন্ত বাদামি রং, গাঁট্টাগোট্টা, প্রাণবন্ত, ধারালো (tranchant), অসহিষ্ণু, রগচটা (colérique); বিরোধীকে চূর্ণ করতে টেবিলের উপরে ঘুষি মারেন; যুক্তির বদলে অযৌক্তিক তুলনা ও

বড়োই স্থূল ও গতানুগতিক চিত্রকল্প দিয়ে খুশী থাকেন; খুশির সঙ্গেই আবার ফিরে আসেন, তাঁর সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সেই সব ব্যঙ্গ-ভরে অনুকরণ-করা অঙ্গভঙ্গি; তিনি জাহির করেন, তিনি নস্যাৎ করেন, বিশেষ করে নস্যাৎ করেন উদ্ধত ভাবে; তিনি গর্বিত নিশ্চিন্ততায় আত্মহারা যে, তিনি ও তাঁদের লোকজন—বিশেষ করে তিনিই—সত্যের মালিক হয়েছেন (lui et les siens—lui surtout—possèdent la vèrité)। বৃষস্কন্ধ, অতিপুষ্ট, অত্যন্ত আত্মসন্তুষ্ট, সংকীর্ণ ও রুদ্ধচিত্ত, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতি-সচেতন মফঃস্বলের পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে। এই অতি-পরিচিত টাইপটার আমাদের জন্যে ইউরোপে আসার কোনো মানেই হয় না। আর এইসব গর্বোদ্ধত ও চন্ডপ্রকৃতির লোক দিয়ে যদি তাঁর শিষ্যদের দ্বিতীয় পুরুষ গড়ে ওঠে তবে বৃথাই রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন (et Ramakrishna a vecu en vain)।

স্বামী বিজয়ানন্দের সঙ্গে আলাপচারিতে রলাঁ যে-কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, সম্ভবত জীবনে কোনো অতিথির প্রতি কখনো করার কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল দুটি ব্যাপারে। প্রথমটি, বিজয়ানন্দের (নিজের মধ্যে একাত্মতার) উপলব্ধির (Rèalisation) অহং-সর্বস্ব মোহ সম্পর্কে, যা তাঁকে সমস্ত সামাজিক কর্ম থেকে (devoir social)রেহাই দিয়েছে, অথবা এই সব কর্তব্যকে তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তির ব্যর্থ তৃপ্তির (sa vaine satisfaction du salut personel) চেয়ে হীনতর করে দিয়েছে। রলাঁ ধিক্‌কার দিয়ে মন্তব্য করেছেন: "*যে-শিষ্যরা গুরুদের বাণী বিষাক্ত করে তোলে, তাদেরই এই দঙ্গল সমাজসেবার (sercvice social) সেই আবেগকে হাস্যাস্পদ করে তোলার উপক্রম করেছে, যে-আবেগ বিবেকানন্দকে পুড়িয়ে মারত (qui brulait Vivekananda)*।

রলাঁর এই ধিক্‌কারের উত্তরে,—"খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যেসব অসৎ পাদ্রী (*comme les mauvais prêtres qui trahissent le Christ*),"—তাদের মতোই বিজয়ানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন: "হ্যাঁ, তিনিই—স্বামীজিই (বিবেকানন্দ) সমাজসেবায় নামতে পারেন, কারণ তিনি ছিলেন তিনিই,—কারণ তিনি ছিলেন অভেদের উপলব্ধি। কিন্তু মূলত সেটাই

আসল। আর তা সবকিছুকে অব্যাহতি দেয় (Et elle depense du reste.)। সেটাই যথেষ্ট সামাজিক কর্ম; কোনো কিছু না-করে যিনি "নিজেকে উপলব্ধি (se réaliser) করেন, তাই দিয়েই জগতের উপরে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রিয়া করেন।"—এই হিং টিং ছট-উত্তরে রলাঁ তিক্ত মন্তব্য করেছেন: "ছদ্ম-এলিট-ধর্মীয় অহংতা (égoisme d'une pseudo-èlite religieuse) এবং জগতের দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন আমাদের পাশ্চাত্যের নন্দনতত্ত্ববিদদের মধ্যে বেশি পার্থক্য দেখি না। এঁরা যে একই রকম সুবিধাভোগী এবং অত্যাচারিত শ্রেণীদের (des exploiteurs des classes opprimées) ভাঙিয়ে খান, এমন তীব্রভাবে আমি আর কখনো অনুভব করিনি।"

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারে আতিথেয়তার কর্তব্য ও সৌজন্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কঠোরতম ভাষায় রলাঁ স্বামী বিজয়ানন্দকে এমন ভর্ৎসনা করেছিলেন যে তিনি একেবারে হতচকিত ও স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলে, এক প্রচন্ড অবজ্ঞায়, এক অপমানকর আনন্দে (avec un mepris violent, un plaisir à outrager) বিজয়ানন্দ বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ করে বলতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আলাপচারিতে সদ্য সদ্য কালিদাস নাগ-এদর্মঁ প্রিভাদের মুখে-শোনা তাঁর প্রতি দেশবাসীর নিদারুণ অবিচার, ছোটো মেয়ের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতায় গভীর বেদনা, তাঁর ব্যক্তিগত শোক,[১৪] নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাবোধের কথা স্বভাবতই উঠে পড়েছিল। কিন্তু এই মহান জীবনের, তাঁর নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা অবজ্ঞাভরে—প্রায় ঘৃণাভরে (dédaigneusement—presque haineusement) হেসে উঠে বিজয়ানন্দ বলেছিলেন: "তিনি যন্ত্রণাবোধ করতে পারেন না। যন্ত্রণা কী তা তিনি জানেনই না।" বিজয়ানন্দের উক্তিটির উদ্ধৃতির পরই রলাঁ বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য করেছেন: ("যন্ত্রণা কী তা জানেন ওই ঔদরিক, ধূমপায়ী, অহংসর্বস্ব ও আত্মসন্তুষ্ট তরুণ সাধু বাবাজিটি?") এবং রলাঁ তাঁকে বললেন: "অন্যের যন্ত্রণা বিচার করার অধিকার কারুর নেই, কেউ তা পারে না। একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন। আপনি তরুণ। আপনি কঠোর, আপনার মনের দরজা বন্ধ।"—ভ্যাবাচাকা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে বিজয়ানন্দ থেমে গেলেন।

রলাঁ লিখেছেন: "কিন্তু কিছুই তাঁকে পালটাতে পারবে না।"—তিনি

সামান্যই পড়াশোনা করেছেন। তিনি যে-বিজ্ঞান পড়েছিলেন তাঁর মধ্যে তার অভাব দেখলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সম্প্রদায়ে ঢোকার সময়ে বিজ্ঞান পড়তেন। পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা চলবে না—শিবানন্দের স্পষ্ট নির্দেশে তিনি একটা বেছে নিয়েছেন এবং তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। "একমাত্র পূর্ণ সত্যের তিনিই মালিক (Il possède verité unique, entière.)।" যে- পণ্ডিতজনেরা সত্যকে খুঁজতে জীবনপাত করছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর এক পিঠ-চাপড়ানো অবজ্ঞা। তাঁদের নম্রতার মহিমা ও আত্মত্যাগের সেই মানবিকতা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।.......কেবলই রসিয়ে রসিয়ে রামকৃষ্ণের নাম দিয়ে বারবার কী একটা ভোঁতা রসিকতা করছিলেন (প্রথম দিকে দম্ভ ছিল না): নাক-ধরার দুটো পন্থা আছে; একটা সোজাসুজি, অন্যটা মাথার পেছন দিয়ে হাত ঘুরিয়ে অন্য দিক দিয়ে নাক-ধরা। মানুষের সমস্ত অনুসন্ধান, বিজ্ঞানের বিপুল প্রচেষ্টা—*সব কিছুই তাঁর কাছে এই হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নয়। ....ইউরোপীয় মনের মহিমা সম্পর্কে এবং তার মধ্যে দিব্য যে অন্য কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন, সে সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা নেই*। লাকসিয়ঁ ফ্রঁসেইজ-এর (L'Action Fransaise) এক গির্জা-প্রেমিকের মতোই তিনি সংকীর্ণচিত্ত। পরিবর্তন করেও লাভ নেই।.....ভারতবর্ষ যদি জয়লাভ করে, তাহলে ইউরোপ হাড়ে হাড়ে টের পাবে। চোখের বদলে চোখ! রাজনীতি-সম্পর্কে আপাত ঔদাসীন্যের নীচে লুকানো থাকে মনের গভীরে বাসাবাঁধা এক জাতীয়তাবাদ।

কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমন শ্রদ্ধা রামকৃষ্ণপন্থীরাও করে থাকেন। কিন্তু স্বামী বিজয়ানন্দ বললেন: "তার কারণ তিনি সর্বস্ব ত্যাগের অবতার, (perce qu'il incarne le Renoncement) আর সর্বস্ব ত্যাগই ভারতবর্ষের মর্মকথা।"—রলাঁ লিখেছেন, যাই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে এ গর্বোদ্ধত বিজয়ানন্দের মর্মকথা নয়। মধ্যযুগে ইউরোপের জনগণকে যারা পীড়ন করত, সেই মঠধারী সম্প্রদায়দের অনুরূপ ঘটনার পরিণামের দিকেই এ না ঠেলে নিয়ে যায়, এটাই রলাঁর ভয়! মুক্তির কোনো মন্ত্রই বাঁচাতে পারে না। সবচেয়ে পুরোপুরি "আগ্রহহীনতার" (désintéressement) আধিপত্যের জন্যে স্বৈরাচার ও অহংতা চিরকালই নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে চলবে। রলাঁ লিখেছেন:

আর গুরুরাও যেন তাঁদের কথাবার্তা সাবধানে বলেন। যে খেয়াল-খুশির উক্তির মধ্যে গভীর সত্যের শস্যকণা থাকে, তাকে প্রায়ই গ্রহণ করা হয় শস্যকণা ছাড়াই খড়ের গাদা বলে, সে-খড়ের গাদা বিপজ্জনক, কখনো কখনো মারাত্মক। একদিন শিবানন্দ বলেছিলেন: "আমি সব ক্ষমা করতে পারি। যে খুন করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। যে গণহত্যা করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। যে ধর্ষণ করে তাকে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যে মিথ্যা কথা বলে তাকে ক্ষমা করতে পারি না। কারণ, মিথ্যা হচ্ছে আত্মার মৃত্যু (la mort de l'âme)।"—এবং আমি এটা বুঝতে পারি। আমিও এই রকমই ভাবি। কিন্তু যে-তরুণ সাধু শোনেন, আমার ভয় হয়, তাঁর মিথ্যার অ-ক্ষমার চেয়ে অন্যান্য অপরাধের বিপজ্জনক ক্ষমাগুলোই না ভালো করে আঁকড়ে থাকেন।

বিদায় নেবার সময় স্বামী বিজয়ানন্দ একটু লজ্জিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে রলাঁকে তিনি "জ্ঞানালোক" দিতে পারেননি। যা কিছু বলে থাকবেন, তার জন্যে ক্ষমা চাইলেন। রলাঁ মন্তব্য করেছেন: "কিন্তু *কালই তিনি আবার শুরু করবেন*।"

স্বামী বিজয়ানন্দ রলাঁকে বলে গেলেন, রামকৃষ্ণের অনেক প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা এখনো বেঁচে আছেন, যদিও গতবছর তাঁর মুখ্য জীবনীকার অন্যতম মুখ্য দ্রষ্টার মৃত্যু হয়েছে।[১৫] কিন্তু প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের মহান গোষ্ঠী শিবানন্দের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে......রামকৃষ্ণের বেশির ভাগ শিষ্যের মতোই শিবানন্দ স্বতঃস্ফূর্ততা ও এক শিশুজনোচিত প্রফুল্লতা বজায় রেখেছেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের উপরে তাঁর জোরালো কর্তৃত্ব নেই, যে কর্তৃত্ব ছিল তাঁর পূর্বসূরী ও সঙ্গী ব্রহ্মানন্দের, বিজয়ানন্দ যাঁর শিষ্য; এবং তিনিই তাঁকে মৃত্যুকালে মনোনীত করে গেছেন।

বন্ধনীর মধ্যে রলাঁর উদ্ধৃতি: ("*হে ভ্রাত, এই সন্তানদের তোমার হস্তেই সমর্পণ করিতেছি*।)[১৬]

দশ

১৯৩২ সালটি রলাঁর বড়োই দুশ্চিন্তায় কেটেছিল। সেপ্টেম্বরে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করার পর, অস্পৃশ্যদের মন্দিরে ঢোকার অধিকারের জন্যে আবার অনশনের প্রস্তাব করেছিলেন। রলাঁ তার করে তাঁকে অনশন করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর মতে, একটা গৌণ ব্যাপারের জন্যে অক্টোবরের "বীরোচিত কর্মের" পুনরাবৃত্তিতে ইউরোপের মতামত আগের মতো অনুকূল হবে না। তাছাড়া তাঁর আশঙ্কা ছিল, এবারে এটা হবে তাঁর মৃত্যু, ভেঙে-পড়া স্বাস্থ্যে আর কুলোবে না।[১] তারের পর ৬ জানুয়ারি রলাঁর বোন মাদলেন পেলেন জারবেদা কেন্দ্রীয় জেল থেকে গান্ধীর হাতে লেখা তাঁর চিঠির উত্তর। মাদলেন গান্ধীজিকে চিঠি লিখেছিলেন ভিলন্যভে গান্ধীর আগমন ও তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। অস্পৃশ্যদের অধিকারের দাবির যাথার্থ্য ব্যাখ্যা করার পর, এই চিঠিতেই গান্ধীজি রলাঁকে *ঋষি* বলে ডাকবার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষে (sous réserve de son approbation et de la vôtre); এবং সেই চিঠিতেই লিখেছিলেন: "এই প্রথম তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বইগুলো পড়লাম। পড়ে বিপুল আনন্দ পেলাম এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা যে কতোখানি তা আগের চেয়ে আরও পরিপূর্ণ ভাবে পরিমাপ করতে পারলাম।"[২]

জেলখানায় অনশন ও অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যেও গান্ধীজির পড়াশোনার তালিকায় যে রম্যাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী থাকবে তাতে এ সময়ে অবাক হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। রামকৃষ্ণ-পন্থী ও ব্রাহ্মদের মহল ছাড়াও বইগুলো রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তার একটি বড়ো দৃষ্টান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই চিঠিটি। বক্সা বন্দীশালায় আটক প্রিয় ছাত্র গোপাল হালদারকে তিনি লিখছেন (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩): "আপনি Romain Rolland-এর রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী পড়িয়াছেন? অতি অপূর্ব বই, যদি বলেন তো পাঠাইয়া দিই। Rolland র বিবেকানন্দের জীবনী আরও সুন্দর বই, আমি ঐ বই এখনো পড়ি নাই, তবে সজনী ঐ বইয়ে, এখন মসগুল হইয়া আছে।"[৩]

রম্যাঁ রলাঁর *সংগ্রামের পনেরোটি বছর* (Quinz Ans de Combat) নামে বইটিতে ১৯৩৩ সালটি ছিল বছরগুলোর শীর্ষবিন্দু। এই সালেই হিটলার ও জার্মান ফ্যাসিবাদের ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এবং সক্রিয় সামাজিক কর্মে রলাঁর আধ্যাত্মিক শৈল্পিক দায়বদ্ধতা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রণাঙ্গনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি কেবল গান্ধীর পরিচালনায় ভারতের সম্পর্কেই নয়, ফরাসী উপনিবেশ ইন্দোচীনের সম্পর্কেও ধিক্কার জানিয়েছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন: *মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি*; ইন্দোচীনে সায়গনের নিপীড়িতদের প্রতি। তিনি লিখেছিলেন: "একটা বিদ্রোহী জাগরণ আজ নিপীড়িতদের জাতিগুলোর মধ্যে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, কেঁপে উঠেছে ধনতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতোরণ।........ যেমন বাংলাদেশে তেমন আনামে, যেমন বাটাভিয়ার তেমন পেশোয়ারে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সামরিক রাজত্ব চলছে। হাজার হাজার লোক বছরের পর বছর ধরে জেলে ও বন্দীশিবিরে পচছে।[৪]

হিটলারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন *হিটলারী ফ্যাসিবাদের* বিরুদ্ধে (২ মার্চ): "আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাদামী-প্লেগ কালো-প্লেগকে ছাড়িয়ে গেছে। যে-প্রভুর পায়ের তলায় বসে এবং যার আদর্শকে সামনে রেখে হিটলারী ফ্যাসিবাদ নিজেকে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেছে সেই ইতালীয় ফ্যাসিবাদ দশ বছরে যতোখানি হিংস্রতার পরিচয় দিতে পারেনি, সে তার বেশি দিয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।" রাইখস্টাগের অগ্নিকান্ড ও ইহুদিদের উপরে সাড়ম্বর পাশবিক নির্যাতন, বুদ্ধিজীবীদের বিতাড়ন, বই-পোড়ানো ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে জার্মানীর নাৎসীবাদ জগতের সামনে নির্লজ্জ নগ্নপদে সোল্লাসে আত্মঘোষণা করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেনি। ২০ মার্চ আবার তিনি আবেদন জানালেন: "এই উন্মাদরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপকে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছে, এমনি কি নাৎ-এর অনুশাসন বাতিলের পেছন দিকে,—সন্ত-বার্তেলেমির জঘন্য দিনগুলোতে।"[৫]

ফ্যাসিবাদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে তাঁর এক জার্মান সোসাল

ডেমোক্রাট বন্ধুকে ধিক্কার দিয়ে রলাঁ লিখেছিলেন (৩১ মার্চ): ''ফ্যাসিবাদের পাশবিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমি ততোটা বিচলিত হইনি, যতোটা হয়েছি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দলগুলোর বিনা শর্তে আত্মসমর্পণে।'' তাঁর বন্ধু লিখেছিলেন: পরাজয় অনিবার্য মনে করাতেই সমাজতন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। রলাঁর মতে: পরাজিত হওয়ার সাহস থাকা চাই, সে পরাজয় অস্ত্রত্যাগ করে নয়, যুদ্ধ পরিহার করে নয়, মার্জনাভিক্ষা বা আপস-আলোচনায় রাজি হয়ে নয়। ''যারা নতুন ইতিহাস গড়বে তাদের সকলের পক্ষে এটাই কর্মের মূলনীতি। ইতিহাস তার সাক্ষী। এক বা একাধিক পরাজয়ের অগ্রিম মূল্য না-দিয়ে কোনো শক্তিশালী সামাজিক বিজয় সম্ভব হয়নি। ১৮৭১ সালের পারী কম্যুন ও ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ না-হলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্ভব হতো না।......এই মহা সংকটের মুহূর্তে দায়িত্ব ত্যাগ করা বা পালিয়ে যাওয়া চলবে না। মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরাজয়, অপ্রতিকার্য একমাত্র পরাজয় আসে শত্রুর কাছ থেকে নয়, নিজের কাছ থেকে।'' রলাঁ একের পর এক প্রতিবাদ লিখে চললেন: *জার্মানিতে ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে* (৫ এপ্রিল); *জাতিবাদ ও ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে* (৯ এপ্রিল); *কোয়েলনিসসে জাইটুং* পত্রিকাকে তিরস্কার করে লেখা পত্র (১৪ মে)। তারপর তিনি লিখলেন *তরুণদের প্রতি* (১৭ মে):

> ফ্যাসিবাদের বিশটা মুখোশ। এ যে-কোনো জাতির রূপধারণ করতে পারে। এখানে রূপ সামরিক বা যাজকতান্ত্রিক; অন্য খানে ধনতন্ত্রী অথবা গণতান্ত্রিক; এমন কি এর মুখবিকৃতিতে সমাজতন্ত্র। সংস্কৃতি অথবা অ-সংস্কৃতির সকল প্রকার বুদ্‌বুদের এ সংক্রমণ ঘটাতে পারে। কিন্তু তার মুখোশ যেমনই হোক, সব সময়েই তার একই অপরিহার্য চরিত্র: সে একটা জাতীয়-রাষ্ট্রবাদ (un étaisme nationaliste)। এ সব কিছুকেই জাতি এবং একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের অধীন করে, সব কিছুকে গ্রাস করতে এবং দাস বানাতে এ তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে।[৮]

রলাঁ উদাত্ত আহ্বান জানালেন: ''ফ্যাসিস্ট শত্রুকে পরাজিত করতেই হবে এবং সর্বপ্রথমে আমাদের দেশে (d' abord chez nous)। স্বস্তিকার বিনা যুদ্ধে জয়লাভের কলঙ্ককাহিনী নিয়ে যারা (ফ্রান্সে) উল্লাসে মেতে উঠেছে, সেইসব উদীয়মান ''ফুর্‌হারদের'' নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে হবে। এই বিষাক্ত

আগাছা কিন্তু, বিপদ ছাড়া, আমাদের চারপাশে বেড়ে উঠতে পারে না। সাবধান, তার বীজ আমাদের আক্রমণ করছে।"

১৯ এপ্রিল জেনিভার জার্মান কনসাল রম্যাঁ রলাঁকে জানালেন যে রাইখ-প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন কলা ও বিজ্ঞানের জন্যে তাঁকে গ্যয়টে পদক দিতে। পরদিনই তিনি উত্তর দিলেন, এই সম্মান প্রদর্শনের আন্তরিকতাকে উপলব্ধি করলেও তিনি তা প্রত্যাখান করছেন।[৭] অবশেষে জুন মাসে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্টবিরোধী কমিটির সভাপতি মনোনীত হলেন রম্যাঁ রলাঁ, যার প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয় পারীর প্লেইয়ালে।

এই জুন মাসেরই একেবারে শেষে, দিলীপকুমার রায় ৩০০ কপি ছাপার নম্বর-দেওয়া মীরার সই করা *শ্রীমার সঙ্গে আলাপচারি* (Entretiens avec la mère) নামে ফরাসীতে লেখা বই পাঠিয়েছিলেন রলাঁকে। তিনি তখন নিয়মিত থাকেন পন্ডিচেরিতে এবং পুরোপুরি অরবিন্দের প্রভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন (s'est livré entier)। রলাঁর মতে: সম্ভবত অরবিন্দের প্রভাবে ততোটা করেননি,—কারণ অরবিন্দ হচ্ছেন "এক গুপ্ত সূর্যের মতো" (comme un soleil caché), তিনি তাঁর ঠিকরানো আলোই শুধু দেখতে দেন—যতোটা করেছেন তাঁর "চন্দ্র" (sa lune) মিরিয়াম, মীরা, "শ্রীমার" প্রভাবে;—"এই চৌকশ, বুদ্ধিমতী মহিলা (très habile femme intelligente) তাঁকে কব্জা করতে এবং চালাতে (s'emparer de lui et le diriger) জানেন।—কার্যত আশ্রম তিনিই চালান।" বইটিতে তিনি এক আশ্চর্য দক্ষতায় অরবিন্দের উপলব্ধিমূলক ও অতীন্দ্রিয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছেন। রলাঁ লিখেছেন: "আমার ধারণা যে, দিলীপকুমারের মধ্যবর্তিতায় তিনি আমাকেও তাঁর সুতোয় গাঁথতে চান (m'accrocher aussi à sa ligne)।"[৮]

ভারত-মনস্কতার পর্বের শুরু থেকেই অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে রম্যাঁ রলাঁর কৌতূহল জেগেছিল, আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু হিশেবে সে কৌতূহল ও শ্রদ্ধা চিরদিনই বজায় ছিল। রলাঁ অরবিন্দের কথা সম্ভবত প্রথম জানেন পল রিশারের *জীবনের ঘটনা* থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২১)। পল রিশার তাঁকে তাঁর জীবনের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। অরবিন্দ ছিলেন তাঁর বন্ধু, পরিচয় হয়েছিল ১৯০৫

সালে। ১৯০৫ সালের বাংলার জাগরণের প্রথম আন্দোলনের একজন নেতা অরবিন্দ আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ছিলেন ফরাসী অধীনের পন্ডিচেরিতে। ১৯১৪ সালে পল রিশার সস্ত্রীক পন্ডিচেরিতে এসেছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে কিছু দিন থাকতে। অরবিন্দের মাসিক পত্রিকা *লারিয়-র* (l'Arya) ইংরেজী ও ফরাসীতে প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রিশার যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হলেও, স্বাস্থ্যের কারণে দু দু'বার বাতিল হয়ে যান। এশিয়ায় ফিরে এসে জাপানে এশিয়ার নতুন সভ্যতা সম্পর্কে প্রচার করেন এবং *দা এশিয়ান রিভিউ* প্রতিষ্ঠা করেন। চার বছর পরে তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে, চীনে যাবার অপেক্ষায়। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই তাঁকে যেতে হলো এক প্রচন্ড সংকটের মধ্যে দিয়ে (il passa par une crise violente)। রলাঁ টীকায় এই প্রচন্ড সংকটের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "আসলে, তাঁর স্ত্রী মিরিয়াম, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই ইহুদি মহিলা *তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী অরবিন্দ ঘোষকে বিয়ে করার জন্যে* (pour epouser)।" রিশারই লিখেছিলেন, অরবিন্দ এখন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার স্বীকৃত নেতা।

রলাঁ অরবিন্দ সম্পর্কে মোটামুটি বিশদ খবর পান পিয়র্সনের কাছ থেকে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। পিয়র্সন গিয়েছিলেন রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে অরবিন্দের প্রতি ছিল পিয়র্সনের গভীর শ্রদ্ধা। তিনি বলেছিলেন: "অরবিন্দ গান্ধীর ইচ্ছা শক্তি ও চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রকাশের প্রতিভার মিলন ঘটিয়েছেন। বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের পর, তিনি তা থেকে অবসর নিয়েছেন এই প্রত্যয়ে যে, মানুষ এখনো পরিপক্ক হয়নি, এবং তিনি শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই সক্রিয়।" তিনি পন্ডিচেরি গিয়েছিলেন অরবিন্দকে দেখতে, দেখেছিলেন তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন—তাঁর ভাষায়,—মার্থা ও মেরীকে নিয়ে। রলাঁ বন্ধনীর মধ্যে লিখেছেন: মার্থা জনৈকা ইংরেজ মহিলা, মেরী পল রিশারের স্ত্রী,—তাঁরা দুজনেই তাঁর প্রতি পুরোপুরি ভক্তিমতী।*

অরবিন্দের প্রসঙ্গ আবার ওঠে ১৯২৬ সালের জুলাইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপচারিতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগেও রলাঁ ও তাঁর বোনের আলাপচারি হয়েছে ১৯২১ সালের এপ্রিলে। গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কিছু আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তখন

অরবিন্দের প্রসঙ্গ ওঠেইনি। ১৯২৬ সালে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করে ইতালি থেকে ফেরার পথে রলাঁর সান্নিধ্যে বিশ্রাম নেবার সময় বহু-বিচিত্র আলাপাচারিতে প্রসঙ্গ উঠেছিল অরবিন্দের। রবীন্দ্রনাথ যা যা বলেছিলেন, শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তা ছিল নিতান্তই মামুলি: শিশুকালেই তিনি অরবিন্দকে চিনতেন। একই জাহাজে শিশু অরবিন্দ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিলেন। অরবিন্দ পুরোপুরি ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছিলেন, পড়েছিলেন অক্‌সফোর্ডে (?); ইউরোপীয়দের মতো জীবন যাপন করতেন, ভারতের কিছুই জানতেন না, কিন্তু আশ্চর্য ভাষাজ্ঞানের ফলে বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁর বাংলা পুরোপুরি কখনো বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি (n'ai jamais devenu tout à fait pur)। তার মধ্যে কেমন বিদেশী গন্ধ আছে।—তাঁর বেদের টীকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উঁচু ধারণা। যুক্তির ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য সমালোচনার কোনো কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। সবসময়েই তিনি পণ্ডিচেরিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, অরবিন্দের সর্বশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছুই তিনি জানেন না, সে সম্পর্কে শুধু শুনেছেন। তা বিচার করার অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে উচ্চ স্তরের মানুষ বলে গণ্য করেন, তাঁর প্রতি তিনি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল।[১০]

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে অরবিন্দের নাম উল্লেখ করেছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৯২৬)। তাঁর মতে: ভারতের অগণিত বৈদান্তিকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা ও উত্তরাধিকারী—অরবিন্দ ঘোষ বিবেকানন্দের শিষ্য।[১১] দিলীপকুমার রায় রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিন বার (২০ অগাস্ট ১৯২০; অগাস্ট ১৯২২; ২৪ অক্টোবর ১৯২৭)। প্রথমবারের আলাপচারিতে গভীর তিক্ততার সঙ্গে ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের কথা বলতে গিয়ে গান্ধীর প্রসঙ্গ তোলেন: গান্ধী তাঁর সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন জনগণের জন্যে, যাদের উপরে তিনি চুম্বকের মতো ক্রিয়া করেন। তিনি তাদের কাছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রচার করেন এবং হিংসার পথ থেকে সরিয়ে রাখেন। তাঁকে অন্তরীণ করায় বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মনে হয়, তিনি তলস্তয়ের আদর্শে প্রভাবিত। দিলীপ রায়ের মুখেই রলাঁ প্রথম গান্ধীর নাম ও পরিচয় জানেন। দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকারেও তাঁদের আলাপচারিতে প্রধান বিষয় ছিলেন গান্ধীই, অরবিন্দ-

প্রসঙ্গের নামমাত্রও ছিল না। কিন্তু রলাঁ জানতেন যে, দিলীপকুমার অরবিন্দের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন। দিলীপকুমার তাঁকে অরবিন্দ-সম্পাদিত *আর্য* পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি পাঠিয়ে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে নিজের মত জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (১ অক্টোবর): "...........তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার পুরোপুরি মিল আছে। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমি খুব কম জানি—কিন্তু যতটুকু জেনেছি তা থেকে চিনতে পেরেছি যে তাঁকে জগতের একজন উর্ধ্বতম আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষ বলে।" এই চিঠিতে রলাঁ ঈশোপনিষদ-এর ৯-১১ তিনটি শ্লোকের অরবিন্দের ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তাঁর নিজের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে।[১২] এবং তৃতীয়বারে,—পাঁচ বছর পরে রলাঁ সাক্ষাৎকারে দেখতে পেলেন, দিলীপকুমার তখন অরবিন্দের পুরোপুরি প্রভাবে পড়েছেন। (Il subit actuellement l'ascendant de Aurobindo Ghose)।[১৩]

সেবার দিলীপকুমার বিস্তারিতভাবে অরবিন্দের কথাই রলাঁকে শুনিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বসু সস্ত্রীক দুবার (৯ জুলাই ১৯২৭; ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮) রলাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আলাপ-আলোচনা করেছেন, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান, রাজনীতি, গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইত্যাদি বহু বিচিত্র। রলাঁ জগদীশচন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন: "*মনের নতুন মহাদেশের ক্রিস্টোফার কলম্বাস*। দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকারে কথা উঠেছিল *রাজযোগ* সম্পর্কে এবং একমাত্র সেই প্রসঙ্গেই উঠেছিল অরবিন্দের নাম। রলাঁ সে সময়ে বিবেকানন্দ পড়ছিলেন। বিবেকানন্দের মতো শক্তিশালী ও আন্তরিক বুদ্ধির মানুষটিকে রূপকথাসুলভ কোনো কোনো অতিলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করতে এবং তা শিক্ষা দিতে দেখে তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন, আর সেই জন্যেই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে *রাজযোগ* সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস *রাজযোগ*-এ বিরাট শক্তিলাভ হয়,—কিন্তু একটা বিশেষ সীমার বাইরে নয়। তবে অরবিন্দের উচ্চতর প্রতিভার প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা জানিয়েও, বিশ বছরের দীর্ঘ নির্জনবাসে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে যে অলৌকিক ফলের আশা তিনি করছেন, সে সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল।[১৪] জগদীশচন্দ্রের মতে, যোগের মাধ্যমে যদি

অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হতো, তাহলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না, তা বোঝা যায় না। রলাঁ লিখেছেন: "আমিও এই রকমই ভাবি।"

পরে মণিলাল প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে (২৭ অক্টোবর ১৯২৯), "অভিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ" (un sanscritiste excercé) মণিলাল রলাঁকে বলেছিলেন: অরবিন্দের সংস্কৃতিবিদ্যায় অধিকার খুবই বিতর্কমূলক (fort discutable); তাঁর ব্যাখ্যাগুলো প্রায়শই জোর করে করা (souvent forcées), পাঠগুলো তাঁর নিজের মনের আলোয় আলোকিত হয়েছে।[১৫]

অরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল ২৮ মে ১৯২৯ সালে কলম্বো যাবার পথে পণ্ডিচেরিতে। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিলেন কিনা, তা নিয়ে দ্বিমত ছিল। কালিদাস নাগ (জুন ১৯৩০) বলেছিলেন, কোনো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এন্ড্রুজ বলেছিলেন একেবারে বিপরীত কথা।[১৬] তারপর তিন বছর পরে দিলীপকুমার পাঠিয়েছিলেন *শ্রীমার সঙ্গে আলাপচারি*। বই পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে, বইয়ের প্রশংসা করে রলাঁ উত্তরে লিখলেন:

> ....নতুন জীবনকে অনেক পরে উদ্ভাসিত করার জন্যে ভগবানের বুকে ঠাঁই নেওয়াটা আমাদের মতো পশ্চিমের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এখুনি ছুটতে হবে অত্যাচারিতের—মানুষের ও জাতির সাহায্যে, তারা অপেক্ষা করতে পারে না। এক মুহূর্তের জন্যেও বর্তমান কর্ম থেকে মনকে সরিয়ে নেবার অধিকার আমরা স্বীকার করি না। "এক" সব কিছু আলিঙ্গন করে আছেন এবং যে অসংখ্য স্রোত বয়ে চলেছে তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করেন, তা জানা ও উপলব্ধি করা আমার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের পক্ষে বৃথা. আমার পারানির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সেই স্রোতে যারা ডুবছে তাদের বাঁচানো, নয়তো তাদের সঙ্গে ডুবে মরা। "আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর": *বিবেকানন্দের এই কথাটিই আমার অস্থিমজ্জায় লেখা আছে, যদিও আমি জানি যে, সত্তার প্রাচুর্য, সীমাহীন রূপে, দুঃখদুর্দশা ও একটি দিনের সংগ্রামকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু তা সুসম্পন্ন করতে সত্তার পক্ষে আছে অনন্ত কাল আর আর্ত-পীড়িতদের আছে মাত্র একটি দিন। যাদের কম আছে, বেশির অধিকার তাদেরই*.........[১৭]

১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মে ধর্ম-মহাসভা-র (Congrès des Religions) দ্বিতীয়

অধিবেশন বসার কথা শিকাগোয়, যার প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রণ এসেছিল রলাঁর কাছে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অসামর্থ্য জানিয়ে রলাঁ একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। *ওয়ার্লড ফেলোশিপ অব্ ফেইথ্স*-এর জাতীয় সভাপতি বিশপ ফ্রানসিস জে. এম. কনেলকে। বাণীটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তিনি লিখেছিলেন:

> নরদেব খ্রিষ্ট বলেছিলেন: *আমিই সত্য, আমিই জীবন*। এই মহৎ বাণীটি এক বিশ্বাসের গর্ভ থেকে এক নদীর মতো দুকূল প্লাবিত করছে। এ মূল্যবান সকল বিশ্বাসের সকল মানুষের পক্ষে (বা যারা বিশ্বাসহীন বলে মনে করে: কারণ, তাহলে কে বাঁচত, যদি সে বিশ্বাসের জোরে না খাড়া থাকত?) *সত্য ও জীবন অজ্ঞাত-ঈশ্বর, যার মধ্যে আমরা আছি, আমরা সঞ্চরণ করছি, হাওয়ার মধ্যে, জলের মধ্যে পাখিরা মাছেরা, যেমন সঞ্চরণ করে*।..........
>
> সত্য একটা প্রবাহ।..........
>
> প্রবাহ কোথায় যায়? যায় মহাসাগরের দিকে, যায় জীবন্ত *একের* দিকে।.........
>
> সমস্তই চলেছে একের দিকে। আমাদের সমস্ত নদী। আমাদের সমস্ত লাফ-ঝাঁপ, আমাদের সমস্ত প্রয়াস, আমাদের সমস্ত লড়াই, আমাদের সমস্ত নৈরাশ্য—এক মহাপ্রবাহের ঘূর্ণিপাক। সমস্ত কিছুরই লক্ষ্য মহাসাগরীয় ঐক্যের দিকে চলন্ত জনসংঘট্টের ঐকতানের দিকে, যে *ঐক্যতানে সুসমন্বিত হয়ে ওঠে*, অযুত লক্ষ সত্তা।
>
> কিন্তু এই ঐকতান সিদ্ধ করাটা কেবল একক অহংসর্বস্ব স্বতঃলব্ধ জ্ঞানে সম্ভব নয়, তা এক বিচ্ছিন্ন চেতনাকেই মুক্তি দিতে পারে। তা হবে শুধু সমস্ত জীবন্তের মধ্যে আলাপনের মাধ্যমে। আর আমাদের *এইটেই* চাইতে হবে, এবং তা বাস্তব করে তোলার জন্যে কাজ করতে হবে।
>
> এটা বলা সত্য নয়: "*যে চিন্তা করে, সে সক্রিয় হয়।*" বরং বলা উচিত: "*যে চিন্তা করে তাকে সক্রিয় হতে হবে।*"
>
> ক্রিয়া ছাড়া কোনো চিন্তাই বাস্তব, সম্পূর্ণ জীবন্ত নয়। ক্রিয়া ছাড়া সে কেবল ছায়া মাত্র, রক্তশূন্য। আর যে সক্রিয় হয় তার চিন্তাকে,—

> চিন্তায় যেমন তেমনি তার ক্রিয়ায়—সব সময়েই ঝুঁকতে হবে বিশ্বজনীনের দিকে, সত্যের দিকে এবং জীবনের দিকে, এককের দিকে, সমস্ত সত্তার দিকে; যে যতো বেশি জীবন্ত, সে জীবনকে ততো বেশি আলিঙ্গন করে; আমাদের সম্পদ অপরের সম্পদ হয়ে ওঠা পর্যন্ত বাড়তেই থাকে। আর যারা বেশি জীবন্ত তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের সত্ত্ব দিয়ে কম জীবন্তদের লালন করা, দুর্বল ও পীড়িত, অত্যাচারিত, আর্তদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। বিবেকানন্দের মহিমান্বিত ঘোষণা: "*আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর*"—আমাদের প্রাণশক্তির কাছে সঙ্গত আহ্বান। ঈশ্বর বিতর্কিত হন সেইসব ব্যক্তি ও মানুষের লড়াইয়ের মধ্যে, যারা সঞ্জীবনী আলো-হাওয়ায় বঞ্চিত এবং যাদের সেসব জয় করতে হবে।
>
> যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তিনি তার পক্ষ সমর্থন করুন সেই লক্ষ লক্ষ জনের মধ্যে, যাদের নিপীড়িত করছে সামাজিক অবিচার ও অসাম্য! কারণ তারাই হচ্ছে নিপীড়িত সত্য ও জীবন, যারা জীবন্তের ঐক্যের আকুল কামনা করছে।[১৮]

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রলাঁ তখন সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছেন জার্মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। রাইখস্টাগে আগুন ধরানোর অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে দিমিত্রভ এবং তাঁর সঙ্গীদের। রলাঁ লিখলেন: *রাইখস্টাগের অগ্নিকান্ডের প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে* (৪ সেপ্টেম্বর)।[১৯] নভেম্বরে এসেছিলেন তরুণ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে রলাঁর সুদীর্ঘ আলোচনা হয় ভারতের ও বিশ্বের রাজনীতি নিয়ে, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে গান্ধীজির ভূমিকা নিয়ে। গান্ধীজির ভূমিকা সম্পর্কে রলাঁ কিন্তু একেবারেই সৌমেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হননি;[২০] তবে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের ভূমিকায় দুজনের মতৈক্য হয়েছিল এবং রলাঁ সৌমেন্দ্রনাথের মাধ্যমে ভারতের তরুণদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি সতর্ক বাণী পাঠিয়েছিলেন।[২১] ডিসেম্বরে রলাঁ লিখলেন দিমিত্রভদের মামলার একেবারে শেষের দিকে: *দিমিত্রভ ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির জন্যে জার্মান জাতির কাছে নিবেদন* (১১ ডিসেম্বর); *টরগলেরকে বাঁচাও* (ডিসেম্বর)।[২২]

১৯৩৪ সালটির শুরুতেই রলাঁ হয়ে উঠেছিলেন, ইউরোপের দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের বিরোধী শক্তি সমাবেশের বিপুল উদ্যোগের অন্যতম মুখপাত্র। ফেব্রুয়ারি মাসে *পারীর নাগরিকদের প্রতি আবেদন*-এ তিনি ডাক দিলেন: "ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আমাদের আমৃত্যু সংগ্রাম। মনে রেখো ভলত্যারের বাণী: *এ জঘন্যতা ধ্বংস করো* (Ecrasons l' infâme!)।" তিনি আবেদন জানালেন বুদ্ধিজীবী ও সর্বহারাদের মিলনের জন্যে: "শ্রমজীবীদের পাশেই আমাদের স্থান। তাদের দেহ থেকে আমাদের জন্ম, তাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তারাই গাছের মূলকান্ড; বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শাখামাত্র। কান্ড যদি দুর্বল হয়, তাহলে শাখাও শুকিয়ে যাবে।"[২৩]

ফ্রান্সে সক্রিয় হয়ে উঠছিল *লাকসিয়ঁ ফ্রঁসেইজ* (L' Aaction française), তার লক্ষ্য ফরাসী তরুণদের দেশ ও জাতির মহিমার নামে সংগঠিত করা, যেমনটি করা হয়েছিল ইতালিতে, যেমনটি করা হচ্ছে জার্মানিতে। পারীর রাস্তায় রাস্তায় পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করেছে। রলাঁ ফরাসী তরুণদের উদ্দেশে বললেন: ব্যাংকমালিক, খনিমালিক, বৃহৎ শিল্পমালিক—যারা পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে মিথ্যার বেসাতি ও উৎকোচের দাসত্ব করে এসেছে, আজ তার জীবনী শক্তি ফুরিয়ে আসায়, কৌশলে জনসাধারণকে,—বিশেষ করে তরুণদের, ঘৃণাবিদ্বেষের উস্কানি দিয়ে মাতিয়ে তুলছে। কিন্তু এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে চূর্ণ করবে যে-তরুণরা, তাদের পেছনে রয়েছে ফ্যাসিস্ট চক্রান্তকারীরা। আসল শত্রু তারাই। ধ্বংস করতে হবে ফ্যাসিস্টবাদকেই। লৌহ ব্যবসায়ী সংঘ, ব্যাংক ও তাদের বোম্বেটের বন্ধনশৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলো। ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক।"[২৪]

মার্চ মাসে রলাঁ এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন; (তাঁর নাম রলাঁ উহ্য রেখেছেন কারণ তাঁর প্রতি মৃত বন্ধু শার্ল প্যেগীর অনুরাগ (affection) ছিল।) চিঠির সঙ্গে ছিল *শান্তির জন্যে। বিশ্বের ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে মাতা ও স্ত্রীদের আবেদন* শিরোনামে একটি আবেদন পত্র, ৮০ হাজার মাতা ও শিক্ষিকাদের আন্তর্জাতিক লিগের পক্ষ থেকে। "উদ্বেগের সঙ্গে"

আবেদন জানানো হয়েছিল সমস্ত বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক নেতাদের—পোপ, বিশপ, পাদ্রি, প্যাস্টর, রব্‌বি,—সমস্ত জাতির সমস্ত দর্শনের মানবগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক নেতা—সকলের উদ্দেশে, যাঁদেরই আত্মার সেবায় নিযুক্ত কোনো বিশ্বাস আছে। আবেদন পত্রে বলা হয়েছিল: "জনমত জাগানের জন্যে তাঁরা সম্প্রতি যা করেছেন, তা ভুল না-বুঝেও (sans méconnaître), অতল গহ্বরের কিনারা থেকে আমরা চিৎকার করে বলছি: জগৎ বিপদের মুখে।.......আমাদের—নারীদের কখনো বোধগম্য হবে না যে, মৃত্যুর আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো জীবনের আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে ভয় দেখাচ্ছে। এই আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর উপরেই আমাদের বিশ্বাস ন্যস্ত করছি।........আমরা তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—তাঁদের সকলের পবিত্র ঐক্যের দৃষ্টান্ত দেখান,—আর তাঁরা তা পারেন, তাঁদের তা পারতে হবে, এবং বিরতিহীন মহিমান্বিত সংগ্রাম চালিয়ে যান, যাতে দায়িত্বশীল সরকারগুলোর কাছ থেকে এই কথা আদায় করা যায় যে: "সকলেই অস্ত্র-সংবরণ করবেন।" শান্তি সম্পর্কে উদাসীন নারীদের রলাঁ কঠোর ভাষায় যে-তিরস্কার করেছিলেন, তা পড়ে অভিভূত হয়ে, "পুরনো সংগ্রামী শান্তিবাদীর" মন নিয়ে এবং তাঁর বাবার ও পেগ্যীর প্রেরণায়, এই আবেদনটি রলাঁকে পাঠিয়ে ভদ্রমহিলা চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, রলাঁ যেন তাঁর আগ্রহ, তাঁর কর্তৃত্ব, তাঁর উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন।

দেরির জন্যে ক্ষমা চেয়ে উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (১৭ এপ্রিল): তাঁদের আবেদন ফলপ্রদ হবে বলে তাঁর মনে হয় না। প্রথমত, "সমস্ত মতের ধর্মীয়দের" উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন না, তাঁদের কাছে অতীতে তিনি ভরসা দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু চাননি। কিন্তু গত বিশ বছরের কঠোর পরীক্ষায় (épreuves) তাঁরা শোচনীয়ভাবে জগতের সামনে দেখিয়েছিলেন যে, যারই "সেবা" তাঁরা করে থাকুন "আত্মার".........সেবা তাঁরা করেননি। তাঁরা সবকিছুর আগে বাঁধা ছিলেন তাঁদের সুযোগ সুবিধা ও তাঁদের সাম্প্রদায়িক সংস্কারে, যারা ঈশ্বরকে খাপ খাইয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত, এবং সেটাই মুখ্য—নেকড়ে ও ভেড়ার মধ্যে "পবিত্র ঐক্যের" কথা বলা অর্থহীন, যেমনটি আজকের বাস্তব জগৎ আমাদের চোখের সামনে হাজির করছে। গোটা বর্তমান সমাজটাই দাঁড়িয়ে আছে এক বিপুল অন্যায় অবিচারের স্তূপের উপরে, তাদের

বেশির ভাগই "পবিত্রীকৃত"। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এই স্তূপ ধসে যাচ্ছে, মাটি যেমন করে ভূমিকম্পে ধসে যায়। ভেড়ার মতো করুণ ও ক্ষীণ কণ্ঠে "ঐক্যকে" ডাকলে কী লাভ হবে?—পরিশেষে তিনি লিখলেন:

> আমার কিছু ভয় (ভয়ের কিছু জোরালো কারণ) আছে যে, কেবল "সমস্ত মতের ধর্মীয় নেতারা নন," "মানবগোষ্ঠী-সমূহের আধ্যাত্মিক নেতারাও".......আপনাদের নামমাত্র সাহায্যও করবেন কিনা: যাঁদের নাম নেতা, তাঁদের নামই সুযোগসুবিধা; যাদের নাম সুযোগসুবিধা, তাদের নামই চোখে-বাঁধা রঙিন ঠুলি (bandeaux doré); আর তাঁদের সংখ্যা খুবই কম, যাঁদের প্রবণতা ঠুলি ছিঁড়ে ফেলার দিকে, যাতে দেখতে পান কোন অত্যাচারিত মানবতার মূল্য স্বরূপ এইসব সুযোগসুবিধা তাঁদের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। আমি একটি মাত্র "পবিত্র ঐক্য"-কে চিনি,—তা হচ্ছে সমগ্র জগতের অত্যাচারিতের ঐক্য—*"আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর": বলেছিলেন ভারতবর্ষের বিবেকানন্দ,—আর তা ইউরোপের খ্রিষ্টও বলেছিলেন স্পষ্টাকারে,—এবং এই একই মন নিয়ে, কিন্তু পৃথক পৃথক অস্ত্রে লড়াই করেছেন গান্ধীরা ও লেনিনরা। আমি তাঁদের বাহিনীর এক যোদ্ধা।*[২৫]

এপ্রিল মাসে এসেছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ড. মহেন্দ্রলাল সরকার। রলাঁ তাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তৃতীয় খণ্ডে মায়ার প্রসঙ্গে তাঁর নাম ও গ্রন্থের (*কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন বেদান্তিজম্*) উল্লেখ করেছিলেন। তিনি রোমে এসেছিলেন মুসোলিনির প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যার নতুন ইনস্টিটিউটে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে, এখন চলেছেন হিটলারের জার্মানিতে কয়েকটি শহরে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণে।........তাঁর চিন্তার সব কিছু গিয়ে পৌঁছায় সব কিছু ফিরে আসে বৈদান্তিক অধিবিদ্যায়—শঙ্করে। তিনি দাবি করলেন: "অদ্বৈতবাদের মহৎ গুরুদের কাছে "পরম" সব সময়েই আশাবাদী কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং বৈদান্তিক চিন্তাকে যিনি নৈরাশ্যবাদী মনে করেন তিনি অদ্বৈতবাদকে মোটেই জানেন না।" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলমান অধ্যাপক এম. এইচ. সৈয়দ তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা পত্র *ভারতীয় চিন্তার আশাবাদ* রলাঁকে পাঠিয়েছেন। ড. সৈয়দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ১৯৩২ সালের ২৩ অক্টোবর। তাঁর সঙ্গে রলাঁ ড.

সরকারের কথার মিল দেখতে পেলেন। ড. সরকার ভারতের জীবিত দার্শনিকদের মধ্যে সবার উপরে স্থান দেন অরবিন্দ ঘোষকে এবং তা করেন স্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে এই কারণে যে, তিনি "পরম" ও "ক্রিয়াকে"—সব কিছুকে আলিঙ্গন করতে এবং একটার সঙ্গে অন্যটাকে বাঁধতে চেষ্টা করছেন। অরবিন্দ সম্পর্কে একটি বক্তৃতার কপি ড. সরকার রলাঁকে দিয়েছিলেন।[২৬]

জার্মানিতে হিটলারী ফ্যাসিবাদের সন্ত্রাস তখন চরমে উঠেছে। রাইখস্টাগের অগ্নিকান্ডের অভিযোগে দিমিত্রভের বেকসুর খালাশের পরই, প্রবাদপ্রতিম কম্যুনিস্ট নেতা থায়েলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আপিল করার, উকিল দেবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বিচার চলছে গোপনে। প্রকাশ্য বিচারের দাবি জানিয়ে রলাঁ প্রতিবাদ জানালেন: *থায়েলমানকে বাঁচাও* (৯ মে)।[২৭] ওদিকে আবার ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অস্ট্রিয়ায়। ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েনায় যা ঘটেছিল, তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে ১৯১৯ সালের বের্লিনের রক্তাক্ত জানুয়ারির লিবেক্লনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের হত্যাকান্ডের।[২৮] অস্ট্রিয়ায় ফ্যাসিবাদী প্রতিবিপ্লব বুর্জোয়শ্রেণীর হাতে গড়া। মধ্যযুগীয় ও সামরিক প্রতিক্রিয়া-শক্তি তার সহযোগী। ইতালি ও জার্মানির নেতা একদল পরাক্রান্ত ভাগ্যান্বেষী, এসেছে সাধারণ মানুষ এবং পেটি-বুর্জোয়ার নিকৃষ্ট অংশ থেকে। ইতালি ও জার্মানিতে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীকে হাতে রেখেছে কম্যুনিজমের জুজুর ভয় দেখিয়ে। যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই এক অপূর্ব সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিল, যা অন্য কোনো সমাজতন্ত্রীরা পারেনি। অস্ট্রিয়ায় ইতালির কম্যুনিজমের জুজুর ভয় ছিল না, জার্মানির মতো পরাজয়ের অপমানের শোধ নেবার প্রশ্ন ছিল না। অস্ট্রিয়ার ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে মারাত্মক দিক ধর্মকে আশ্রয় করা, ইতালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদ যা করেনি। "ফ্যাসিবাদ যখন ধর্মের মুখোশ পরে, তখন তার চেয়ে চিন্তার স্বাধীনতার আর কোনো বড়ো শত্রু নেই। সে তা জানে। তাই ধর্ম সংশ্রবহীন কোনো আন্দোলনকেই সে সহ্য করতে পারে না।" রলাঁ *অস্ট্রিয়ার ফ্যাসিবাদ* লেখাটিতে (২০ জুন)[২৯] এই বিশেষত্ব সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরলেন। ভিয়েনার শ্রমিকশ্রেণী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে বীরত্ব দেখিয়েছিল, তার মুগ্ধ প্রশংসা করে তিনি লিখেছিলেন: "ভিয়েনার যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে বিনা সংঘর্ষে ধীরে ধীরে

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা স্বপ্ন মাত্র। বীরত্বের দৃষ্টান্ত ইউরোপের বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য এনেছে। ভিয়েনার যুদ্ধ থেকে ইউরোপের বিপ্লবী দলগুলো শিখেছে শৌর্য, সাহস ও কর্মের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি। ভিয়েনার শিক্ষায় শুধু ভিয়েনাই লাভবান হবে না, লাভবান হবে সমগ্র জগৎ। রক্তের অক্ষরে এ শিক্ষা যারা লিখে গেল তাদের নমস্কার।"

এর কয়েক মাস পরেই রলাঁ লিখলেন: *মুসোলিনির জেলে যারা মরতে বসেছে* (সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)—একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ।[৩০] তাতে তিনি মুসোলিনি চরিত্রটির নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হিটলারের সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়েছেন। মুসোলিনিকে রোম সম্রাট অগাস্টাসের সঙ্গে তুলনা করে মহাপুরুষ বানাতে বুর্জোয়ারা তাঁর জয়গান শুরু করেছিল। কিন্তু রলাঁ লিখলেন: "আমরা গাইতে চাই অন্য গান। থায়েলমানের আঠারো মাস কয়েদবাস দেখে যাঁরা গ্রামশীর সাত বছরের তিল তিল যন্ত্রণাভোগের কথা ভুলে যান, আমরা তাঁদের দলে নই।........দুচে গুরুদেব, ফুর্‌হার শুধু তার শিষ্য।" এই প্রবন্ধে রলাঁ, এ তাবৎ মুসোলিনির দশ বছরের শাসনকালে দন্ডপ্রাপ্ত, নির্বাসিত, মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত এবং বিচারাধীন বন্দীদের বিস্তৃত পরিসংখ্যান, তথ্য ও পরিচয় দিয়েছেন, সর্বোপরি দিয়েছেন আন্তোনিও গ্রামশীর এক মনোজ্ঞ মূল্যবান বিবরণ।[৩১] অবশেষে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। স্পেনে বিপ্লব। আস্তুরিয়ার খনি শ্রমিকরা, বার্সেলোনার শ্রমিকেরা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল অক্টোবরে। রলাঁ সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানালেন (৪ নভেম্বর): "*বার্সেলোনা ও ওভিয়েদোর সংগ্রামীরা ধন্য! ধন্য,—১৮৭১ সালের পারী কম্যুনের পরে পশ্চিমের সর্বহারাদের আরও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন!* কম্যুনের পরাজয় থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত বিপ্লব। আস্তুরিয়ার রক্তরঞ্জিত পাহাড়গুলো থেকে বেরিয়ে আসবে ইউরোপের সর্বহারাদের বিজয়, তার ডানায় ঢেকে ফেলবে গোটা দুনিয়া।[৩২]

সেই নভেম্বর মাসেই নিস্‌ থেকে ল্যুদেভিক রেও নামে এক থিওসোফিস্ট রলাঁকে পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণমূর্তির উপরে লেখা একখানি বই। বইটির প্রশংসা করে রলাঁ তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন (২২ নভেম্বর): তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কৃষ্ণমূর্তির "সমগ্রতার" ধারণা,—যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, এবং মুক্তির ধারণা,—যে মুক্তি মানুষকে তা উপহার দেয়। কিন্তু

সামাজিক ক্ষেত্রে তা রলাঁকে তৃপ্ত করে না। কৃষ্ণমূর্তির কাছে (এবং যিনি বইটি পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে), সামাজিক সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তির একটা সমস্যা। এটা বিমূর্ত ভাবে সত্য (abstraitement vrai)। এটা স্পষ্টই যে, ব্যক্তি যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, শক্তিশালী হয়, অকলুষ হয়ে ওঠে, তাহলে আইন-কানুন, কাঠামো, সরকার সব পালটে যাবে। কিন্তু সকলেরই জানা আছে যে, বাস্তবে কৃষ্ণমূর্তির এবং জগতের সমস্ত সাধুদের শিক্ষা, কুলীন মন ছাড়া অন্য মনে ঢোকে না। আর সমাজ-ব্যবস্থা বদলাবার জন্যে এই শিক্ষা প্রয়োগ করে "ব্যক্তির" পরিবর্তনের উপরে যদি নির্ভর করতে হয়, তাহলে অনন্ত কাল লেগে যাবে। কিন্তু দুঃখদুর্দশা তো বসে থাকবে না, অবিচার বসে থাকবে না। তাদের বাঁচাতে হবে, যারা নিজেরা ডুবছে, এবং তাদের ছাড়াও বেশি করে, যাদের ডোবানো হচ্ছে। রলাঁ তাঁর চিঠি শেষ করলেন এই কথা বলে:

> কৃষ্ণমূর্তি ভালোই বলেছেন: "যে-সত্তা যন্ত্রণা ভোগ করছে, লড়াই করছে, যে সত্তা রাস্তায় হেঁটে চলেছে, তাকে শ্রদ্ধা করো। কিন্তু "শ্রদ্ধা" করায় কিছুই হবে না যদি না তার সঙ্গে যোগ করা যায়: তাকে সাহায্য করো। *তার বোঝা হালকা করো, এবং তার লড়াইয়ের ভাগ নাও! আর ঈশ্বরে-নিবিষ্ট আন্তর জীবনকে অস্বীকার না-করেই তা পারা যায়।* ঈশ্বর যদি সামগ্রিক জীবন হন, তাহলে তিনি কর্ম বটেন এবং তিনি সমস্ত জীবন্তের পক্ষে ও সমস্ত জীবন্তের জন্যে সংগ্রাম।[৩৩]

চিঠির প্রতিটি কথায় যেন বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি।

এগারো

উৎকণ্ঠার পর্ব পার হয়ে রম্যাঁ রলাঁ পৌঁছালেন এক দৃঢ়প্রত্যয়ের স্থির বিন্দুতে আমৃত্যু সংগ্রামের এক অঙ্গীকারে। গত বছরে ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েনার শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে ফ্যাসিবাদের চণ্ড শক্তির নগ্ন রূপ দেখে রলাঁ লিখেছিলেন: "যে-যুগ অনাবৃত হয়েছে এবং যে-যুগ গোটা দুনিয়াকে আলিঙ্গন করবে, তিনি অটলভাবে সেই মহাসংগ্রামের এই দ্রুত অতিক্রান্ত যুগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন;—মানবতার এই সব থার্মোপলিতে (ces Thermopyles de l'humanité)—মাত্র দুটি মনোভঙ্গিকে (attitude) তিনি সত্যিকারের পৌরুষজনক বলে মনে করেন:—ধর্মীয় মনোভঙ্গি, গান্ধীর অহিংস অ-গ্রহণের (la non-acceptation) মনোভঙ্গি, কোনো আদর্শের জন্যে পুরোপুরি আত্মবিসর্জন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব থেকে উচ্চতর ও দূরতর,—এই বিশ্বাস ও শহিদদের মাধ্যমে পরে যা সিদ্ধ হবে;—এবং বিপ্লবী মনোভঙ্গি যা বর্তমানের কর্মকে স্বীকার করে নিয়ে তার সমস্ত প্রয়োজনকে স্বীকার করে। যে-কর্ম সক্রিয় নয় বা যা দু-পা গিয়েই পিছিয়ে আসে, কিংবা মানুষের সেই প্রেম যা আত্মবিসর্জন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় না,—এদের কারুর জন্যেই এ দুটির মধ্যে স্থান নেই।"[১]

এপ্রিল মাসেই তিনি বিবেকবান প্রতিবাদীদের অন্যতম মুখপাত্র পিয়ের সারাজোলের মাধ্যমে গান্ধীজিকে লিখেছিলেন: "সত্যাগ্রহের যে-মহান পরীক্ষা তিনি চালাচ্ছেন, এবং যার ফলাফল এখনো অনিশ্চিত, আশা করা যায় ভারতবর্ষে তার জয় হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইউরোপে তার জয় হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।" একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা—স্বাধীন ইউরোপীয়রা, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধবাদী—তাঁদের তাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্ষা করা, সামাজিক নির্মাণকাণ্ডের, সমস্ত আশাভরসার সে-ই অপরিহার্য ভিত্তিভূমি।—ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার আন্তর্জাতিক শক্তিকে কী করে থামানো সম্ভব? সত্যাগ্রহ দিয়ে হবে না। তার জন্যে ইউরোপ প্রস্তুত নয়। বিবেকবান প্রতিবাদীরা ব্যক্তিগত ভাবে অনিবার্য আত্মবিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু তা দিয়ে আজকের ট্র্যাজিক মুহূর্তের অনিবার্য ভবিতব্যের কিছুই বদলানো যাবে না। এই ভবিতব্য পরস্পর

বিরোধী জগতকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে: আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেবায় ফ্যাসিস্ট-একনায়কতন্ত্র—এবং সর্বহারাদের বিপ্লব। দুটির মধ্যে একটির পক্ষ বেছে নিতে হবে। রলাঁ লিখলেন: "আমি পক্ষ বেছে নিয়েছি। নিজের হাতে সংগঠিত করা এবং শাসকশ্রেণীর জোয়াল থেকে মুক্ত শ্রমিকের দুনিয়ার পক্ষে আমি।.....অহিংসরা দাঁড়াক অহিংসা নিয়ে, অন্যরা দাঁড়াক সশস্ত্র লড়াইতে। কোনো ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয়তাকে মেনে নেওয়া চলে না।........আপনি সত্যাগ্রহ দিয়ে লড়াই করছেন। সর্বহারা বিপ্লবের অন্য অস্ত্র আছে। কিন্তু দুই পৃথক কর্মের ক্ষেত্রে যা শুরু হয়ে গেছে তা একই লড়াই। শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর এক বন্ধন স্থাপন করা, যারা পৃথক ভাবে একই আদর্শের জন্যে লড়ছে।"[২]

কর্মের ক্ষেত্রে গান্ধী ও লেনিন দু'জনকেই রলাঁ সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, *জল ও আগুন*—দুই বিপরীতের মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব। তাঁর আন্তরিকতায় কোনো খাদ ছিল না, কিন্তু তা যে "অসম্ভবের পায়ে মাথা কোটা", তা বুঝে উঠতে একটু সময় লেগেছিল। তিনি পরে নিজেই বলেছেন: যে দুটি মতবাদকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন তারা আপস জানত না, প্রত্যেকেই নিজেকে সত্যের একমাত্র ধারক মনে করত; অপরের সত্যকে শত্রু বিবেচনা করত। "আগুন ও জলের" মিলন না-ঘটায় *প্রত্যক্ষ কর্মের ক্ষেত্রে আগুনের পক্ষ বেছে নেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ* বলে মনে করলেন। এবং গান্ধীকে সেকথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না।[৩] গান্ধী প্রসঙ্গে রাজা রাওকে রলাঁ সুস্পষ্ট ভাবে লিখেছিলেন (২৬ মার্চ ১৯৩৫): "তাঁর (গান্ধীর) সামাজিক চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে অন্তর্গূঢ় এক ধর্মীয় বিশ্বাস, তা নিঃসন্দেহে খাঁটি এবং উচ্চ মার্গের। কিন্তু তা নতুন নতুন দিগন্তের অভিমুখে এগিয়ে-চলা মানবতাকে আলিঙ্গন করার মতো তেমন বৃহৎ নয় (mais pas assez large pour embrasser l'humanité en marche vers horizons nouveaux)।[৪]

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।" রলাঁর দৃঢ়বিশ্বাস: "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"; অহিংসা হাস্যকর প্রস্তাব। ফ্যাসিস্ট দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে দেশে দেশে যারা প্রস্তুত হবে, রলাঁ তাদের ডাক দিয়ে চলেছেন পত্রে, পত্রিকায়, আন্তর্জাতিক সভাক্ষেত্রে। অহিংসাপন্থী, বিপ্লবপন্থী, বিবেকবান প্রতিবাদী, কোয়েকার, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট—সকল মতের সকল পথের মানুষকে তিনি এক মঞ্চে সমবেত

করার চেষ্টা করছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি*।[৫] সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য, এই সত্য যেমন তিনি বিশ্বাস করেছেন, তেমনি তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে সেই আক্রমণের যথাযোগ্য উত্তর দিতে ত্রুটি করবে না শ্রমিক-কৃষকের প্রজাতন্ত্র। কিন্তু তিনি চাইছেন, স্বচক্ষে তাকে দেখে আসতে। রবীন্দ্রনাথ দেখে এসেছেন, সম্প্রতি এইচ. জি. ওয়েলস দেখে এলেন, স্তালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে রলাঁ প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। গোর্কি তাঁকে বারবার ডাকছেন, সোভিয়েত লেখক সংঘ (তিন বছর আগেই তিনি যার নির্বাচিত সম্মানিত সদস্য), ভোক্স আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য প্রতিকূল।[৬]

এ সময়ে তিনি কর্মযোগে এমননি আত্মস্থ, সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়তায়, এতোটাই আত্মনিয়োজিত যে, ধর্মের, শিল্পের বিমূর্ত কোনো চিন্তাই তাঁর মনে সাড়া ফেলতে পারেনি। সেই কবে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন (অগাস্ট ১৯৩২), তারপর আর লেখার অবকাশই ঘটেনি। অথচ দেখা যায়, ১৯৩২ সাল থেকে প্রায় প্রতি মাসে তিনি চিঠি লিখে চলেছেন গোর্কিকে।[৭] তিনি জানতে চান, বুঝতে চান, দেখতে চান সোভিয়েত রাশিয়াকে, স্তালিনকে, সোভিয়েত রাজনীতি-রণনীতি—তার কর্মোদ্যোগকে, সক্রিয়তার প্রাণবন্যাকে।

"*আর্ত-পীড়িতই আমার ঈশ্বর*"—বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণী তাঁর পত্রে, প্রবন্ধে বীজমন্ত্রের মতো বহুক্ষেত্রে উচ্চারিত হলেও এবং তাঁর সক্রিয়তাকে প্রণোদিত করলেও, এ সময়ে দর্শনগত কোনো বির্মূত ভাবনারও নিদর্শন নেই, রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কিত সংবাদ জানার আগের মতো তেমন যেন আগ্রহ নেই। গান্ধীজি ও মাডলিন শ্লেডের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপেও প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অতিরিক্ত কিছু নেই। জানুয়ারি মাসে এসেছিলেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রায় সাড়ে চার বছর আগে, রাশিয়ার পথে জেনিভায়, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সেক্রেটারি হিশেবে রলাঁ তাঁকে দেখেছিলেন (১৬ বছরের অমিয়চন্দ্র ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রলাঁকে চিঠি লিখেছিলেন *জাঁ ক্রিস্তফ* পড়ে,[৮] সে কথাও রলাঁর মনে ছিল।) তাঁর সঙ্গে যে-আলোচনা হয়েছিল তাতে ছিল শুধুই বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন-পীড়নের প্রসঙ্গ: গান্ধীজির মানসিক তারুণ্যের অভাব, জহরলাল-আবদুল গফফর খানের গ্রেপ্তার ইত্যাদি; এমনকি ভারতে কম্যুনিজমের বিস্তার,

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত আলোচনার বিষয় ছিল। এপ্রিলে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু: তাঁর ক্ষেত্রেও ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং কর্তব্য-অকর্তব্যই ছিল একমাত্র আলোচ্য বস্তু।[৯] সামাজিক বা রাজনৈতিক সক্রিয়তার এমন তীব্র প্রখর একমুখী মনস্কতা আগে আর কখনো তাঁর দেখা যায়নি। এমন সময়েই এসেছিলেন স্বামী যতীশ্বরানন্দ (১ মে ১৯৩৫)। স্বামী বিজয়ানন্দের পর (১২ অক্টোবর ১৯৩২) তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় প্রতিনিধি, (তাঁর ভাষায় *শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় প্রজন্ম*) ভিলন্যভে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

স্বামী বিজয়ানন্দের মতোই স্বামী যতীশ্বরানন্দ সম্পর্কেও রলাঁ অকরুণ কঠোর মন্তব্য করেছেন। স্বামী যতীশ্বরানন্দ মিস ম্যাকলাউডের আনুকূল্যে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠানো মধ্য ইউরোপের প্রথম ভারপ্রাপ্ত নিয়মিত প্রচারক। ১৯৩৩ সালের নভেম্বর থেকে তিনি আছেন জার্মানির ভিয়েৎসবাডেনে (Wiesbaden); জার্মানি ছাড়াও, ইতিমধ্যে তিনি এমন কি সুইট্‌জারল্যান্ড ও পোল্যান্ড ঘুরে এসেছেন বেদান্ত সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে। কিন্তু রলাঁ তিক্ত মন্তব্য করেছেন: "তিনি যে আছেন তখনো তার লক্ষণই আমাকে দেখাননি। (sans m'avoir donné signe de vie)।" তিনি স্পষ্ট লিখলেন: "তাঁর সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা হলো না"। তরুণ, চটপটে, বেশভূষায় পরিপাটি, কথাবার্তায় চটুল (au parler leste) ও ভাসাভাসা (superficiel) ব্যক্তিটিকে দেখে মনে হলো অদ্ভুতভাবে তিনি তাঁর ব্রত সম্পন্ন করবেন। তাঁকে দু'মাসের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতনদের লিখেছেন যে, তিনি আরও ছ'বছর থাকতে পারেন। আমি তা ভালো করেই জানি! নিজেকে কষ্ট দেবার মধ্যে তিনি নেই (It n'en se foule pas)। তাঁর কাজকর্ম মনে হয়, ভালো ভালো হোটেলে কিংবা স্নব্ ও "স্বামীজি-গেলা" (gobe-Swamis) জাতের বদান্য গৃহস্বামীদের বাড়িতে বাড়িতে—আসকোনায়, ভিয়েৎসবাডেনে শুয়ে-বসে কাটানো (se depenser en flânries)। তিনি জার্মানির গ্লাজেনাপ (Glasenapp) কিংবা রুডলফ অটোর মতো একজনও ভারতবিদ্যার বড়ো অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কষ্ট স্বীকার করেননি; তাঁদের "শিক্ষাকেন্দ্রগুলো" (Séminaires) জার্মান ভাষায় বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলি অনুবাদের ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয়

সাহায্য ভালোভাবেই করতে পারত,—এ কাজটার ভার তাঁর উপরেই আছে। বেশি আর কি, ভারতবর্ষের প্রকৃত সুহৃদ ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারী যাবার চেষ্টা এখনো তিনি করেন নি। এড়ানোর ভঙ্গি করে, তিনি বললেন: তিনি সেখানে যাবেন যখন তাঁর ভবিতব্য তাঁকে সেখানে ডাকবে। ও কায়দা (truc) আমার জানা আছে! ওতে আমি ভুলি না। (It ne me prend pâs) : তাঁর ভবিতব্য (destin), *সে তো তাঁর মর্জি* (c'est son bon plaisir)।"[১০]

রলাঁ তাঁর দিনলিপিতে স্বামী যতীশ্বরানন্দের প্রসঙ্গটি, স্বামী বিজয়ানন্দের প্রসঙ্গের তুলনায়, খুবই অল্প কথায় লিখে রেখেছেন। স্বামী বিজয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক, বিতর্কের বিষয়, কটু মন্তব্য, তিরস্কার সব কিছুরই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজয়ানন্দ সেদিন ছিলেন রলাঁর অতিথি, বিতর্কের কাল পরিমাণও ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ। অতিথিকে সামনাসামনি তিরস্কারের জন্যে রলাঁ যেমন দুঃখবোধ করেছিলেন, বাচালতার জন্যে বিজয়ানন্দও তেমনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। অবশ্য রলাঁ তাঁর প্রত্যক্ষ মন্তব্য সংশোধন তো করেনইনি, বরং পরোক্ষে আরও কঠোর মন্তব্য লিখে রেখেছেন। কিন্তু যতীশ্বরানন্দের ক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয়গুলো অনুমানসাপেক্ষ, মন্তব্যগুলো পরোক্ষ, আলাপচারির সময় যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সংক্ষিপ্ত কঠোর তিক্ত মন্তব্যগুলোও। তার কারণ আলাপচারিতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি, না অন্য কোনো কিছু?

স্বামী যতীশ্বরানন্দের সেদিনের সঙ্গী পল গেহিব ছিলেন ফ্রাংকফুর্টের কাছে ওডেনভাল্টের অলউইন ফন কেলেরের আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের (Odenwaldschule) সঙ্গে সম্পর্কিত। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যালয়টি জার্মানিতে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, সেটি বছর খানেক আগে নতুন করে খোলা হয়েছে জেনিভায় এবং জনা পঞ্চাশেক ছাত্র নিয়ে তা ভালোই চলছে। সেদিনকার আলাপচারিতে ফ্যাসিবাদের প্রসঙ্গও উঠেছিল। অবশ্য দুজনের কথাবার্তাতে ফ্যাসিবাদের প্রতি, বিশেষ করে জার্মানির ফ্যাসিবাদের প্রতি, কোনো সহানুভূতি ছিল না; সর্বত্র তাঁদের চোখে যা পড়েছে তা একটা নৈতিক আতঙ্কের পরিবেশ। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, স্বামী যতীশ্বরানন্দ ইউরোপের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অনবহিত বা উদাসীন

ছিলেন।

স্বামী যতীশ্বরানন্দ আরও আড়াই বছর পর (নভেম্বর ১৯৩৪) *বেদান্ত ওয়ার্ক ইন সেন্ট্রাল ইউরোপ* শীর্ষক একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন, সেটি ছাপা হয়েছিল *প্রবুদ্ধ ভারত*-এ।[১১] তাতে তিনি তাঁর চার বছরের (১৯৩৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত) বেদান্ত প্রচারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জার্মানির ভিয়েৎসবাডেনকে কেন্দ্র করে তিনি কিছু ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ করেছেন, জার্মানির কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শহরে গিয়েছেন; পরে গিয়েছেন সুইট্‌জারল্যান্ডে, পোল্যান্ডে; জেনিভায়, সেন্ট মরিৎসে এবং জুরিখে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেসব জায়গায় তিনি বেদান্ত, প্রচারের প্রথম প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেছেন, কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন বৃত্তির সত্যানুসন্ধানী মানুষদের সংস্পর্শে এসেছেন। সুইট্‌জারল্যান্ডে ঘোরার সময়ে তিনি মে মাসে ভিলন্যভে এসেছিলেন রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

স্বামী যতীশ্বরানন্দের প্রতিবেদনটিতে মধ্য ইউরোপে বেদান্ত প্রচারের কালটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: এই সময়ের মধ্যে ঘটেছে জার্মানিতে রাইখস্টাগের অগ্নিকান্ডের ঐতিহাসিক বিচার পর্ব (ডিসেম্বর ১৯৩৩); অস্ট্রিয়ায় ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ ও ভিয়েনায় শ্রমিক শ্রেণীর রক্তাক্ত প্রতিরোধ (জানুয়ারি ১৯৩৪); স্পেনের বার্সেলোনা ও আস্তুরিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান (অক্টোবর ১৯৩৪); মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণ (অক্টোবর ১৯৩৫); স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের বিজয় ও গৃহযুদ্ধ শুরু (ফেব্রুয়ারি-জুলাই ১৯৩৬); ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টের জয় (মে ১৯৩৬); বের্লিনে হিটলার ও মুসোলিনির মৈত্রী চুক্তি (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)। ইউরোপ সেই সময়টিতে জ্বালামুখী আগ্নেয়গিরির মতো টগবগ করে ফুটছে, খাস জার্মানিতে বুদ্ধিজীবীদের বিতাড়ন পর্ব চরমে উঠেছে। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার মরণপণ সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ মহলা শুরু হয়ে গিয়েছে। বেদান্ত-প্রচারক স্বামী যতীশ্বরানন্দের প্রতিবেদনে সেই ইউরোপের চিহ্নমাত্র নেই। ইউরোপের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আসন্ন সর্বনাশের পদধ্বনিতে নির্বিকার থেকে বেদান্তের "পরম সত্য" প্রচারে ব্রতী যতীশ্বরানন্দ আত্মস্থ থাকতে পারেন, কিন্তু রলাঁর ক্ষেত্রে সেই আত্মস্থতা সম্ভবই ছিল না। তাৎক্ষণিক ও অনন্তকে

মেলানোই ছিল তাঁর ব্রত, যে ব্রতের অঙ্গীকারের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের জীবনে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামী যতীশ্বরানন্দ তাঁর বেদান্ত-প্রচারের চার বছরের প্রতিবেদনে যদিও লিখেছেন: রামকৃষ্ণের নামে পরিচিত আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষার বাণী ফরাসী-ভাষী জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে *রম্যাঁ রলাঁর নবযুগ সৃষ্টিকারী* রচনার মাধ্যমে, কিন্তু তিনি যে ১৯৩৫ সালের ১ মে রলাঁর বাসভবনে আলাপ করতে গিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি।

ভিলন্যভে সাক্ষাৎকালে তাঁর দেড় বছরের কাজের খতিয়ান রলাঁর কাছে প্রচারকের সক্রিয়তার অভাব বলেই মনে হয়েছিল। ১৯৩২ সালের শেষে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান হয়েছিলেন "একজন ভারতবিদ্যাবিদ", তিনি সংস্কৃতজ্ঞ কোনো ভারতীয়ের খোঁজে ছিলেন, সেই কারণেই ১৯৩২ সালের অক্টোবরে রামকৃষ্ণমিশনের কোনো সংস্কৃতজ্ঞ প্রচারককে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন শ্রীমতী ফন কেলের এবং শ্রীমতী ভালমান; সেই প্রস্তাব মিস ম্যাকলাউড বশী সেনকে জানিয়ে সেই কাজের জন্যে বিজয়ানন্দকে পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন।[১২] মিস ম্যাকলাউডের অর্থানুকূল্যে স্বামী বিজয়ানন্দ এলেও সে আশা পূর্ণ হয়নি; পরের বছর নিয়মিত প্রচারক রূপে স্বামী যতীশ্বরানন্দ এলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যাবিদদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই গড়ে তুলতে পারেননি বা তোলার চেষ্টা করেননি। কাজের পদ্ধতি ও পরিণাম দেখে রলাঁর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যতীশ্বরানন্দ শ্রমকুণ্ঠ নিরুদ্যোগ প্রকৃতির প্রচারক, তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত উৎসাহের অভাব। এইজন্যেই রলাঁর মন্তব্য: "তিনি যে আছেন তখনো তার লক্ষণই আমাকে দেখাননি।" সেই সময়ে সুইট্জারল্যান্ডে এসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচারকের রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা না-করাটাই বিস্ময়কর।

তরুণ স্বামীজির সঙ্গে রলাঁর অবশ্যই বেশ কিছু কথাবার্তা হয়েছিল, যার ফলে রলাঁ তাঁর জ্ঞানবত্তার পরিমাপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। একোল নর্মালের ছাত্র, ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রম্যাঁ রলাঁর কাছে পরীক্ষায় তরুণ স্বামীজি উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাই পরীক্ষকের অকরুণ মন্তব্য: "কথাবার্তায় হালকা, ভাসা-ভাসা"। তাঁর জ্ঞানবত্তা ও প্রচার-কুশলতায় রলাঁর

বিশ্বাস নিশ্চিত হতে পারেনি। তাঁর মনে হয়েছিল যতীশ্বরানন্দের পক্ষে বিবেকানন্দের বাণী ও দর্শন প্রচারের ব্রতে সফল হওয়া কঠিন। আর ইউরোপীয় স্নব, ''স্বামীজি-গেলা'' বদান্য গৃহস্বামিনীদের চরিত্র রলাঁ ভালো করেই জানতেন। তাঁদের দাক্ষিণ্যে ও বদান্যতায়, আদরে-আপ্যায়নে, ভালো ভালো হোটেলে দিনযাপনে, প্রচারকের অত্যুগ্র উৎসাহেও যে ভাঁটা পড়তে বাধ্য তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জাঁ ক্রিসতফ-এর স্রষ্টা রম্যাঁ রলাঁর মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দেশদেশান্তরের কতো বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর আলাপচারি। স্বামী যতীশ্বরানন্দের চরিত্র-বিচারে রলাঁর মন্তব্যগুলোকে অসতর্ক উক্তির অথবা ভ্রান্ত ধারণার তাৎক্ষণিক প্রকাশ বলে মানাও অসম্ভব। তিনি জানতেন, ইউরোপে ভারতীয় দর্শন যাঁরা প্রচার করতে আসেন তাঁদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাঁদের ক্ষেত্রে ভারতীয় ত্যাগ ও মুক্তিতত্ত্ব-দর্শন প্রচার করাটা এক ধরণের আধ্যাত্মিকতার অভিমান, দম্ভ ও উন্নাসিক মনোবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাঁদের একজনের মতোই আত্মতুষ্ট, আয়েসী মানসিকতার অধিকারী, বিপুল কর্মের জগৎ সম্পর্কে তখনো অনভিজ্ঞ তরুণ যতীশ্বরানন্দ,—ভারতবর্ষের সুহৃদ ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগযোগের জন্যে তখনো পর্যন্ত কেন পারী গিয়ে উঠতে পারেননি?—রলাঁর এই শাদামাটা প্রশ্নের উত্তরে যখন এড়িয়ে যাবার ভঙ্গি করে পরম দার্শনিকের মতো ''ভবিতব্যের''দোহাই দিয়েছিলেন, তখন,''পশ্চিমের রামকৃষ্ণপন্থী'' (le Ramakrishniste d' Occident) রম্যাঁ রলাঁর তিরস্কারের তর্জনি যে উদ্যত হয়ে উঠবে, সেটাই তো একান্ত স্বাভাবিক।

রম্যাঁ রলাঁ অবশেষে রাশিয়ার উদ্দেশে সস্ত্রীক যাত্রা করেছিলেন ১৭ জুন, ভিয়েনা-ওয়ারশ হয়ে মস্কোয় পৌঁছেছিলেন ২৩ জুন। ২৩-২৫ জুন পারীতে আন্তর্জাতিক লেখক-কংগ্রেসে উপস্থিত হবার কথা ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তিনি তা পারেননি, গ্রামের বাড়িতেই বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন। ক্রেমলিনে স্তালিনের সঙ্গে রলাঁর সাক্ষাৎকার হলো ২৮ জুন [১৩], ৩০ জুন স্তালিন ও অন্যান্য নেতৃবন্দের সঙ্গে মঞ্চে বসে জাতীয় ক্রীড়া-উৎসব দেখলেন। তারপর গোর্কির বাড়িতে রওনা দিলেন সেই দিনই।

সস্ত্রীক রলাঁ গোর্কির বাড়িতে ছিলেন ২২ জুলাই পর্যন্ত। সেখানে দীর্ঘ আলাপচারি হয়েছিল বুখারিনের সঙ্গে[১৪]; আবার দেখা হয়েছিল স্তালিনের সঙ্গে সান্ধ্য ভোজে, [১৫] সেখানে উপস্থিত ছিলেন মলোতভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ প্রভৃতি নেতারা। সেখানে এসেছেন লেনিনগ্রাদ থেকে, মস্কো থেকে লেখকেরা, পুদভকিন প্রমুখ চিত্রপরিচালকরা, সংগীতজ্ঞরা; এলিয়াভার নেতৃত্বে জর্জিয়ার নৃত্যশিল্পীরা। অপরাধীদের সংশোধন কার্যক্রমের অধিকর্তা ও অগপু-র প্রাক্তন কর্তা ইয়াগোদার মুখে অপরাধ, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা শুনেছেন; সোভিয়েতের ভালোমন্দ অসংখ্য ফিল্ম দেখেছেন, বলশেভোদের নাচ দেখেছেন, গান শুনেছেন। মস্কোভা থেকে ভলগা পর্যন্ত খালকাটার ইতিহাস শুনেছেন ফিরিনের মুখে, আর দিনের পর দিন বিশ্রম্ভালাপ করেছেন গোর্কির সঙ্গে। অবশেষে জয়ধ্বনি, সংবর্ধনা, প্রীতি ও শুভেচ্ছায় অভিভূত হয়ে রলাঁ মস্কো ছেড়েছেন ২১ জুলাই। পথে পোল্যান্ডে গোর্কির সেক্রেটারি সহযাত্রী ক্রুচ্‌কোভের মুখে শুনেছেন গোর্কির জীবনের অজানা অধ্যায়, পোদ্‌ভোলস্কির মুখে পোল্যান্ডের কথা। ওয়ারশয় দেখা হয়েছিল মস্কোযাত্রী বারব্যুসের সঙ্গে (সেই শেষ দেখা)।[১৬] ভিয়েনায় তখন ডলফ্যাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে, যে ফ্যাসিস্ট চ্যান্সেলর গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রক্তের বন্যায় ডুবিয়েছিলেন এই ভিয়েনাতেই শ্রমিক অভ্যুত্থানকে। ১৫ জুলাই তাঁকে খুন করা হয় হিটলারের নির্দেশে। অবশেষে ২৮ জুলাই রলাঁরা এসে পৌঁছেছিলেন ভিলন্যভে।

স্তালিন-রলাঁ সাক্ষরিত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো না।[১৭] রলাঁ তাঁর দিনলিপিও প্রকাশ করলেন না। কেবল একটি মাত্র প্রবন্ধের কিছু অংশ প্রকাশ করলেন *কম্যুন* পত্রিকায় (অক্টোবর)। তাতে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে লিখলেন: "আমার মধ্যে প্রধানতম যে ধারণাটি স্থায়ী হয়ে আছে, তা হচ্ছে তরতাজা, উপচে-পড়া শক্তির চেতনায়, তার সাফল্যের গর্বে, তার বিশ্বাস এবং তার নেতাদের প্রতি আস্থায় উদ্ভাসিত, জীবনীশক্তির গতিবেগ.....।" তিনি সোজাসুজি লিখলেন: "স্তালিন ও তাঁর প্রধান বলশেভিক সহযোগীদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে আশাবাদ,—নিঃসন্দেহে তা মোহমুক্ত কিন্তু ভয়শূন্য..... ।[১৮] সোভিয়েত যুক্ত-প্রজাতন্ত্রের ভালো-মন্দ বিচার করে তিনি এই মত ব্যক্ত করলেন: "আমি কখনো ভাবিনি, এই বিপ্লব এক ধাক্কাতেই মানবিক সাম্য

এবং শ্রেণীহীন সমাজ বাস্তব করে তুলতে পারবে। প্রতিটি বিপ্লব (এবং এই বিপ্লবই শেষ বিপ্লব হতে পারে না, কিংবা মানবতা তার এগিয়ে-চলা থামিয়ে দেবে), সেই মহান আদর্শের দিকে এগিয়ে চলার একটা ধাপ। সোভিয়েত বিপ্লব সেই লক্ষ্যের দিকে মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিমান পদযাত্রা হয়ে থাকবে।"[১৯] তিনি আরও লিখলেন যে, সেই জন্যে তার পরিণাম সম্পর্কে তিনি খুব উদ্বিগ্ন নন;—"অন্তত একটি কি দু'টি, মেরে-কেটে তিনটি প্রজন্মের (d'une ou de deux générations, à la rigueur de trois) জীবদ্দশায়, যতো দিন পর্যন্ত বজায় থাকবে অক্টোবরের মহান বলশেভিক সংগ্রামীদের বীরোচিত শ্রদ্ধা-সম্মানের বোধটি (le sens de l'honneur héroïque) —ততোদিন সে টিকবে।"[২০] সর্বশেষ তিনি লিখলেন: "আমি নিশ্চিত যে, সে কাউকে আক্রমণ করবে না।........তাকে যে আক্রমণ করবে, হুঁশিয়ার! আক্রমণ গড়ে তুলবে সংগ্রামী ঐক্য......পৃথিবীর কোনো দেশ এতো বেশি উগ্রভাবে প্রতিরোধ করবে না।"[২১]

ওদিকে মুসোলিনির সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে (অক্টোবর ১৯৩৫) আবিসিনিয়ায়। স্পেনে ও ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ সফল হতে চলেছে। অক্টোবরে জহরলাল নেহেরু এসেছিলেন ভিলন্যভে, ব্যাডেন-হেুইলে চিকিৎসার জন্যে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন একটি ক্লিনিকে, মেয়েকে রেখে যাচ্ছেন একটা বোর্ডিঙে। রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন (২০ নভেম্বর) *যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিশ্ব-কমিটির*-র নাম-ছাপানো চিঠির কাগজে, সেই কমিটিতে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তির সম্মতি প্রার্থনা করে।[২২] "প্রতিবেশী দেশে এবং আমাদের দেশে যতো দিন না ফ্যাসিবাদ চূর্ণ হয়, ততো দিন আমাদের ঘুম নেই। Delenda est Carthago..." এই সময় মিস ম্যাকলাউড জাঁ-এরবেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলির ফরাসী অনুবাদ করতে। সেই সূত্রে স্বভাবতই তিনি একাজে উপদেশ ও পরামর্শ চেয়ে রলাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (ডিসেম্বর ১৯৩৫):

প্রিয় মহাশয়,

আমি আনন্দিত যে, আপনার যত্নে, বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ বাণী ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সংকটের এই বহুপ্রসূ অথচ বেদনাকরুণ যুগে তাকে তার অনেক কিছু দেবার আছে। এ-

যুগের বহু উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার এ উত্তর দেয়।

সব কিছুর আগে, এ যুক্তিতে বিশ্বাস আনে। এ সেই সব ধর্মীয় চিন্তা নয়, আলোয় চোখ মিটমিট-করে যারা "বিশ্বাসে মিলয়ে......তর্কে বহু দূর"-এর (credo quia absurdum) মধ্যে আশ্রয় নেয়। এ হচ্ছে মনের ঋজুতা এবং শক্তির বিশ্বাস.......

"*মানুষের মহিমা তার চিন্তার মধ্যে।*"

তাছাড়া, তার এই ঔদার্য আছে যে, সত্যের সন্ধানের বিচিত্র বিবিধ রূপের কোনোটিকেই এ বাতিল করে না। এসকলকে স্বীকার করে এবং তাদের ভ্রাতৃত্বভরে আলিঙ্গন করে। এ মনের এক বিশ্বজনীনতা, যার মধ্যে মিলেমিশে ও সহযোগী হয়ে থাকে বিজ্ঞান ও ধর্ম: আন্তরিক ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরদর্শী। এর একমাত্র শত্রু অসিহষ্ণুতা।

আমাদের মানুষকে যুগের যেসব সমস্যা উত্তেজিত ও বিভক্ত করছে, তার একটির ক্ষেত্রে এ অপেক্ষিত উত্তর: সে-সমস্যাটি সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন! "*মানুষের যথার্থ প্রকৃতি*" (La Nature réelle de l'Homme) আবার পড়তে পড়তে মুগ্ধ প্রশংসা করছিলাম,ভারতীয় ভবিষ্যদ্বক্তার স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (l'intuition), অজান্তেই, কেমন করে কম্যুনিজমের মহান ব্যাখ্যাতাদের পৌরুষব্যঞ্জক যুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে:—মার্কস ও লেনিন বিবেকানন্দের এই মহৎ বাণীটি দাবি করতে পারতেন: —"*একমাত্র সে-ই বাঁচে যে সকলের মধ্যে বাঁচে।*"

এরাঁ দু'পক্ষই যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে লড়েন, তা লড়েন বড়ো করে-তোলা ব্যক্তিস্বরূপের (Individualité) নামে। বিবেকানন্দ বলেছেন: "*যখন পরমের কথা বলা হয়, লোকে আতঙ্কিত হয়। তারা জিজ্ঞাসা করে:—কিন্তু আমার ব্যক্তিস্বরূপের কী পরিণাম হবে?.....তাদের ব্যক্তিস্বরূপ বস্তুটি তাহলে কী? সেটা দেখতে চাই.....ব্যক্তিস্বরূপ বলে কিছুই নেই......আমরা এখনো কেউ ব্যক্তি নই। আমরা ব্যক্তিস্বরূপের দিকে যাবার প্রয়াস করি।—আর সেটা, এই পরম, এ-ই আমাদের যথার্থ প্রকৃতি। সে-ই একমাত্র বাঁচে, যে সকলের মধ্যে বাঁচে, যে সকলের মধ্যে বাঁচে.....তারাই আমাদের সত্য-*

জীবনের একমাত্র মুহূর্ত (nos seuls moments de vraie vie) যখন আমরা বাঁচি সকলের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে.......

মহান স্বামী মানুষ ও পরম সত্তার আলাপন (la communion) উপলব্ধি করেছেন নিজেদের মধ্যে, বিশ্বজনীন ঐক্যে,—সত্যে, যা বাঁচে এবং যা সক্রিয় হয়;

"*.........সত্য! তারই সঙ্গে যেন এক হই।........*"

কিংবা, তা যদি না পারো, শুধু সেইসব স্বপ্নই দেখো যারা তাদের কাছে এগিয়ে যায়ঃ

যারা অনন্ত প্রেম এবং নিঃশর্ত সেবা (le libre service)

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেনে বিজয়ী হলো পপুলার ফ্রন্ট (Frente Popular),—কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, এ্যানার্কিস্ট, ত্রৎস্কিপন্থী ইত্যাদি সমবেত বামশক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান। ২৭ ফেব্রুয়ারি এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় যকৃতের অস্ত্রোপচার করিয়ে। ১৮ মার্চ অস্ট্রিয়া থেকে সুভাষচন্দ্রের চিঠি পেলেন রলাঁ, ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসাল তাঁকে জানিয়েছেন, দেশে ফিরলেই সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবেন, কিন্তু তবু তিনি ফিরে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর সমর্থনের অঙ্গীকার জানিয়ে রলাঁ তাঁর চিঠির উত্তর দিলেন। কিন্তু তাঁর মন চায়নি সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে বন্দী হয়ে থাকেন, ইউরোপে থাকলেই যেন তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্যে বেশি ভালো কাজ করতে পারতেন।[২৪]

এই ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম জন্মশত বার্ষিকী বেলুড় মঠে উদ্‌যাপিত হলো মহাসমারোহে।[২৫] সকাল থেকে বৈদিক মন্ত্রপাঠে ও ভক্তিসংগীতে মুখর হয়ে উঠল বেলুড় মঠ। মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজো ও গঙ্গার ধারে বিশেষভাবে তৈরি করা বেদিতে হোমের অনুষ্ঠান করা হলো। রামকৃষ্ণের বিশাল প্রতিকৃতি ফুল-গাছ-ঝরনা সমেত তৈরী একটা পাহাড়ের গায়ে সাজিয়ে রাখা হলো। পাঁচঘন্টা ধরে খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীরা ধ্রুপদী কণ্ঠসংগীতের ও যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান করলেন। বিকেলে বক্তৃতাদি হলো। দুদিন পরে হলো কলকাতার টাউন হলে এক প্রকাশ্য জনসভা। প্রধান অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়ে রইল পরের বছরের গোড়ার দিকের জন্যে (১-১৪মার্চ

১৯৩৭)।

মিস ম্যাক্‌লাউড তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী ক্রুস্টারের সঙ্গে জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষেই ছিলেন; সেখান থেকে ইউরোপ যাত্রা করেন এবং পারীতে পৌঁছে যান রামকৃষ্ণজন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ৩০ মার্চের আগেই। সরবনের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক মাসন্যুর্সেল (Masson Ursel) রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ম্যুজে গ্যীমে-য় এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে সরবনের এ্যাঁসতিত্যু দ্য সিভিলিজাসিয়ঁ এ্যাঁদিয়ান-এ। মিস ম্যাকলাউড বশী সেনকে এক চিঠি লিখেছিলেন (১৬ এপ্রিল): "সরবনে ৩০ মার্চ স্বামীজি সম্পর্কে বক্তৃতা শুনলাম। তারপর পাঁচ মিনিটের জন্যে আমি বললাম ফরাসীতে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ পাঁচ মিনিট চমৎকার বললেন ইংরেজীতে।[২৬] আর তারপর দিনই জাঁ-এরবেরকে সঙ্গে নিয়ে মিস ম্যাকলাউড চলে এলেন জেনিভায়, সেখান থেকে ভিলন্যভে এলেন মাদলেন রলাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে যোগ দিতে। সেখানেই ঘন্টা খানেকের জন্যে দেখা হয়ে গেল রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে।[২৭]

রলাঁ লিখেছেন (৩ এপ্রিল): বিবেকানন্দের এই পুরনো বান্ধবীটি (la vieille amie) আসছেন ভারতবর্ষ থেকে, পারীতে সামান্য কয়েক দিনের জন্যে থেমেছিলেন সরবনে রামকৃষ্ণ-স্মরণ সভায় যোগ দেবার জন্যে। "তিনি তেমনি আছেন অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে (vivace), তেমনি হাসিখুশি হয়ে।" তিনি বেলুড়ের রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণ দেখেছেন। মিশনের নতুন অধ্যক্ষ স্বামী অখন্ডানন্দ আগের স্বামী শিবানন্দের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বামী শিবানন্দ ছিলেন স্নিগ্ধ, পবিত্র ও প্রশান্ত। স্বামী অখন্ডানন্দ নির্জনতা-প্রিয়, কঠোর নীতিপরায়ণ, উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী, বেশ কয়েক বছর তিব্বতে ছিলেন এবং এক সময়ে স্থায়ীভাবে বেলুড়ে থাকতে অস্বীকার করেছিলেন।

জাঁ-এরবের লিগ অব্ নেশনস-এর স্বীকৃত অনুবাদক, বর্ত্তমানে বিবেকানন্দের রচনাবলি ফরাসীতে অনুবাদের ভার নিয়েছেন। প্রকাশের আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছেন মিস ম্যাকলাউড। জাঁ-এরবের ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন। তিনি বললেন: সেখানে রম্যাঁ রলাঁর কী বিপুল জনপ্রিয়তা, যেসব ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাঁদের কাছে ফ্রান্স মানেই রম্যাঁ রলাঁর দেশ। সঙ্গে সঙ্গে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর বইগুলো ইউরোপের এবং বিশেষ

করে, ফ্রান্সের মনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া, তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে পারে আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদদের সম্পর্কে তাঁর বইগুলোয় আরও কিছু যোগ করার জন্যে।[২৮]

রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কে জাঁ-এবরের জানালেন, মিশন সর্বত্র সামাজিক সেবাকার্য: স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি চালাচ্ছে। মঠের নতুন অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তিনি বৃদ্ধ এবং একাকী থাকেন।

এর পরই জাঁ-এরবেরকে ২০ এপ্রিলে লেখা রলাঁর একটি চিঠির সন্ধান মিলেছে।[২৯] [পরিশিষ্ট দেখুন-'গ'] কিন্তু জাঁ-এরবেরের যে-চিঠির উত্তর সেই চিঠিটি পাওয়া যায়নি। চিঠিতে রলাঁ লিখেছেন, জাঁ-এরবেরের চিঠি যখন পেয়েছিলেন তখন তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাশায়ী। তবু জাঁ-এরবের যে অনুবাদটি পাঠিয়েছিলেন সেটি চমৎকার মনে হয়েছে এবং জ্বরের দাপট কমা-বাড়ার মাঝখানে নতুন করে প্রতিলিপি করার (retranscrire) সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। জাঁ-এরবের যে অনুবাদটি পাঠিয়েছিলেন, তা যে *ওয়ার্ডস অব দা মাস্টার* গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ *লাঁসেইএ্ঞমাঁ দ্য রামকৃষ্ণ* তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু রলাঁ যখন লিখছেন: "এ কাজ শেষ হবার পরেই শুধু আমি দেখতে পেলাম, আপনি যেন আমার কাছে আশা করে থাকবেন যে, আমি পাঠটি (le texte) ১৯৩৬ সালের সংস্করণের উপযোগী করে দিই (adaptasse)। এখন নতুন করে কপি-করা শুরু করতে পারার পক্ষে আমি বড়োই শ্রান্ত।"—তখন বুঝতে অসুবিধে হয় "১৯৩৬ সালের ফরাসী সংস্করণ" বলতে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, "পাঠ" বলতেই বা কী বোঝাচ্ছে, কী ভাবেই বা তা উপযোগী করে দিতে পারেন এবং যা করতে গেলে তাঁকে আবার কপি করা শুরু করতে হবে? আর, কাজটা না-করতে পারার জন্যে অসুস্থতা এবং শারীরিক শ্রান্তির অজুহাত দিলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন:

> *আরও বলছি, ১৯৩০ সাল থেকে আমার চিন্তার বিবর্তন হয়েছে; আমাকে সামাজিক কর্মে নামতে হয়েছিল: এটা আমার নৈতিক প্রয়োজন। আর আমার মনের এলাকাটি,—যেখানে আমি সব কিছু বুঝতে, সব কিছু আলিঙ্গন করতে প্রয়াস করি,—যদি যথেষ্ট বজায় রেখে থাকি, কর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান না-করা"*

(ne rien rejetcr) এবং "যা-কিছু আছে তাদের সব কিছুকে ভালোবাসা" (d'aimer tout ce qui existe) অসম্ভব: যা-কিছু অমঙ্গলকর তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সামাজিক জীবনের সমুন্নতিতে যা-কিছু বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাই সংশোধন না-করে ১৯৩০ সালের লেখাটি ১৯৩৬ সালের উপযোগী করে লিখতে পারব না।

এক্ষেত্রে অজুহাতটা শারীরিক নয়, অনৌচিত্যের বা নৈতিকতার। কিন্তু ১৯৩০ সালের কোন লেখাটির কথা তিনি বলছেন এখানে তা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি লিখেছেন: "রামকৃষ্ণপন্থী বিষয়—যা আমার আজকের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করে, তা: "*জীবই শিব*"; এটি লিখেছি রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এবং রামকৃষ্ণমিশন তাঁদের শতবার্ষিকী গ্রন্থে তা প্রকাশ করেছেন।" [পরিশিষ্ট দেখুন] পরিশেষে যা লিখেছেন, তাতে অবশ্য বুঝে নেওয়া চলে কোন লেখাটি এখানে উদ্দিষ্ট। রলাঁ লিখেছেন: "আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি ১৯৩০ সালের শ্রীমতী ই. ফন পেলেটের গ্রন্থের আমার ভূমিকাটিই ছাপবেন। নয়তো আপনি যে-ভূমিকা লিখবেন তাতে এর অংশ ব্যবহার করতে পারেন। এই সব কৈফিয়ৎ সংক্ষেপে দেবার জন্যে ক্ষমা করবেন.......।" —এতোক্ষণ পরে স্পষ্ট হয় যে, জাঁ-এরবেরের জন্যে মনোগত অভিলাষ ছিল রলাঁ যেন তাঁর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিতব্য *ওয়ার্ডস অব দা মাস্টার* গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের জন্যে শ্রীমতী পেলেটের জার্মান অনুবাদের ভূমিকাটি [পরিশিষ্ট দেখুন] ১৯৩৬ সালের উপযোগী করে লিখে দেন। জাঁ-এরবেরের চিঠিটির অনুপস্থিতি, রলাঁর অসুস্থতা, মানসিকতার পরিবর্তন, সর্বোপরি সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্যে চিঠিখানির অর্থবোধে বাধা সৃষ্টি করে।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি থেকে রম্যাঁ রলাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাকর, ক্লান্তিকর, উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিক্ষোভিত সংগ্রামের পর্ব। জুন মাসে তিনি গোর্কির মৃত্যু সংবাদ পেলেন। রলাঁ শোকে বিমূঢ় হলেন। জুলাইতে শুরু হয়ে গেল স্পেনে ফ্রাংকোর অভিযান। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করল। রলাঁ আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আকুল আবেদন জানালেন। অগাস্টের শেষে সংবাদ পেলেন প্রথম মস্কো-মামলায়

জিনোভিয়েভ, ক্যামেনভ এবং তেরো জনকে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় দন্ডাদেশের পরদিনই গুলি করে মারা হয়েছে। রলাঁ অনুভব করলেন সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি, যা ১৭৯৪ সালে প্রাজ্ঞ রিপাবলিকানদের মনে জেগেছিল দাঁতঁ-র গিলোটিনের পর থেকে। তিনি মস্কো-মামলার বিবরণ, নথিপত্র, বিদেশী সাংবাদিকদের প্রতিবেদন পড়লেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে ষড়যন্ত্রের অপরাধে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। কিন্তু দন্ডদানের পদ্ধতিতে সমর্থন জানাতে পারলেন না।[৩০] এদিকে স্পেনের যুদ্ধ চলছে, মাদ্রিদ দখলের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। অক্টোবরে মাদ্রিদে এসে পড়েছে রুশ অস্ত্রসম্ভার, আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী স্পেনে পাঠাবার উদ্যোগ চলছে। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা প্রতিক্রিয়ার চাপে নিরপেক্ষতা স্বীকার করেছে। রলাঁ নিরবচ্ছিন্ন নিন্দা করে চলেছেন নিরপেক্ষ নীতির এবং স্পেনে, জার্মানিতে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার।

নভেম্বর মাসে দেবদাস গান্ধী ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে *দা হিন্দুস্থান টাইম*-এর জন্যে রলাঁর কাছে একটি প্রবন্ধ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। রলাঁর বিমান ডাকে তার উত্তরে (২ ডিসেম্বর) লিখেছিলেন:

> প্রিয় বন্ধু,—আমি ভারতবর্ষকে কতোখানি ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি, তা আপনি জানেন। জগতের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মহান অগ্রজের স্থান তাকে আবার নিতে হবে, সেটাই হবে তার স্থান। আমি উদগ্র প্রার্থনা জানাই, যাতে সে তার জাতীয় স্বাধীনতা আবার জয় করে নিতে পারে ও সামাজিক প্রগতি বাস্তবায়িত করতে পারে,এতো দীর্ঘকালব্যাপী বলিপ্রদত্ত তার বিশাল জাতির তাতেই তো অধিকার। আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনি তারই প্রকাশকে ভারতীয় জনগণ ও কংগ্রেসের কাছে পৌঁছে দেবেন, আপনাকে এই আমার অনুরোধ।[৩১]

সেই মুহূর্তে প্রার্থিত প্রবন্ধটি তিনি লিখে উঠতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে আরও লিখেছিলেন: স্পেনের ট্রাজিক ঘটনাবলিতে এবং সমগ্র পশ্চিম জগতের—সমগ্র ইউরোপের সামনে সমুদ্যত যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায়, দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপ তাঁদের সমস্ত শক্তি আবিষ্ট হয়ে আছে। মাদ্রিদের নিধনযজ্ঞের বলিদের সাহায্যের জন্যে সমস্ত জাতিকে তিনি সদ্য যে আবেদন

জানিয়েছেন তারই একটা প্রতিলিপি পাঠাচ্ছেন। যার চাপে ইউরোপ আজ ডুবছে, সেই উন্মত্ততা ও অপরাধের দৃশ্যাবলি দেখে ভারতবর্ষ, অন্তত যেন, নিজে শিক্ষা নিতে পারে, সেটাই প্রয়োজন। "সেটাই প্রয়োজন যে, সে যেন সাম্রাজ্যবাদী ও জাতিগর্বী ফ্যাসিবাদের মারাত্মক বিপদকে দেখতে পায়, আজ সর্বত্র তারা যুদ্ধের মশাল বয়ে নিয়ে চলেছে এবং সমস্ত স্বাধীনতাকে চূর্ণ করেছে। গোটা দুনিয়াকে পদানত করার কমে তারা তুষ্ট হবে না, তাদের প্যাঁচালো ও হিংস্র রাজনীতির (politique tortueuse et rapace) হাত থেকে ভারতবর্ষের বাঁচার কোনো আড়াল নেই। জার্মান-ইতালীয়-জাপানী-প্যাক্টের দিকে নজর রাখুন!"—রলাঁ সেইসঙ্গে একথাও জানিয়েছিলেন যে, গত দু'বছর ধরে তাঁরা ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ঝগড়া স্বেচ্ছায় মুলতুবি রেখেছেন। ভারতবর্ষও যেন তেমনটি করে। এই তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ।

দুদিন পরে, রলাঁ এলাহাবাদ স্বরাজ ভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেসে কমিটির বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি রামমনোহর লোহিয়াকে অন্য একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। তাতেও নিকট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের আশা ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন: 'ইউরোপের জাতিগুলোর (পপুলার ফ্রন্টগুলোর) আজকের এই মুহূর্তের নীতির মূল সুর হলো:—'খাদ্য, শান্তি ও স্বাধীনতা'। ভারতের জনগণের মুখে এই ধ্বনি কতো বেশি সত্য, কতো বেশি জরুরি!........আপনারা যারা আবিসিনিয়ার ইতালীয় আগ্রাসন ও দখলদারি দেখেছেন, তাঁরা হিটলারী-জাপানী প্যাক্টের দিকে নজর রাখুন। গোটা জগৎ জুড়ে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতি আজ বিপন্ন। ....পৃথিবীর এই প্রান্তেই যে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠুক না কেন, আমাদের মধ্যে তার অনুরণন অনুভব করি। মানবতার পবিত্রতম অধিকারগুলো রক্ষা করার জন্যে এটা সেই একই যুদ্ধ,—যা শুরু হয়ে গেছে। আসুন, ভাইয়ের মতো ভাইয়ের হাতে হাত মেলাই।"[৩২]

রামকৃষ্ণমিশন রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ধর্ম মহাসভার (un parlement des Religions) আয়োজন করেছিলেন, সেটি অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল পরের বছরের প্রথম দিকে। তাতে যোগ দেবার জন্যেও

রলাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁর যাওয়া সম্ভব হবে না, এই কথা জানিয়ে তিনি এক মাস আগে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সুইস ডাক বিভাগ থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁদের মেলভ্যানে আগুন লাগায়, ভারতবর্ষের সমস্ত ডাকের সঙ্গে তাঁর চিঠিও পুড়ে গেছে। রলাঁ তাই চিঠি না-পৌঁছোনোর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে কমিটির সভাপতি স্বামী অখন্ডানন্দকে আবার চিঠি লিখলেন:

> এ কখনো সন্দেহ করবেন না যে, আমার-ভাবনা-চিন্তা আপনাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। ধর্ম মহাসভাকে আমার সৌভ্রাত্রোচিত নমস্কার জানাবেন। মানব-আত্মার সমস্ত বৃহৎ শক্তি, বিশ্বজনীন জীবনে বিশ্বাসের প্রাণশক্তি এবং সমস্ত মানুষের জন্যে সক্রিয় প্রেমের শক্তির মধ্যে বোঝাপড়া ও গাঁটছড়া বাঁধার আকাঙ্ক্ষা, সারাজীবন আমার মতো আর কেউ করেনি। আমি আনন্দিত এইজন্যে যে, এখন সম্মেলন হতে চলেছে সমস্ত জীবন্ত সত্তার জন্যে *প্রেমের প্রভু* (maître de l'amour), আমাদের প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে।
>
> ধর্ম মহাসভায় যাঁরা যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের সকলকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, সামাজিক সেবার দিকে, মাটির মানুষের সাহায্যের দিকে তাঁদের প্রচেষ্টাকে আরও বেশি করে চালিতে করার। জগতের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পীড়িত ও বলিপ্রদত্ত জাতিগুলো এমন এক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে উঠছে, যা হয়ে উঠছে আরও বেশি দাসত্বকামী ও আরও অনেক বেশি নিষ্ঠুর। আসুন, সামাজিক সুবিচারের আবির্ভাবের (l'avènement de la justice sociale) কাজে লাগি! *আমাদের স্থান হতে হবে যারা দরিদ্র, যারা খেটে খায়; আর যারা কষ্ট পায়,— তাদের পাশে।*[৩৩]

বারো

১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে রম্যাঁ রলাঁর সত্তর বছর পূর্ণ হলো। পারীতে লা ম্যুত্যুয়ালিতে-য় এক বিশাল জনসভায় পালিত হয়েছিল জন্মোৎসব। যাঁরা ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লিয়ঁ ব্লুম, পল লাঁজভ্যাঁ, ইলিয়া এরহেনবুর্গ, হাইনরিশ মান, মার্সেল কাশ্যাঁ প্রভৃতি। উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ল্যুই আরাগঁ লিখলেন: "পারী কাউকে নিয়ে এমন উৎসব করেনি, উ্যগোকে নিয়েও নয়।"[১]

জানুয়ারি মাসেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় মস্কো-মামলা। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন রাদেক, পিয়াতাকভ, সোকোলনিকভ প্রভৃতি। রাদেকের সঙ্গে রলাঁর যতোটুকু পরিচয় ঘটেছিল, তাতেই তাঁকে বাচাল, অবিবেচক, অহম্মন্য মনে হয়েছিল। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, দ্বিতীয় মামলাও শেষ মামলা হবে না, ষড়যন্ত্রের মূল আরও গভীরে। জানুয়ারি মাসেই স্তালিন ও কালিনিনকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থেই তাঁদের যেন প্রাণদন্ড না-দেওয়া হয়।[২] বুখারিনকেও তখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁর জন্যে পরে আবার আবেদন করেছিলেন স্তালিনের কাছে (১৮ মার্চ)। ওদিকে স্পেনের লড়াই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, জার্মান বোমারু বিমান প্রকাশ্য দিবালোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল স্পেনের গুয়ের্নিকা (২৬ এপ্রিল)। রলাঁ প্রকাশ্যে ধিক্কার দিলেন "হস্তক্ষেপ না-করার নীতিকে"। এবং তারই মধ্যে লিখে শেষ করলেন তাঁর *বেঠোফেন*-এর তৃতীয় খণ্ড ল্য শাঁ দ্য লা রেজ্যুরেকসিয়ঁ (পুনর্জীবনের গান), সংকলন গ্রন্থ *কঁপাঞ্ঞ দ্য রুৎ* (পথের সাথীরা)।

কালিদাস নাগ হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে। জুন মাসে সেখান থেকে রলাঁকে চিঠিতে জানালেন, তিনি উপলব্ধি করছেন বিশ্বমানসিকতার (l'esprit mondial) এক বিস্ময়কর ঐকতান। জাপানী-চীনারা সেখানে আমেরিকান ও পলিনেশীয়দের সঙ্গে সৌভ্রাত্রভরে মেলামেশা করছে। রলাঁর বইগুলো, বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বইগুলো, উপন্যাসগুলো, বেঠোফেন ইত্যাদি হনলুলুর বইয়ের দোকানে মেলে। হনলুলু সিম্‌ফনির পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রিৎস হার্ট তাঁর এক গোঁড়া

সমর্থক।[৩] জেনিভার শ্রীমতী হোরাপ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন (১৩ জুন) তিন জন ভারতীয়কে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মেটাকে। মতাদর্শগত সহমর্মিতার চেয়ে তাঁদের মধ্যে কৌতূহলই ছিল বেশি। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের যন্ত্র হওয়াই সম্ভব, নয়তো কুসুম-কুসুম-গরমপন্থী। কথাবার্তায় প্রকাশ পেলো তাঁরা দক্ষিণপন্থী, ভারতের মুক্তি দেখার খুব তাড়া নেই তাঁদের। সেই জুন মাসেই ২০ তারিখে মাদলেন রলাঁর বাড়িতে এলেন আবার জাঁ-এরবের তাঁর সঙ্গিনী কুমারী রেমঁকে নিয়ে, এবার সঙ্গে মিস ম্যাকলাউড নেই। দুপুরে খেয়েদেয়ে তাঁরা বিকেলটা সেখানেই কাটালেন।[৪]

জাঁ-এরবের তিন মাস ভারতে কাটিয়ে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। তিনি কলকাতায় ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়েছিলেন, যা দিয়ে শেষ হয়েছে রামকৃষ্ণ-জন্মবার্ষিকী। তিনি পন্ডিচেরিতে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি অরবিন্দের আশ্রমে ছিলেন এবং তাঁর মোহে পড়েছেন (et il en a subi la fascination)। তাঁদের আলাপচারি লিপিবদ্ধ করার আগেই রলাঁ মন্তব্য করেছেন: "আমি বলতে পারছি না যে তিনি আমার মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পারলেন।" রলাঁ আলাপচারির বিবরণ দিয়েছেন:

> বছরে তিন দিন ছাড়া, অরবিন্দ ঘোষ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে অদৃশ্য থাকেন, তিন দিন মাত্র তিনি "দর্শন" দেন। তখন ফুলের মালায় সাজানো সিংহাসনে বসে নিজেকে সর্বসমক্ষে দেখান (s'exhibe); —এবং তাঁর প্রত্যেক শিষ্য ও দর্শকের জন্যে বরাদ্দ এক মিনিট—মাত্র একটি মিনিট, তাঁরা সাষ্টাঙ্গে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। জাঁ- এরবের তাঁর দৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতা, গভীরতা ও সৌন্দর্যের কথা বললেন: কোনো মানুষের এমন দৃষ্টি তিনি নাকি দেখেননি।
>
> ইংরেজী বা অন্য যে-কোনো ভাষার মতোই অরবিন্দ চমৎকার ফরাসী বলেন। সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে, নিঃসন্দেহে, তিনিই সবচেয়ে সর্বব্যাপী (encyclopédique) সংস্কৃতির অধিকারী। আজ তাঁর আশ্রমে ১০০ থেকে ১২০ জন শিষ্য, আশ্রম বেড়েই চলেছে, তার মধ্যে পাঁচ ছয় কি সাতটা বাড়ি। অরবিন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি

হচ্ছে, প্রত্যেককে মনঃসংযোগ করতে হবে এবং নিজের পথ খুঁজে পেতে হবে; এইভাবে নিজের বিকাশের নিজের নিয়মটি খুঁজে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে হবে, আর পৃথক প্রয়োজন অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে,—সন্ন্যাসী থাকবেন. আসবাবপত্রহীন একটি ছোট্ট ঘরে; যিনি বিদগ্ধ পরিশীলিত, আমাদের বন্ধু সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়, থাকবেন আরামদায়ক কয়েকটা ঘর নিয়ে; তিনি তো পুরো তলাটা জুড়ে থাকেন এবং এমন কি সেখানে এক এক রাতে আলাদা আলাদা ঘরে তাঁর ঘুমোনোর বাতিকটাও (sa manie de coucher) মেটাতে পারেন।

তাঁদের সঙ্গে অরবিন্দ আদান-প্রদান করেন চিঠি ও তাঁর স্ত্রী "শ্রীমার" মাধ্যমে; জাঁ-এরবের তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও প্রভাবেরও মুগ্ধ প্রশংসা করলেন। (তিনি ফরাসী ইহুদি, কিন্তু দীর্ঘ দিন মুসলিম প্রাচ্যে ছিলেন বলে মনে হয়। সবাই জানে অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগে তিনি পল রিশারের স্ত্রী ছিলেন, আর এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, তিনি অরবিন্দের উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে থাকবেন।) এর সঙ্গে যোগ করা যাক, গোটা আশ্রমেরই বিশ্বাস যে, অদৃশ্য থেকেও, অরবিন্দ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের উপরে ক্রিয়া করেন। জাঁ-এরবের এই রহস্যজনক ক্রিয়া অনুভব করতেও বাদ পড়েননি: দিলীপকুমার রায়ের একটি ইংরেজী কবিতা ফরাসীতে তিনি অনুবাদ করতে গিয়েছিলেন, এবং তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, তাঁর কোনো রকম কাব্যবোধ নেই, তিনি চিঠির মাধ্যমে অরবিন্দের কাছে আবেদন করেছিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা (puissances magiques) ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়েছিল, কলমের এক খোঁচাতেই তিনি অনুবাদটা করে ফেলেছিলেন।

অরবিন্দের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বহুদূরে ছড়িয়েছে। আজ তাঁকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনে করা হয়,—ধর্মমহাসভার সভাপতি তাঁকেই হতে বলা হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জাঁ-এরবের ভারতবর্ষ থেকে অনেকগুলো পুস্তিকা এনেছেন, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছাপিয়েও দিয়েছেন। তার একটি অরবিন্দের চিন্তা সম্পর্কে (অন্যটি "শ্রীমার")। এই

চিন্তা নিঃসন্দেহে মহৎ শিল্পীর ও বিরাট মনের। কিন্তু তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: সংশ্লেষ,—(সমস্ত যোগ, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত অধিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সংশ্লেষ)—অস্পষ্টই রয়ে গেছে (reste vague); এবং কোনো লেখাতেই তা যথাযথ স্পষ্ট হয়নি (aucun ouvrage ne la précise)। '*আর্য*' পত্রিকায় (১৯১৪ থেকে ১৯১৭সালের মধ্যে) তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখাগুলোর পর, ও অতি-সাম্প্রতিক *গীতার* ভাষ্য বাদে, তিনি বড়ো কোনো গবেষণা-প্রস্তাব (traité) লেখেননি: *তিনি সুন্দর, জ্যোতির্ময়, বিরোধাভাসের (antithèses) উপরে স্বেচ্ছাবিহারী ও সুমন্বিতভাবে ভারসাম্য রাখার চিন্তা নিয়েই তুষ্ট আছেন*। কিন্তু জ্যোতি কদাচিৎ আলোকিত করে। মেনে নেওয়া গেল যে, বিশেষ করে এর মূল্য আছে কুলীন মনের (d'esprits d'élite) এক সম্প্রদায়ের মুক্ত, বৃহৎ ও সর্বজনীন বিকাশের উদ্দীপন হিশেবে (comme stimulant)! কিন্তু তার কৃতিত্ব স্বীকার করে নিলেও, তাঁর আভিজাত্যবাদকে ক্ষমা করা রলাঁর পক্ষে কষ্টকর (j'ai peine à lui pardoner son aristocratisme)। ওটা একটা বড়ো লোকদের (pour riches) আশ্রম। আমাদের দুঃখদুর্দশা ও নিপীড়ন হ্রাস করার বেদনাদায়ক সংগ্রামের যুগে প্রচন্ড স্বার্থপরের মতো তিনি আয়েশ-করা (capitonné) আশ্রমে নিজেকে আটকে রেখেছেন, যাতে সেখানেই তিনি নির্বিবাদে তাঁর বিকাশের সম্পূর্ণতার অনুসন্ধান করতে পারেন। জাঁ-এরবের নিঃসন্দেহে সেদিন অরবিন্দ সম্পর্কে লিখতে রলাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, যেমনটির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এপ্রিল মাসের সাক্ষাৎকারে। রলাঁ স্পষ্টই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন: "আধুনিক ভারতবর্ষের মহান চিন্তাবিদদের সম্পর্কে আমার বইগুলোর পরে অন্য কারুর সর্ম্পকে আমাকে লিখতে অনুরোধ করে লাভ নেই, *আমি বাংলাদেশের দীনদরিদ্র (Poveretto) রামকৃষ্ণেই থেমে থাকব*।"[৫]

জাঁ-এরবের রলাঁকে জানিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ-জন্মশতবর্ষের উৎসবে গান্ধীজি আসেননি, তিনি তাঁর দুই মূল শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের একজন কালেলকর। রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কে তিনি রলাঁকে আরও জানান যে, মিশন সর্বত্র সামাজিক কর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবাকর্মীদের মাধ্যমে। বেলুড়ের নতুন প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শেষ শিষ্যদের একজন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং একান্তে থাকেন।

ভারতবর্ষ থেকে এসে জাঁ-এরবের ও কুমারী রেমঁ গিয়েছিলেন স্ট্রাটফোর্ড অব্ আভনে "বিবেকানন্দের বান্ধবী" মিস ম্যাকলাউডের বাড়িতে। সেখানে নিবেদিতার বোনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল। তাঁরা নিবেদিতার একটা দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন: ভারতবর্ষে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিক। ১৯১০ সালের আগে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি অনেক প্রবন্ধে তিনি অরবিন্দের নাম সই করেছেন, বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে অরবিন্দ তখন লুকিয়ে থাকতেন, পুলিশ তাঁকে খুঁজে খুঁজে বেড়াত। নিবেদিতার এইসব কাজকর্ম লোকচক্ষুর গোচরে আসুক তাতে মিস ম্যাকলাউড খুব গদগদ হয়েছেন বলে বোঝা যায়নি। এ নিয়ে কুমারী রেমঁ আরও পড়াশোনা করতে চাইছেন।—রলাঁর মতে, গান্ধী যে-ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের হাল ধরেছেন, যা তার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত মুখবন্ধ ছিল, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের সেই বিরাট আন্দোলনের সঙ্গে অকালে পরলোকগত বিবেকানন্দের সম্পর্কের বন্ধনটি, নিবেদিতার মাধ্যমে, ধরতে পারা যাবে। [পরিশিষ্ট দেখুন]

জাঁ-এরবের বর্তমান ভারতবর্ষের অন্যতম অধিবিদ্যাবিদ দক্ষিণের রমণ মহর্ষির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছেন। তিনি মূলগতভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী; বেদান্তের গভীরতম জ্ঞানের মুখপাত্র; উপনিষদের গুরুদের সর্বশেষ। অরবিন্দ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন এবং তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে "শ্রীমা" জাঁ-এরবেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন।[৬]

কয়েকদিন পরেই জাঁ-এরবের রলাঁকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে সুইট্জারল্যান্ডে বেদান্তবাদ সম্পর্কিত যে নতুন পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন তার প্রথমেই তিনি রামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা "*জীবই শিব*" রচনাটি ছাপতে চান। সেইসঙ্গে এই অনুরোধও করলেন যে, তিনি রচনাটির একটি বাক্য বাদ দিতে চান, যে-বাক্যটিতে রলাঁ রোমান-চার্চের নির্লজ্জতার নিন্দা করেছেন,—যে-রোমান-চার্চ খোলাখুলিই বলে যে ঈশ্বর আছেন প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গেই, অবশ্য যদি সে শক্তি চার্চের ভোগ-করা সুবিধাগুলোকে গণ্য করে। রলাঁ তাঁকে উত্তরে লিখলেন (২৯ জুন):

> ......নিশ্চয়ই আমার একটি প্রবন্ধ যে আপনার পত্রিকায় ব্যবহার করা হবে তাতে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি চাইব না যে, এটাকে

"প্রয়োজন মাফিক কাটছাঁট" করে (ad usum Delphini) কাজে লাগানো হোক। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার কথা মনে করুন: নিজের পথেই প্রতিটি মানুষকে বিকশিত হতে হবে। বেদান্তের প্রতি আমার বেশ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলেও তা আমার যথাযথ পথ নয়। তা হচ্ছে জাঁ-ক্রিস্‌তফের পথ, যা ভন্ডামি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইতে ছোটে। সেই মনই, বয়সের সঙ্গে, নিজেকে সপ্রমাণ করেছে।—রোমের মোহান্তরা, যাঁরা তাঁদের পবিত্র গদি সুদৃঢ় করতে শয়তানের সঙ্গেও কারবার করবেন, (তাঁরা তা বলেছেন!), তাঁদের ছাড় দিতে আমাকে তাই অনুরোধ করবেন না।—আমি যা পারি, তা হচ্ছে, এই কথা লিখে অন্যান্য চার্চ সম্পর্কেও আমার ধিক্‌কারকে প্রসারিত করতে: —"*ইতিহাসের গতি পথে, বহু বহু ক্ষেত্রে, অতীতে ও বর্তমানে চার্চগুলোর নেতাদের নিয়ম ছিল ও নিয়ম আছে, যে-ক্ষমতা বিজয়ী হবে, সেই ক্ষমতার পাশে গিয়ে তারা ভিড়বে, যদি সেই ক্ষমতা শুধু তাদের চার্চের সুবিধাগুলোকে ছাড় দেয়। এইভাবেই ক্ষমতার কায়েম-করা অন্যায় অবিচারের সঙ্গে তারা নিজেদের যুক্ত করে।*"[৭]

সুদীর্ঘ পনেরো বছর রলাঁ স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। জীবনের শেষ প্রান্তে সিদ্ধান্ত করলেন ফ্রান্সে ফিরে যাবেন, সেই জন্যে উত্তরাঞ্চলের ভেজলেয় একটি বাড়ি কিনলেন। আর সেই উপলক্ষে ফ্রান্সে যেতে হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে, ফিরতে অক্টোবর মাস হয়ে গেল। ফিরে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠানো *কালচারাল হেরিটেজ অব্ ইন্ডিয়া*-র দুটি খন্ড পেয়ে খুবই প্রীত হলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন স্বামী অবিনাশানন্দকে।[৮] এদিকে জাঁ-এরবের মিস ম্যাকলাউডের অর্থানুকূল্যে অসাধারণ সক্রিয়তায় এবং আবেগদীপ্ত উৎসাহে তাঁর বিবেকানন্দের রচনাবলির অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের বাণী পশ্চিমে ছড়িয়ে চলেছেন (গ্রন্থস্বত্ব তাঁরই থাকে এমন ব্যবস্থাও মিস ম্যাকলাউড করে দিয়েছিলেন)। জেনিভায় *পাঁসে এ অ্যাক্‌শিয়ঁ* পত্রিকার সহযোগী হবার জন্যে শার্ল বোদুয়্যাঁর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন।

অক্টোবরেই রলাঁর কাছে খবর এলো, কলকাতায় জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনাবসান হয়েছে। রলাঁ একটি মাত্র বাক্যে তাঁর মন্তব্য লিখে রাখলেন: "তাঁর (জগদীশচন্দ্রের) মধ্যে অনির্বাণ জীবনের (de vie inextinguible)

এমন এক শিখা জ্বলত যে মৃত্যু তাঁকে দেখা দিতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না।"[৯]

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যে নিজেকে অত্যধিক ক্লান্ত করে গান্ধী কলকাতায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সদ্য অসুখ-থেকে-ওঠা রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। তাঁকে চেয়ারে করে তুলতে হয়েছিল। তখন গান্ধী প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনার সময় অপেক্ষা করে, নিজেও প্রার্থনা করে রবীন্দ্রনাথ চলে এসেছিলেন। বৃত্তান্তটি জানা গেল *হরিজন* পত্রিকার ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে এও জানা গেল: অসুখের সময় রবীন্দ্রনাথ, যখন প্রায় মৃত্যুর মুখে, অস্ফুট স্বরে একটি পুরনো গান আওড়াতেন, রীতি অনুসারে গানটি গাওয়া হতো পিয়র্সনের মৃত্যুবার্ষিকীতে। "সে এক আশার গান, যে-আশা ব্যর্থতার মুখে দাঁড়িয়ে হাসে," যে-আশা বিশ্বাস করে "সকল অপরিপক্ক বৃত্তি", "সকল অনিশ্চিত লক্ষ্য" সমগ্রতার উপলব্ধিতে এসে মেশে,—এমন কি ব্যর্থতাগুলোও কুমোরের প্রয়োজনীয় মাটির অংশ হয়ে ওঠে, যার হাতের পাক খেয়ে জলপাত্র (cruche) গড়ে উঠেছে।—ব্রাউনিং এইভাবেই গেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি রূপান্তরিত করেছেন করুণ কোমলতায়:

> "*জীবনে যত পূজা হল না সারা/জানি হে জানি তাও হয়নি হারা/*
> *যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে/যে নদী মরুপথে হারাল ধারা/*
> *জানি হে জানি তাও হয়নি হারা......*"

এই গানটি গাওয়ার পরই তিনি তুলি আনতে বলেছিলেন যাতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। ডাক্তাররা আঁতকে উঠেছিলেন: তাঁর দরকার পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু তাঁর বাসনাকে বাধা দেওয়া গেল না। রং তুলি আনা হলো। আর, তিনি আঁকলেন "এক জ্যোতি, ঘন ও অন্ধকার গাছের সারি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে স্পষ্ট দুর্দমনীয়,—যেন জীবন জয় করছে মৃত্যুকে"। এই অপূর্ব বৃত্তান্তটি রলাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর বোন মাদলেন। পরদিনই রলাঁ চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনানথকে (৫ ডিসেম্বর)।[১০]

রলাঁ কতোদিন চিঠি লেখেননি রবীন্দ্রনাথকে! ১৯৩২ সালের ২৪ অগাস্টে দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর শোকে সান্ত্বনা পাঠাবার পর,[১১](১৯০৫ সালের নভেম্বরের চিঠিটি ছিল একেবারেই কেজো,) আবার অন্তরঙ্গ চিঠি লিখলেন

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরের ব্যবধান।[১২] চিঠিতে প্রথমে উদ্বিগ্ন কুশল জিজ্ঞাসা করলেন হরিজন-এর প্রতিবেদন উল্লেখ করে। তারপরেই লিখলেন: "......ভয় দেখানো অন্ধকারে এই যে হতভাগ্য জগৎ ঢাকা পড়েছে, আশা করব, তার কাছে আপনার জীবন্ত আলোক (votre lumière vivante) অক্ষুণ্ণ থাকবে বহুকাল ধরে।"

স্বাধীনতা ও অধিকারের পবিত্র সংগ্রামে নিয়োজিত *ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন*-এর বুলেটিনের মাথায় রবীন্দ্রনাথের নামটি রলাঁর নিয়মিত চোখে পড়ে। রলাঁ জানালেন ইউরোপে তিনিও একাই যে-লড়াই করে চলেছেন, তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, কারণ শত্রুদের চক্রটি অতি হিংস্র, তারা বাঁধন আরও শক্ত করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্রান্সের শ্রমজীবী মানুষদের—মজুর- কৃষকদের সামাজিক ও নৈতিক জাগরণ তাঁর কাছে আনন্দ ও বিরাট আশার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স তার শক্তির ঐক্য সম্পর্কে,—নিখিল-মানবতার ঐক্য সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠেছে। রলাঁ আশা করবেন, তার এক শক্তিমান পথপ্রদর্শকের আর্বিভাব হবে—জোরেসের মতো, এবং মহান কবির আবির্ভাব হবে—ভিক্তর উ্যগোর মতো,—অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো।

এরপর রলাঁ নিজের সাহিত্যকর্মের কথা উল্লেখ করে লিখলেন: স্ত্রী ও বোনের প্রীতিস্নিগ্ধ তত্ত্বাবধানে ভগ্ন স্বাস্থ্যেও তিনি লিখেছেন *বেঠোফেন*-এর ৩য় খণ্ড *বিপ্লবের থিয়েটার* নামে ১৯০২ সালে *দাঁতঁ* নাটক দিয়ে যা শুরু হয়েছিল সেই ধারার সর্বশেষ নাটক *রবেসপিয়ের* রচনায় হাত তিনি দিয়েছেন।[১৩] মস্কো-মামলা দুটি তাঁকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছিল, দিব্যদৃষ্টিতে তিনি বিপ্লবের ইতিহাসের চক্রাবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে তাঁর অমরসৃষ্টি *রবেসপিয়ের*। তার কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন: "আমি নতুন নাটক লিখছি.......*রবেসপিয়ের*। যা আমার নাট্য-পিরামিডের ভগ্নচূড়া (le faîte birsé)। লিখতে গিয়ে কতোই না আবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের সময়ের ট্রাজিক সমস্যাগুলো।"

তারপরেই তিনি উল্লেখ করেছেন "জীবনে যত পূজার" গানটির। প্রশ্ন করেছেন, কোথায় কোন বইতে আছে গানটি? গানটি তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। রলাঁ যদি জানতেন, তাঁর চিঠিটি লেখার ২০ দিন পরে খ্রিষ্টের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ লিখবেন:

" নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস/
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—/
বিদায় নেবার আগে তাই/ডাক দিয়ে যাই/ দানবের
সাথে যারা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।/ !"

সেদিনকার চিঠিতে পুনশ্চ দিয়ে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে আরও জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা সুইট্‌জারল্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছেন সামনের বছরে। এখানে তাঁর মন আর যথেষ্ট স্বাধীন বলে মনে করে না। বুর্‌গোঞের প্রাচীন ভেজলে-র টিলার উপরে বাড়ি কিনেছেন, যেখানে সেন্ট বার্নার্ড দ্বিতীয় ক্রুজেডের প্রচার চালিয়েছিলেন। সেখানে আছে ফ্রান্সের সবচেয়ে সুন্দর রোমান-গথিক ক্যাথেড্রালগুলোর একটি।

১৯৩৮ সালের মার্চে শুরু হলো তৃতীয় দফায় মস্কো-মামলা। রলাঁর আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এবার অভিযুক্ত হলেন: বুখারিন, ইয়াগোদা, রকোভ্‌স্কি এবং তাঁদের সঙ্গে ডাঃ লেভিন, ডাঃ প্লেৎনেভ। পপুলার ফ্রন্টের পতন আসন্ন হয়ে উঠেছিল জানুয়ারিতেই। মার্চে লেয়ঁ ব্লুম দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করলেও তার পতন আসন্ন। স্পেনে জার্মান-ইতালীয় সহযোগিতায় ফ্যাসিস্ট বাহিনী মাদ্রিদের একেবারে দরজায়। ১৩ মার্চ অস্ট্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে নিল জার্মানি।

মার্চ মাসেরই ৩০ তারিখে জাঁ-এরবের ও তাঁর তরুণী পত্নী (তিনি সদ্য বিয়ে করেছেন লিজেল রেমোঁকে) এসে হাজির হলেন মাদলেন রলাঁর বাড়িতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। গত বছরে এপ্রিলে পারীতে সরবনের রামকৃষ্ণ-স্মরণ সভায় জাঁ-এরবের স্বামী যতীশ্বরানন্দকে বলেছিলেন, ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো যোগ্য প্রচারক পাঠাতে রামকৃষ্ণমিশনকে অনুরোধ করতে। মিশন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে পাঠিয়েছিলেন মিস ম্যাকলাউডের সুপারিশে।[১৪] অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আমেরিকায় প্রচার কার্য করেছিলেন। ফ্রান্সে তিনিই প্রথম মিশনের মনোনীত প্রতিনিধি, যদিও রলাঁ নিজে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ফ্রান্সে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ পাকাপাকি থাকবেন এবং বেদান্ত-কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। রলাঁর মতে, এ পর্যন্ত ভারতীয়দের লাতিন দেশগুলো

সম্পর্কে একটা বিরুদ্ধ-সংস্কার (un préjugé contre) ছিল, তারা শুধু এ্যাংলো-স্যাকসন দেশগুলোর সঙ্গেই সম্পর্ক রেখেছিল। তিনি তাদের সে ত্রুটি শুধরে দিয়েছেন। মিশন কর্তৃপক্ষের যে চিঠিতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তাতে সুস্পষ্ট লেখা হয়েছে:

> আমরা বিশেষ ভাবে খুশী যে আমন্ত্রণ পেয়ে আপনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন। তাকে আমরা ভালো বাসতে শিখেছি শুধু এমন এক দেশ বলে নয়, যার সংস্কৃতিতে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার কোনো কোনো সুন্দরতম উপাদান ও গুণ দেখা যাচ্ছে; তাকে ভালোবাসতে শিখেছি জীবন ও ধর্মের ধারণা সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-ভাবনার সেই মহান ব্যাখ্যাতা মঁ. রম্যাঁ রলাঁর স্বদেশ বলেও।[১৫]

ছ'মাস হলো স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ পারীতে এসেছেন। এরই মধ্যে তিনি ফ্রান্সের সেই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মূল্য বুঝতে পেরেছেন, যা অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে যুক্তিবাদের মিলন ঘটায়। ফ্রান্সের প্রতি তিনি প্রীতিভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। ফ্রান্সে আসার আগে তিনি ফরাসী জানতেন না, ছ'মাসে কিছুটা বলতে শিখেছেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ এসেছিলেন গত বছর জুলাই মাসে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেদান্ত আন্দোলনের শুভার্থী মহীশূরের সুব্রাহ্মণ্য আয়ার। তিনি এসেছিলেন সেই বছরে পারীতে অনুষ্ঠিত দর্শন-কংগ্রেসে যোগ দিতে। সেই কংগ্রেসে স্বামী যতীশ্বরানন্দের সঙ্গে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ পরিচিত হয়েছিলেন সরবনের ভারতীয় সভ্যতা-ভবনের অধ্যাপক ফুশে এবং অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে।[১৬]

আমেরিকায় স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ধনগোপালই সর্বপ্রথম রলাঁর কাছে রামকৃষ্ণকে উদ্‌ঘাটিত (a revélé) করেছিলেন। রলাঁ তাঁকে মহৎ শিল্পী (grand artiste) বলেছেন। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তাঁর খুঁটিনাটি তথ্য রলাঁকে জানালেন। তিনি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন, তাঁকে মানসিক হাসপাতালেও রাখা হয়েছিল। সন্ন্যাসী হবার, নির্জনতায় দিনযাপন করার আবেগদীপ্ত বাসনার এবং বিয়ে করে মার্কিন জীবনযাত্রায় কাল-কাটানোর মধ্যে দিয়ে তিনি এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। দুটোর মধ্যে সমন্বয় করতে পারছিলেন না। মৃত্যুর পরদিনও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তাঁর চিঠি পেয়েছেন। স্বামী

অশোকানন্দ আপসহীন কঠোরতায় (rigorisme intrnasigeant) রলাঁকে ধনগোপাল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরানন্দ তাঁর সম্পর্কে কথা বললেন অনেক বেশি প্রীতিপূর্ণ উপলব্ধির (compréhension affecteuse)সঙ্গে। উদগ্র কল্পনা যখন সত্যকে তাঁর কাছে বিকৃত করেছে, এমনকি তখনো ধনগোপাল আন্তরিক থেকেছেন। রলাঁর মনে হয়েছিল, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ মহৎ মানবিক বোধের মানুষ (l'homme d'une grande humanité), যে মানবিক বোধ বৃহৎ, সহিষ্ণু, উপলব্ধিক্ষম,—কখনোই কাউকে ধর্মান্তরিত করতে অভিলাষী নয়, কিন্তু নিজের আত্মিক প্রবণতা অনুসারে,—রামকৃষ্ণের খাঁটি মর্মানুসারে, সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করতে প্রত্যেককে চালিত করে। তিনি রামকৃষ্ণের মহান শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য, গুরুর প্রত্যক্ষ উদ্দীপন-ক্ষমতা (souffules) তিনিই শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন—এবং অনেক কাহিনী বলে গিয়েছেন। তাদের কিছু কিছু স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ রলাঁদের শোনালেন।[১৬]

জাঁ-এরবের দম্পতি আবার নতুন করে ভারতবর্ষে চলেছেন, সেখানে চারমাস থাকবেন। ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে একখানি বই লেখার জন্যে শ্রীমতী এরবের সেখানে সূত্র খুঁজবেন এবং দলিল-পত্র সংগ্রহ করবেন।

ইউরোপ তখন অগ্নিগর্ভ। চেকোশ্লাভাকিয়ায় জার্মান, পোল, হাঙ্গেরীয়, শ্লোভাকরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জন্যে সংখ্যালঘু-স্বায়ত্ত শাসন চাইছে। ফ্রান্সে ব্ল্যুম্ মন্ত্রীসভার পতনের পর গঠিত হয়েছে দালাদিয়ে-র নেতৃত্বে তৃতীয় মন্ত্রীসভা (১০ এপ্রিল)। ক্যান্টনে ফরাসী হাঁসপাতালে বোমাবর্ষণ করল জাপানীরা। সেপ্টেম্বরে নুরেমবার্গে হিটলার সুদেতেনের জার্মানদের অছিগিরি দাবি করলেন। হেনলাইন দাবি জানালেন সুদেতেনের রাইখের অন্তর্ভুক্তি। ২০ সেপ্টেম্বর মিউনিখ-চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলিদান করা হলো। ফ্রান্সে জার্মান রাষ্ট্রদূতের হত্যায় জার্মানি-অস্ট্রিয়ায় ইহুদিবিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ উঠল। জার্মান ইহুদিদের উপরে ধার্য হলো দশ কোটি মার্ক জরিমানা।

রলাঁরা মে মাসে চলে এসেছিলেন ভেজলেয়, মাঝে মাঝে অবশ্য ভিলন্যভে যেতে হয়েছে। মাদলেন রলাঁ তখনো সেখানে। পারীতে পা-রাখার জায়গা (terre-à-pied) ছিল ৮৯, বুলভার মঁপারনাসে। গোটা ১৯৩৮ সাল রলাঁ ১৯৩৫ সালে লেখা মস্কোর দিনলিপিতে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন মস্কো-

মামলাগুলোর বিচারে তাঁরপরিচিত মানুষগুলোর বিবৃতি, স্বীকৃতি, কার্যকারণের যোগসূত্র; তিনি কতোটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, কতোটা ঠিক বুঝেছিলেন বা ভুল বুঝেছিলেন। প্রতিদিনের ঘটনা চরিত্র সম্পর্কে টীকাটিপ্পনি জুড়ে শেষ করলেন *মস্কোর দিনলিপি*-র পরিপূরক অংশ।[১৭] আর সেই ডিসেম্বরেই শেষ করলেন তাঁর বিপ্লবের নাট্য ধারার সর্বশেষ নাটক *রবেসপিয়ের*। বিপ্লবের নাট্যধারা শুরু হয়েছিল *দ্রেফ্যুস* আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর মধ্যে, শেষ হলো আর এক বিপ্লবের সংকট কালের রক্তাক্ত পর্বের পটভূমিকায়।[১৮]

জেনিভা থেকে ডিসেম্বরেই আবার এসে হাজির হলেন জাঁ-এরবের দম্পতি যথারীতি মাদলেন রলাঁর বাড়িতে। নভেম্বরে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবার তাঁরা যাচ্ছেন আর কয়েকদিন পরেই। নিবেদিতা সংক্রান্ত কাজটির জন্যে তাঁরা দু'জনেই খাটছেন; তাঁর যে শ'খানেক চিঠি ও দলিলপত্র, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও অন্যদেশের মহাফেজখানায় খুঁজে পেয়েছেন, তাদের মূল্য অপরিসীম, নিবেদিতার চরিত্রের উপরে তারা নতুন আলোকপাত করবে। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই বড়ো হয়ে উঠেছে। এটি শুধু আর বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপার নয়; বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম সারিতে যে স্থান নিয়েছিলেন তার ব্যাপার। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অরবিন্দ ঘোষ ও তিলকের পাশে দাঁড়িয়ে, (অবশ্যই আড়ালে থেকে) তিনি লড়াই করেছেন, প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন। ইংরেজ পুলিশ তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি প্রায়ই ইংল্যান্ডে এসেছেন, সেখানে বিরোধী দলকে ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সম্পর্ক ছিল কেইর হার্ডির সঙ্গে। তাঁর মধ্যে ছিল আইরিশ রক্তের অগ্নিশিখা, আর তা থেকেই তিনি তাঁর বিপ্লবী আবেগকে ভারতবর্ষের খাতে বইয়ে দিয়েছেন।

তাঁর প্রবল বুদ্ধিমত্তা তাঁকে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় সহযোগীও করে তুলেছিল। নিবেদিতাই এই প্রতিভাধর পন্ডিতের প্রথম গ্রন্থগুলো সংস্কার করে দিয়েছিলেন, তখন তিনি লেখার কায়দায় (l'art d'écrire) ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন না। নিবেদিতা জানতেন কী করে

অর্থ সাহায্য আনতে হয়, যা তাঁর কলকাতার বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলেছিল। কৃতজ্ঞতা জানাতে জগদীশচন্দ্র তাই অলিন্দে নিবেদিতার আবক্ষ মূর্তি বসিয়েছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন ক্লান্তিহীন চিঠি-লিখিয়ে; আর তাঁর এই "রোগটির" কল্যাণেই ভারতবর্ষে তাঁর গোটা যুগটার ছবিই আমাদের জন্যে আঁকা হয়ে গেছে।

এই ছবিই আবার জীবন্ত করে তুলতে গিয়ে আনন্দিত এরবের-দম্পতি আমাদের বললেন: একই বিষয়ে তাঁদের যে পৃথক পৃথক দুটি খসড়া করতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।—একটি, সম্পূর্ণ, যা দীর্ঘকাল না-ছেপে রেখে দিতে হবে; অন্যটি, অনেক সংযত।[১৯]

একটি ট্র্যাজিক ব্যাপার নিবেদিতার জীবনের শেষ বছরটি বেদনামণ্ডিত করেছিল। বিবেকানন্দের বান্ধবী শ্রীমতী ওল বুল অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে নিবেদিতা তাঁকে প্রাচীন আর্য়ুবেদের ওষুধ ধরিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সবসময়ই তার ব্যবহার হয়, ফলও দেয়। তিন দিন পরে, ওল বুল মারা যান। আর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিবেদিতাকে দিয়ে যান। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সম্পত্তি হাতিয়েছেন বলে নিবেদিতার বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন এই অভিযোগ করতে ছাড়েনি যে, তিনিই শ্রীমতী বুলকে মেরে ফেলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত ভয়ংকর ভাবে জেগে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আর এই শোকে ও এই অপবাদে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল।[২০]

কিন্তু রলাঁর প্রশ্ন,—যদিও প্রশ্নটি তিনি প্রকাশ্যে রাখেন নি, নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন:—নিবেদিতা কী করে সম্পত্তি নিতে পেরেছিলেন? তাঁকে একথা বলা বৃথা যে, নিবেদিতা নিয়েছিলেন নিজের জন্যে নয়, এবং তা দিয়ে পুরোপুরি ভারতবর্ষেরই উপকার করেছেন, বিশেষ করে করেছেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান মন্দিরকে,—তিনি তাঁর বিশ্রাম-অবসর, তাঁর সম্মান ভারতবর্ষের স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছেন,—*তিনি তা কিছুতেই মানবেন না। সিজারের পত্নীকে,—বিবেকানন্দের মহীয়সী শিষ্যাকে সন্দেহভাজন হলে চলবে না। বিবেকানন্দ কখনো তার অনুমতি দিতেন না।*[২১]

তেরো

১৯৩৯ সালটি মানুষের ইতিহাসে চরমতম দুর্ভাগ্যের বছর। জানুয়ারি মাসেই স্পেনের বার্সেলোনার পতন ঘটে গেল। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ফেব্রুয়ারির শেষেই ফরাসী সরকার মেনে নিল ফাংকোর ফ্যাসিস্ট সরকারকে। মাদ্রিদের যুদ্ধেও পরাজিত হল প্রজাতন্ত্রীরা।

অক্‌সফোর্ডে অধ্যাপনারত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সম্পাদিত গান্ধীর জন্মবার্ষিকী সংকলনে লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে রলাঁ লিখলেন: *পশ্চিমের একটি মানুষের গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা*। তাতে শুরুতেই বললেন: "গান্ধী শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই জাতীয় ইতিহাসের এক নায়ক নন, যাঁর পুরাণ-কল্প স্মৃতি হাজার বছরের মহাকাব্যের অর্ন্তভুক্ত হয়ে থাকবে.....পশ্চিমের প্রতিটি জাতির জন্যেই ভুলে-যাওয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা-করা খ্রিষ্টের বাণীকে তিনি নতুন করে তুলে ধরেছেন।" কিন্তু তবুও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতিতে "*আমরা গান্ধীর মতবাদকে সুপারিশ বা প্রয়োগ করতে পারি না, তার সম্পর্কে আমাদের যতো শ্রদ্ধাই থাকুক না কেন।*"[১]

মার্চ মাসের পনেরো তারিখ চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করল জার্মানি, ভেরমাখ্‌ট ঢুকল প্রাহায়। রলাঁ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন: "প্রাহা, তুমি কাঁদো! তোমাকেও কাঁদতে হবে, জার্মানি। কারণ, তোমার নামে লেখা হয়ে গেছে অনেক দেনা, আগামী কাল যা তোমাকে শুধতে হবে।"[২] মিউনিখ চুক্তির চারদিন পরে (৪ অক্টোবর ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "প্রায়শ্চিত্ত !"[৩]

> "যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ/কল্যাণশক্তির/ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত/পূর্ণ করিয়া শেষে/নূতন জীবন নূতন আলোকে/জাগিবে নূতন দেশে।"

মিউনিক চুক্তির নিন্দা করে গান্ধীজি আগেই লিখেছিলেন: "আট দিনের বেশি পৃথিবীতে বাঁচার জন্যে ইউরোপ তার আত্মাকে বিক্রি করেছে। মিউনিখ ইউরোপে যে শান্তি লাভ করেছে তা হিংসারই জয়। আর সেটা তার পরাজয়ও।" গান্ধী বলেছিলেন: "জাতীয় সম্মান রক্ষায় চেকরা যেমন অস্ত্রের,

তেমন যদি অহিংসার ব্যবহার জানতো তাহলে জার্মানি ও ইতালির মিলিত অহিংসার সমস্ত শক্তির মুখোমুখি হতে পারত।''—তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তথাকথিত শান্তিবাদীরা যাদের নেতা ছিলেন ফেলিসিয়াঁ শালাইয়ে।[৪] তিনি লিখেছিলেন: ''......চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ তথ্যই গান্ধী জানেন না।......গান্ধী দেখতে পাচ্ছেন না যে চুক্তির ফলে ''সেই যুদ্ধটি'' অসম্ভব করে তোলা হলো, জার্মানির বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ বাধাতে চাইছিল সোভিয়েত রাশিয়া বা ফ্রান্স।'' কিন্তু জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করায় রলাঁ বিদ্রূপ করে লিখলেন: ''.......একমাত্র জার্মানিই শালাইয়ের সস্নেহ উদ্বেগের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।.....আর জার্মানি সদ্য সদ্য তাঁর মুখে এক প্রচন্ড থাপ্‌পড় মেরেছে।''

অবশেষে বজ্রাঘাতের মতো নেমে এলো অবিশ্বাস্য সংবাদ—মস্কো-বের্লিন অনাক্রমণ চুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে কম্যুনিস্টদের উপরে সরকারী দমননীতি শুরু হয়ে গেল। এই চুক্তিতে মর্মান্তিক ভাবে আহত হলেন রলাঁ, কিন্তু জোলিও কুরিদের মতো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলেন।[৫] জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করল ১ সেপ্টেম্বর। যে-জার্মান বিমানবহরটি বছরটি স্পেনের গুয়েনির্কা গুড়িয়ে দিয়েছিল দু'বছর আগে, সেই একই বহর এবারে গুঁড়িয়ে দিল ওয়ারশ শহর।[৬] ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল ফ্রান্স (বিকেল ৫টা), ব্রিটেন তার ঘন্টা কয়েক আগে (১১টা ১৫ মি.)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বাহ্ণেই গণতন্ত্র ও ফ্রান্সের স্বার্থে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রলাঁ চিঠি দিয়েছিলেন দালাদিয়েকে। গোটা শীতকাল ধরে চলল ''যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা'' ম্যাজিনো আর জিগ্‌ফ্রিড লাইন বরাবর।

রলাঁ স্থান নিলেন ভেজলের নির্জন গৃহকোণে। শুধু প্রয়োজনে (ডাক্তারের পরামর্শ নিতে) আসতেন পারীতে। বন্ধুবান্ধব ছত্রভঙ্গ,— কেউ লড়াইতে, কেউ কেউ বিদেশে, কেউ বা আত্মগোপন করেছেন। রলাঁর কলম কিন্তু থেমে রইল না। ১৯২৪-১৯২৬ সালে তিনি লিখতে শুরু করছিলেন তাঁর আন্তর্জীবনের কাহিনী, এবারে সেটি সম্পূর্ণ করতে চাইলেন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে। সেবার গোটা ইউরোপে শীত পড়েছিল প্রচন্ড, শূন্যের ১৩ ডিগ্রি নীচে। ভেজলেয় বিদ্যুৎ নেই, কয়লার অভাব। নিজে, স্ত্রী ও অতিবৃদ্ধা শাশুড়ি নিয়ে সংসার, দির্জঁ থেকে বোন মাদলেন আসেন। এই সময়েই

রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন রলাঁকে নাতনির বিয়ের সংবাদ জানিয়ে।[৭]

সেই চিঠির উত্তরে রলাঁ লিখেছিলেন (২৭ ফেব্রুয়ারি): বোন মাদলেন থাকাকালীনই তাঁরা শুভ সংবাদটি পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই আনন্দিত এবং শুভকামনা জানাচ্ছেন। অনেক দিন তিনি চিঠি লিখতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব অম্লান আছে, তাঁর চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিত্যউপস্থিতি। ভেজলের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখলেন: প্রাচীন শহরের মধ্যযুগের পুরোনো প্রাচীরের উপরে চৌরাস্তার মোড়ের মাথায় তাঁর বাড়িটা। বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখতে পান সূর্য ওঠে, দূরে বেঁটে-পাহাড়ের ওপারে ডুবে যায়। যুদ্ধ চারপাশে ঘনিয়ে তুলেছে নিঃসঙ্গতা, যোগাযোগ কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে শীতকালে। সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন মাইল দশেক দূরে। একটা গাড়ি রাখতে হয়েছে, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ টিকে আছে শুধু রেডিওর কল্যাণে। কোনো কাগজে কিছু লেখা যুদ্ধের জন্যে নিষিদ্ধ। তবু তিনি লিখে চলেছেন গত শতাব্দীর স্মৃতিকথা,—যৌবনের দিনগুলোর কথা, ১৯০০ সালের আগেকার সংগ্রামের কথা। সর্বশেষ লিখলেন: "আশা করব আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে, কাব্যের পবিত্র শিখায় আপনার দিন ও রাত্রি স্নান করছে। *অন্ধ হিংসা এবং মিথ্যায় আত্মসমর্পণ করা এক জগতে, আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নিজেদের মধ্যে, সত্য ও শান্তিকে।*"

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ১০ এপ্রিল। কুশল জিজ্ঞাসা এবং কুশল প্রার্থনার পর নাতনির বিয়ের পরবর্তী খবরাখবর দেওয়ার পর এন্ড্রুজের মৃত্যুর শোচনীয় খবরটি জানিয়েছিলেন: "তাঁর না-থাকায় যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা ভাবাটাই কঠিন। তিনি সর্বসময় থাকতেন নিজের আদর্শের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে; তিনি আমার প্রত্যক্ষ প্রিয় বন্ধুরও বেশি ছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন আমি কী হারালাম।"[৮]

চিঠিটি রলাঁর ঠিকানায় পৌঁছোয়নি। ১৪, গ্রাঁদ রু, ভেজলে (ইয়োন), ফ্রান্স ঠিকানা লেখা সত্ত্বেও সেটি ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের ছাপমারা অবস্থায়। চিঠি খুলে আবার যে মুখ আঁটা হয়েছিল তার "সামরিক নিয়ন্ত্রণের" ছাপও মারা আছে। চিঠিটি না-পেলেও রলাঁ কিন্তু এন্ড্রুজের মৃত্যুর খবর জেনেছিলেন ঠিক সেই সময়েই। খবরের সূত্রটি জানা যায় না। এপ্রিল

১৯৪০ তারিখ দিয়ে দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন মৃত্যুর খবরটি। তাঁর ঘরে টাঙানো থাকত দক্ষিণ আফ্রিকায় তোলা পিয়র্সনের সঙ্গে এন্ড্রুজের একটি ফোটো। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি দিন লিপিতে লিখেছিলেন: "......ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগাযোগ-সূত্র। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, তাঁকে ভালোবেসেছি। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, আমার দুই চোখ তাঁর সুন্দর দুটি প্রীতিপূর্ণ চোখে সর্বশেষ প্রীতির নমস্কার জানাচ্ছে।........যারা জগতকে আলোকিত করেছে সেইসব বীর ও সন্তদের জগৎ সন্দেহ করে না। অন্তত *তাদের মৃত্যুর অনেক পরে ক্যাথলিক চার্চ তার নিজের লোকদের দাবি জানায়। কিন্তু সন্ত এন্ড্রুজ ও সন্ত পিয়র্সনের দাবি কে জানাবে?*"[৯]

মে মাসে জার্মানি হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করল। জুনের ৪-৫ তারিখে ডানকার্কে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার বিপন্ন ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের অপসারণ করা হলো। জার্মান-বাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ করল। রক্ষাব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, ১৪ জুন পারীতে ঢুকল জার্মান বাহিনী। সেই মাসেই আত্মসমর্পণের নামান্তরে সন্ধিচুক্তি হলো জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে। ফ্রান্স দু'ভাগ করা হলো: উত্তরাঞ্চল রইল জার্মানির দখলে, দক্ষিণাঞ্চল মার্শাল পেত্যাঁর নেতৃত্বে তাঁবেদার ভিশি সরকারের অধীনে।

১৯২৪-২৬ সালে রলাঁ যে অন্তর্জীবন কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলেন সেটি সম্পূর্ণ করলেন *পেরিপ্ল* নামে সর্বশেষ অধ্যায় যোগ করে।[১০] নির্মোহ দৃষ্টিতে সামাজিক কাজকর্ম বিচার করে তিনি লিখলেন: "*আমরা যে সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলাম, তাদের জন্যে কোনো দুঃখ নেই, এমন কি, দুঃখ নেই যদি তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে।*" তিনি অকপটে লিখলেন:

> ১৯৪০ সালের জুনের অভূতপূর্ব বিপর্যয়, এই যে প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গোচ্ছ্বাস—যাতে গোটা পশ্চিম জগৎ ঢেকে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের *মহামায়া*-র (la grande illusion) চরম পর্ব সমাপ্ত। আমি উঠেছি কর্মের চক্রাবর্ত থেকে। বিশ্বজগতের শুরুতে এমন হবে, এটাই তো সম্ভব। ফাউস্ট বলেছিল:
> "*শুরুতে হচ্ছে কর্ম।*"
> কিন্তু উপসংহারে তা নয়। আমাদের প্রার্থনাটি নতুন করে পড়া হোক:
> "*তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক*! (Fiat voluntas!)......."[১১]

তিনি আরও লিখলেন: "পরাজয়ের সেই জঘন্য দিনগুলোয় আমার ভেজলের চত্বর থেকে যখনই দেখতে পেয়েছি, রৌদ্রালোকে ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে সৈন্যবাহিনী ছুটছে, তখনই আমি......বুঝেছি। এবং সেটাই আমার সর্বশেষ *প্রোজ্জ্বল উপলব্ধি*........যে মানুষগুলো পালাচ্ছে, যে মানুষগুলো তাদের তাড়া করছে, তারা এই মর্ত্যলোকের চেয়ে অন্যরকম শক্তিমান "ফুরহার"-এর নিমিত্ত মাত্র। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ, হত্যাকান্ড, উন্মত্ত প্রলাপের ঊর্ধ্বে ভবিতব্যের সার্বভৌম হস্ত এবং তার মহৎ নিয়মাবলি মানবতাকে তার পরিণামের দিকে চালিত করছে। তাতে কী বিশৃঙ্খলা! তাতে কী ঝাঁকুনি!......কিন্তু চক্রনেমি অটুট আছে। আর মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রথ চলেছে তার গতিপথে, সেই একই নিয়মে, যা বিশ্বজগতকে শাসন করে।"[১২]

১৯১৪ সালের মার্ণের যুদ্ধের পূর্বাহ্ণেই পশ্চিমের সৌধ গুঁড়িয়ে যেতে দেখে রলাঁ মনে করেছিলেন, তারই সঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে সমস্ত সভ্যতা। কিন্তু তিনি অন্যদের মতো তবুও সভ্যতাকে একটি কি দুটি জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেননি, জড়িয়েছেন ইউরোপের ভাগ্যের সঙ্গে। তারপর তিনি নতুন মহাদেশের—এশিয়ার, আমেরিকার সন্ধান পেয়েছেন। *মাটির চেহারা পালটায়, আত্মা একই থাকে, পৃথক বর্ণের চামড়ার নীচে একই লাল রক্ত বয়ে চলে*। প্রাচীন আলেকজান্ডারদের আমল থেকে সাম্প্রতিক বণিক রাজদের কাল পর্যন্ত রাজ্যাভিযানের মধ্যে দিয়ে জাতিতে জাতিতে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। ইউরোপের বিজ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম এশিয়ার ভ্রূণকে পুষ্ট করেছে। হিন্দু ভারতীয় ও বৌদ্ধ জাপানী কবির গানে তিনি খ্রিষ্টের সুর শুনতে পেয়েছেন। *কার্ল মার্কস ও তলস্তয়ের সামাজিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে ইউরোপ জগতের দূরতম প্রান্তেও অনুপ্রবেশ করেছে*। "*তকমাধারী বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্য করছেন মঁসিয় বার্ট্রান্ড রাসেল। ভারতীয় বিশ্বজ্ঞানী* (cyclopédiste) রামমোহন রায়ের সর্বজনীন চিন্তার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে এই পৃথিবীর মনের সমস্ত সারবস্তুর সংশ্লেষ বহু-বিস্তারিত করে চলেছেন। সমস্ত শিল্প, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত মহাদেশের চিন্তার সমস্ত রূপ,—একই সঙ্গে সহস্র বনস্পতি, প্রাণরসের এক উন্মাদনায়,—জড়াজড়ি করে আছে তাদের শাখাপ্রশাখায়।"[১৩] অবশেষে রলাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণী:

মিছে ভয় করব না। দেবতাদের বিরুদ্ধে দৈত্যদের লড়াই (gigantomachie), জাতিতে জাতিতে বিপুল সংঘর্ষ—যার মধ্যে সম্প্রতি মানুষ-পিঁপড়েরা নিজেদের নিক্ষেপ করেছে,—বিজ্ঞ ভবিতব্যের নিমিত্তগুলো, একাধিক জাতি-রাজাকে (peuple-roi) সিংহাসনচ্যুত করবে। কিন্তু সিংহাসন মোটেই শূন্য থাকবে না, এবং মনের রাজকীয় ধারা বজায় থাকবেই। রাজার মৃত্যু হয়েছে। রাজা দীর্ঘজীবী হোন! মানুষ-রাজা (homme-roi) *তাঁর সম্পূর্ণ রাজা অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এবং তাকে বাড়িয়েই যাবেন।*[১৪]

এ কথাগুলো রলাঁ লিখেছিলেন ১৯৪০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর; আর তার আট মাস পরেই ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে রলাঁর ভারততীর্থ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আশ্বাসবাণী:

আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। *মনুষ্যত্বের অন্তহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি পাপ মনে করি।*[১৫]

প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়ে সহস্রগুণ বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকার দিনগুলোতে রমাঁ্যা রলাঁ পীড়িত বিষণ্ণ ও ব্যথিত হলেও মানুষের সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কল্পনায় বিলাপ করেননি। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের হিংস্র দংষ্ট্রাকরাল ভয়াবহ রূপের মুখোমুখি তিনি ছিলেন কার্যত একা, মনও ছিল অপরিণত, একদেশদর্শী। ক্রমে তাঁর পরিচয় ঘটেছে ভারতবর্ষের সঙ্গে, বৃহত্তর এশিয়ার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সর্বশেষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে শুনেছেন মহদ্বাণী: "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"; দেখেছেন ত্রিশ কোটি মানুষের অহিংস বিপ্লবের দুর্জয় অভিযান; বিশ্বাস করেছেন—"*জীবই শিব*", মানুষের মধ্যেই আছে দেবত্ব। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় প্রথম পর্বেই স্বদেশের বিপর্যয়েও তাঁর জগৎ ও জীবনের মহাজাগতিক বিশ্বাসে চিড় ধরেনি। তাই রমাঁ্যা রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের শেষ ঘোষণাবাণীতে এতো মিল। মিল বিবেকানন্দের সঙ্গে যিনি

বলেছিলেন: "*আমি প্রমাণ করতে রাজি আছি যে সমগ্র ভারতে মানবের পূর্ণতা বিষয়ে একটা নিত্য বিশ্বাস আছে এবং আমি নিজেও তা বিশ্বাস করি।*"[১৬]

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে। যুদ্ধ বাধার আগে এবং যুদ্ধ চলার সময়ে স্বামীজি বেদান্ত প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন ফ্রান্সে এবং সুইট্‌জারল্যান্ডে। গোটা সেপ্টেম্বর মাস তিনি সুইট্‌জারল্যান্ডেই বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। জনৈকা ফরাসী মহিলা তাঁকে ৩০ হাজার ফ্রাঁ দেন আর একজন প্রচারক নিয়ে আসতে।[১৭] উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানোর সবচেয়ে উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন মিস ম্যাকলাউড। যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির মতো তিনি প্রচারকদের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন, প্রচারকরা ছিলেন যেন তাঁর সৈন্যদল। পারী থেকে (অক্টোবর ১৯৩৭) তিনি শ্রীমতী কুককে লিখেছিলেন: "পারীতে এখন 'এস' (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ) —আমার কাছে এক নতুন চুম্বক। তাঁকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি, তাঁর আসার পেছনে দায়িত্ব আমারই।"[১৮] যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে মিস ম্যাকলাউড পশ্চিমকে বেছে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দের বাণীপ্রচারের ক্ষেত্র হিশেবে। ১৯১৪ সালের ৬ মার্চ আলবের্তাকে তিনি লিখেছিলেন: "আমি যুদ্ধ-বাধা এলাকায়, ভারতে বা ইউরোপে যেতে চাইনে; স্বামীজি বলেছিলেন: "আমার কাজ বেশি হবে পশ্চিমে; সেখান থেকে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে ভারতে।"[১৯] যুদ্ধের ঠিক আগে তিনি এসেছিলেন পারীতে, সেখান থেকে ইংল্যান্ডে,তারপর আবার আমেরিকায়; সেখানে স্বামী নিখিলানন্দ বিপুল উদ্যমে কাজ করে চলেছেন, স্বামী বিজয়ানন্দ আসছেন আর্জেন্টিনা থেকে, স্বামী যতীশ্বরানন্দ সুইডেন থেকে। কিন্তু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর আশঙ্কা ও উদ্বেগ ছিল। যুদ্ধ বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচারে বাধা সৃষ্টি করছিল।

১৯৪০ সালের অক্টোবরে ইংল্যান্ড থেকে স্বামী অব্যক্তানন্দ তার করে জানিয়েছিলেন: "কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। কেন্দ্রের সদস্যরা ছত্রভঙ্গ!" চার মাস পরে (৭ ফেব্রুয়ারি) মিস ম্যাকলাউড মার্গারেট উইলসনকে লিখছেন: "আমার অতি বড়ো বন্ধু শ্রীমতী দ্রিনেৎ ভেরদিয়ে পারীতে চোদ্দ মাস থেকে ফিরেছেন, *নিয়ে এসেছেন পেত্যাঁ সম্পর্কে শ্রদ্ধা, তা আমাদের সকলের বিশ্বাস জন্মিয়েছে। তিনি স্বামীজির ভক্ত বলেই মানুষ দেখলে তার মহত্ত্ব*

বুঝতে পারেন। তিনি আমেরিকায় চার মাস থাকবেন, ফরাসী যুদ্ধবন্দীদের সাহায্যের চেষ্টার জন্যে।"[২০] ক'দিন পরেই (৭ ফেব্রুয়ারি) তিনি আবার শ্রীমতী দ্রিনেৎকে লিখছেন. "আমার মনে হয় না ভিকির (?) সব কিছু খুব খারাপ, *কারণ লাভাল যা চান তাতে পেতঁ্যা বাধা দিচ্ছেন, হিটলারের চাপ সত্ত্বেও.....*"সেই মাসেরই ২৫ তারিখে আলবের্তাকে লিখছেন: "*দ্রিনেৎ ভের্দিয়েকে আমি প্রেসিডেন্টের মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম—ফ্রান্স উপবাস করছে এবং পেতঁ্যা যে কী মহৎ ও চমৎকার লোক—সেকথা বলাতে*।"[২১]

একথা অনুমান করতে বাধা নেই যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেদান্তপ্রচার-কার্য বাধাগ্রস্ত হওয়ায় অন্তত চেষ্টা চলছিল "মহৎ ও চমৎকার" মার্শাল পেতঁ্যার ভিশি এলাকায় প্রচারের বাধা দূর করার। পারীর বেদান্তকেন্দ্র সম্ভবত জার্মান অধিকৃত পারী ছেড়ে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই দক্ষিণের ফরাসী এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, রলাঁর সঙ্গে ফ্রান্সে যুদ্ধকালে বেদান্তকেন্দ্র বা প্রচারের কোনো যোগই ছিল না, আদৌ ছিল কি না সে প্রশ্নও সম্ভবত অবান্তর নয়।

১৯৪১ সালের জুন মাসে রলাঁ এসেছিলেন পারীতে কয়েকদিনের জন্যে তাঁর মঁপারনাসের পুরনো বাসায়, নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তার দেখাতে। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। রলাঁর প্রতিবেশী ছিলেন পাশের নতর-দাম্-দে-শাঁ-র জাঁ-এরবেরেব বাবা। জাঁ-এরবের বাবাকে দেখতে এসেছিলেন, কাঠখড় পুড়িয়ে ছাড়পত্র জোগাড় করে, দক্ষিণাঞ্চল থেকে। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর তিনি এলেন রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে (১৫ জুন)। সস্ত্রীক জাঁ-এরবেবের সঙ্গে রলাঁর শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে, ঠিক আড়াই বছর আগে। তাঁর এবারও আলোচনা হলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বইপত্রের সম্পাদনা সম্পর্কে। এই আড়াই বছরে এ নিয়ে কখনো কোনো সূত্রে কারুর সঙ্গে তাঁর আলোচনার তথ্যই মেলে না। জাঁ-এরবের বইপত্র সম্পাদনা করছিলেন, প্রকাশিত হচ্ছিল মিস ম্যাকলাউডের অর্থানুকূল্যে। রলাঁ জাঁ-এরবেরের মুখেই শুনলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ শঙ্কর সম্পর্কে মঁপেলিয়ে, তুলুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিচ্ছেন, বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী তা শুনে চলেছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন বহু পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরাও। তাঁরা লোভীর মতো ভারতীয় ধ্যানের পদ্ধতিগুলো অনুধাবন

করছেন (qui étudient avidement les méthodes)। তাঁর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে রলাঁ মন্তব্য লিখেছেন: "তরুণ অধিবিদ্যাবিদরা সবচেয়ে বিমূর্ত এই তত্ত্ববিদ্যায় (dans cette ontology la plus abstraite) ঝাঁপ দিয়েছে। আমার বইগুলো এখন তাদের কাছে খুবই কাঁচা ঠেকে (trop simplet)। দশ বছর আগে এগুলো তাদের কাছে খুবই দুর্বোধ্য (obscure) ঠেকত, এদের কথা তারা শুনতেই চাইত না।"[২২]

জাঁ-এরবেরের মুখেই রলাঁ শুনলেন, শ্রীমতী এরবের তাঁর নিবেদিতা সংক্রান্ত বইটি লিখে শেষ করেছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সমস্ত বিরাট আন্দোলনই (tout grand movement de révolte) এর মধ্যে ধরা পড়েছে এবং স্পষ্ট হয়েছে। ওকাকুরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও এতে আছে।[২৩] জাঁ-এরবের রামকৃষ্ণের চিন্তার সবচেয়ে সম্পূর্ণ একখানি সংকলন প্রস্তুত করেছেন, এবং তিনি তাদের সেই দেশি কাঁচা রঙটাও (verdeur native) ফিরিয়ে এনেছেন, যা তাঁর শিষ্যরা সংকোচভরে ঢাকা দিয়ে রাখেন।

জাঁ-এরবেরের সঙ্গে পারীতে এই সাক্ষাতের পর রলাঁর কোনো পত্রে, দিন-লিপিতে বা অন্য কোনো প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সাক্ষাৎকারের এক সপ্তাহের মধ্যেই (২২ জুন) জার্মানি আক্রমণ করল সোভিয়েত রাশিয়াকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরিত্রেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। জার্মান দখলদারি ফ্রান্সে আরও কঠিন আরও নির্মম হয়ে উঠল। ভগ্নস্বাস্থ্য নির্বান্ধব রলাঁ পুরোপুরি নিজেকে ভেজলেয় গৃহবন্দী করে রাখলেন। অথবা গৃহবন্দী হতে বাধ্য হলেন। এতোদিন সর্বান্তঃকরণে শুধুই কামনা করতেন, জার্মানি পরাজিত হোক; এবারে তিনি আশ্বস্ত হলেন, প্রকাশক র‍্যানো আরকসকে ইঙ্গিতে লিখলেন: "এখন আমার খুবই আশা।" সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন প্রজন্মকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর অটুট বিশ্বাস, হিটলার স্তালিনের কাছ থেকে যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবে। তিনি মন দিলেন বেঠোফেন-সিরিজ শেষ করতে। যৌবনের বন্ধু পেগ্যীর জীবনকাহিনী লিখলেন দুই খণ্ডে। লিখতে লিখতে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দখলদার জার্মানরা তাঁকে উত্যক্ত করেনি, যতোটা করত ফরাসী সরকার। তারা সাহায্য করতেই চাইত। খাদ্যাভাব, কয়লা

ও বিদ্যুতের অভাব, জলের অভাব সত্ত্বেও রলাঁ কোনো সাহায্য নেননি। জার্মানরা কাটছাঁট করে জাঁ-ক্রিস্তফ ছাপতে চেয়েছিল, কিন্তু রলাঁ রাজী হননি। ভিশি সরকার অবশ্য *জাঁ-ক্রিস্তফ*-এর ছাত্র-সংস্করণ আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এরই মধ্যে সংবাদ পেলেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর। তাঁর অনুরোধে ৩১ অগাস্ট সুইট্জারল্যান্ড থেকে এদমঁ প্রিভা শোকবার্তা পাঠালেন ঠাকুর পরিবারের বন্ধুদের।[২৫]

অদম্য উৎসাহে, অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে "বিবেকানন্দের বান্ধবী" মিস ম্যাকলাউড কিন্তু আমেরিকা থেকে অর্থানুকূল্যে পরিচালনা করে চলেছেন মিশনের প্রচারকদের। আমেরিকা-ভারত-ইউরোপে তাঁর পরিচিতির পরিধি ছিল বিশাল। তাঁর পরিচয় ছিল চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে, আইনস্টাইনের সঙ্গে, মাদাম ত্রৎস্কি, তাতিয়ানা তলস্তয়, রোমের প্রিনসেস পিচ্চোলোমিনি এবং কাভালেত্তি, পারীর এমা কালভের সঙ্গে। ঔপন্যাসিক গলসওয়ার্দি, কবি ইয়েটসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল; প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, বানার্ড শ'র সঙ্গে হাস্য-পরিহাসের সম্পর্ক ছিল; জার্মান নৃত্যশিল্পী মার্গারেট ভালমান, প্রেসিডেন্ট উইলসনের বড়ো মেয়ে মার্গারেট উইলসন (নিষ্ঠা)[২৬] ছিলেন তাঁর শিষ্যকল্পা। স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভনে "হল্স-ক্রফট"-এ অতিথি হতেন সস্ত্রীক বার্নাড শ, স্যর ফ্রাংক বেনসন (অতিখ্যাত সেকস্পিয়রীয় অভিনেতা), লন্ডন থেকে আসতেন প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীমতী বলড্ুইন; অতিথি হতেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মা, গ্রীক লেখক নিকোস কাজান্তজাকিস, প্রিন্স অব্ ওয়েলস। মিস ম্যাকলাউডের পত্রালাপের ঘনিষ্ঠতা ছিল লর্ড লিটনের সঙ্গে, যুদ্ধের মধ্যেই লর্ড ওয়াভেলকে বিবেকানন্দের রচনাবলি পাঠাবার সাহস তাঁর ছিল। বিবেকানন্দের বাণী ছিল তাঁর কাছে প্রত্যাদেশের মতো এবং তার প্রচার করাটাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। জার্মানির সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের দশদিন পরেই (২ জুলাই) অখন্ড প্রত্যয়ে তিনি আলবের্তাকে ওয়াশিংটন থেকে লিখেছিলেন:

> গতকাল জেনেছি যে, ওয়াশিংটন ডি.সি.-র স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের ড. ক্লার্ক গত গ্রীষ্মে এখানে বলেছেন: রাশিয়ার মহান ব্যক্তিদের সন্ধান মিলবে এশীয় রাশিয়া—সাইবেরিয়ায়, যেখানে প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ জারদের এবং বলশেভিকদের আমলেও সমস্ত

> অসাধারণ ব্যক্তিদের পাঠানো হয়েছে। *এমন কি, যদি মস্কো ও স্তালিন জার্মানির কাছে হার মানে, প্রকৃত বিষয়টির সমাধান হবে এশীয়-রাশিয়ায়;—এই ভাবে সিদ্ধ হবে চল্লিশ বছর আগের স্বামীজির ভবিষ্যদ্বাণী:* যদি আমেরিকা অ-সাম্রাজ্যবাদের (non-imperialism) সমস্যার সমাধান না-করে, তাহলে সমাধান করবে রাশিয়া অথবা চীন: সমস্যার সমাধান করতেই হবে। দেখতেই পাচ্ছো, স্বামীজি মহান ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন বলেই, সময়ের বিপুল বিস্তারে, দেখতে পেয়েছিলেন, ভাবী জগদ্ব্যাপার এবং পরিবর্তন। তিনি সত্য দর্শন করেছিলেন, আমার কাছে, এটাই এক তৃপ্তি। এ আমাদের আজকের কর্তব্যকে লঘু করে না, তা বরং মীমাংসার আরও সুযোগ এনে দেয়...... আজ থেকে দু'দিন পর, ৪ জুলাই, বেলুড় মঠ কলেজের উদ্বোধন হবে এবং স্বামীজি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটা ১৫০০ বছর স্থায়ী হবে.... তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, রোম সাম্রাজ্য যেমন খ্রিষ্ট ধর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তেমনি ছড়িয়ে দেবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, তাঁর সঙ্গে যোগ করেছিলেন "ভগবান ইংল্যান্ডকে আশীর্বাদ করুন"—এই আধ্যাত্মিক জগতেই আমি বেশির ভাগ সময় আছি, অন্য দিকে তোমরা আছো যুদ্ধের—বোমার মুখোমুখি......[২৭]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিঃসঙ্গ দিনগুলোতেই রলাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল সমপাঠী পল ক্লোদেলের (Paul Claudel) সঙ্গে। একোল নর্মাল-এ একদা তাঁরা ছিলেন বন্ধু, ক্লাস পালিয়ে ভাগনার শুনতে যেতেন। পরবর্তী জীবনে ক্লোদেল হয়েছিলেন বহুমানিত কবিখ্যাতির অধিকারী, গভীরবিশ্বাসী ক্যাথলিক, আর রলাঁ *জাঁ-ক্রিসতফ*-এর স্রষ্টা, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী, জাতিদ্রোহী অপবাদে নিন্দিত, প্রথাসিদ্ধ ক্যাথলিক চার্চের অননুগামী। মারি রলাঁ ক্যাথলিক চার্চের দিকে ঝুঁকেছিলেন, ক্লোদেলের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মান্তরিতও হন। ক্লোদেলের সঙ্গে রলাঁর যোগাযোগের মূলে ছিলেন মারীই। শুধু পারীর বাসাতেই নয়, ক্লোদেল ভেজলেয় নিয়মিত আসতেন।

রলাঁর উৎকণ্ঠ দৃষ্টি ছিল যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি জানতে পেরেছিলেন স্নেহাস্পদ "চন্দ্র বোস" (সুভাষচন্দ্র বসু)

বের্লিনে হিটলারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। পরের বছর নভেম্বরে ডি. এস. মাধব রাও-র সাক্ষরিত পত্রে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের অঙ্গীভূত হবার আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষে যুদ্ধের মোড় ঘুরল, দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিস্ট-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ শুরু হয়ে গেল। ভেজলের চারপাশের পাহাড়ে-জঙ্গলে আস্তানা-গাড়া "মাকিদের" সঙ্গে রলাঁর যোগাযোগ ঘটল।[২৮] মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনী নরমান্ডির উপকূলে অবতরণ করল।

১৯৪৪ সালের অগাস্টের শেষ দিকে পারীর অভ্যুত্থান ঘটল, পারী নিজেই মুক্ত হলো। রলাঁ ফরাসী গণত্রাণ সমিতির অন্যতম পরামর্শদাতা হতে সম্মতি দিলেন, নিয়েভ্র জেলার জাতীয় ফ্রন্টের পদ নিতেও স্বীকার করলেন। নভেম্বরে পারীর সোভিয়েত দূতাবাসে অক্টোবর বিপ্লববার্ষিকীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর উদ্বেগ বন্ধু রিশার-ব্লখের মস্কো থেকে ফেরার দেরি দেখে, জার্মানরা তাঁর কন্যা-জামাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে; আশঙ্কা তাঁদের ছেলে (মারীর প্রথম স্বামীর) সের্জেই কুদাশেভের জন্যে, সে গিয়েছিল মস্কোর প্রতিরক্ষায় অংশ নিতে।[২৯]

তারপরেই রলাঁ পুরোপুরি শয্যা নিলেন। নভেম্বরের শেষ দিকে ফিরলেন মরিশ তরেজ। শেষ শয্যা থেকেই তিনি চিঠি পাঠালেন: "…..আপনার ফিরে আসার জন্যে ফ্রান্স প্রতীক্ষায় ছিল।….পারীতে আপনার কণ্ঠস্বরের অভাব। যতোদিন পারী আপনার কণ্ঠস্বর শোনেনি, ততোদিন নিজেকে মুক্ত মনে করেনি।"[৩০] ঠিক একমাস পরে ৩০ ডিসেম্বর রম্যাঁ রলাঁ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

১৯৪৩ সালে রলাঁ তাঁর "শেষ ইচ্ছা" জানিয়ে লিখেছিলেন:

> যদিও আমি গির্জার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না, আমি সম্মতি দিয়ে গেলাম, আমার দেহ যেন ক্লামসির স্যাঁ-মার্ত্যা গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সেখানে সৎকারের কৃত্য করা হয়। *আমি মনে করি, এ করতে অস্বীকার করলে, আমি সেই সব মানুষের লজ্জার কারণ হবো, যাঁরা আমার বন্ধু ছিলেন; এবং যাঁরা আমার প্রিয় তাঁদের মনে ব্যথা দেব*। আমি তা চাই না। আমার শেষ ইচ্ছা ব্রেভ্-এর ছোট্ট সমাধিক্ষেত্রে, এক স্থায়ী স্বত্ব কেনা হবে, সেখানে আমার দেহ থাকবে,

এবং পরে তার পাশে থাকবে আমার স্ত্রীর দেহ.....[৩১]

তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারেই মরদেহ প্রথমে সমাধিস্থ করা হয় ক্লাম্সি-তে পরে স্থানান্তরিত করা হয় ১০ কি.মি. দূরে ব্রেভ্-এ।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রলাঁ নিয়মিত দিনলিপি লিখে গিয়েছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবলির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাতে ব্যক্ত করেছিলেন। অনুমান করতে বাধা নেই যে, বেঠোফেন ও পেগ্যীর জীবন কথা লিখতে লিখতে অবশ্যম্ভাবী প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কেও তাঁর সর্বশেষ উপলব্ধির কথাও দিনলিপিতে লিখে থাকবেন। কিন্তু কী লিখেছিলেন তা কেউ জানতে পারবে না, *যতোদিন না তাঁর দিনলিপি প্রকাশ করার সময়সীমা পার হয়।*[৩২]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশ্চিমী প্রচারক মিস ম্যাকলাউডের তিন মহাদেশে অবিশ্রান্ত যাওয়া-আসার এক পর্বে সাক্ষাৎ হয়েছিল রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে। উৎসাহে উদ্দীপনায়, আন্তরিকতায় তিনি শুধু রলাঁর প্রীতি ও সম্ভ্রমই অর্জন করেননি, বহুলাংশে তাঁর প্রণোদনের কারণও হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে রলাঁ যতো-না তথ্য পেয়েছিলেন, তার থেকে অনেক কিছু বেশি,—বহু রঙে-আঁকা বিবেকানন্দের বহুমাত্রিক চরিত্রটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে এমন অনর্গল বাক্য-বন্ধে, সর্বাঙ্গের ভাষা দিয়ে[৩৩], বিস্ময় মুগ্ধতা চরিতার্থতার এমন হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করা একমাত্র মিস ম্যাকলাউডের পক্ষেই সম্ভব ছিল। রলাঁর মনে তার ছাপ পড়েছিল, তিনি যে উপকৃত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শিল্পিত রামকৃষ্ণ রলাঁকে মুগ্ধ করেছিল, মিস ম্যাকলাউডের তাৎক্ষণিক স্মৃতিচারণার বিবেকানন্দ তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল। রলাঁ তাঁকে তুলনা করেছিলেন, মধু খেয়ে যারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে নবজন্মের পরাগ (le pollen régérateur) বয়ে নিয়ে যায়, সেই সব পতঙ্গের সঙ্গে। এর চেয়ে যোগ্য উপমান আর হয় না। দেশে-দেশান্তরে বিভিন্ন ভাষায়, বক্তৃতায়, ছাপার অক্ষরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ছড়িয়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র কৃত্য।

১৯৪৩ সালটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন এক সংকটের বছর। এর মধ্যেই মিস ম্যাকলাউড উৎসাহী হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার শিকাগোয় পদার্পণের পঞ্চাশ বছর পূর্তির উৎসবপালনে। আলবের্তাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন (৬ অক্টোবর): "মনে হয়, আমিই শেষ জীবিত মানুষ যে স্বামীজিকে জেনেছিল। এবার.....উৎসব পালন করা হবে প্রতিটি বেদান্ত-কেন্দ্রে; নিখিলানন্দ বলেছেন, তাঁর কেন্দ্রে আমাকে কিছু বলতে....."

বিবেকানন্দের বাণী প্রকাশের জন্যে তাঁর কী অখন্ড উৎসাহ! পরের বছর ১৯ জুন নিউইয়র্ক থেকে লিখছেন: "লেডি ওয়াভেল স্বামীজির স্ফটিক মূর্তি পেয়ে ইসাবেলকে চিঠি দিয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাকে জানিয়েছেন স্বামীজির চারখানি বই পাঠাবার জন্যে। পঁচাশি বছরে কাজে লাগা, এই সব সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়াটা সত্যিই একটা *মজার ব্যাপার* (a fun)।[৩৪].........আবার দেখা করেছি কাভাস ওয়েলসের সঙ্গে, জন্মসূত্রে ইংরেজ, দৃঢ়বিশ্বাস জন্মানোর মতো ক্ষমা আছে, এবং বাকপটু। তাঁকে আমার মোহিনী চ্যাটার্জির ১৮৮৮ সালের ভগবদ্গীতা এবং স্বামীজির দুটি বই পাঠিয়েছি, কারণ তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে চান! যদি তিনি সেটা ধর্মীয় (religious) না-করে তোলেন তাহলে তা ভারতবর্ষের ইতিহাস হবে না। হবে কি?" মিস ম্যাকলাউডের চারিত্রিক জীবন-কৌতুকের পরিচয়টি ধরা পড়বে বার্নার্ড শ'র চিঠির উত্তর প্রসঙ্গে। আলবের্তাকেই একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন:

> বার্নার্ড শ'র যখন অষ্টআশিতম জন্মদিন, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ তাঁর একটি ছবি ছাপা হয়েছিল, করাত দিয়ে কাঠ কাটছেন। আমি তাকে লিখলাম এই কথা বলে যে, আমরা দুজনেই আশির কোঠায়, তিনি খুব ব্যায়াম করছেন, আমি মোটেই করছি না। সঙ্গে সঙ্গে একটা পোস্টকার্ড এলো তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে: "আমার প্রিয় জোসেফিন, তোমার কথা শোনা যে কী সুন্দর! গত ১২ সেপ্টেম্বর আমি এক বিপত্নীক হয়েছি। তার সামান্য আগে আমরা, তোমার কথা বলাবলি করছিলাম, ভাবছিলাম তোমার কী হলো। তুমি এক বিশেষ বন্ধু ছিলে এবং আছো: আমরা সব সময়েই আশা করে থেকেছি আবার হলস-ক্রফটে হঠাৎ মিলব। কিন্তু এখন চোখের আড়াল হলেই ভালো। আমি বিচ্ছিরি রকমের বৃদ্ধ। জি. বার্নার্ডশ।"—অবশ্যই আমি তখন

> তখনই উত্তর দিলাম এই বলে যে, তাঁর নতুন জগতে আমাদের অনেক কিছু করার থাকবে। *তারপরেই আমি তাঁকে বললাম উইলকক্‌সের ইরিগেশান অব্ বেঙ্গল-এর*[৩৫] *কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।*"[৩৬]

রম্যাঁ রলাঁর অবদানের পরিমাপ করেছেন লুই র‍্যনু এই কটি কথায়: "রম্যাঁ রলাঁই অন্য যে-কোনো কারুর চেয়ে বেশি, পশ্চিমে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতবাদগুলো ছড়িয়ে দেবার কাজটি করেছেন। সেই মতবাদগুলো তিনি আবার বাঁধতে পেরেছিলেন প্রাচীন ভারতের মতবাদগুলোর সঙ্গে, যে প্রাচীন ভারত থেকেই তারা উদ্ভূত হয়েছে এবং, তাদের মধ্যে দিয়ে, ভারতীয় চিন্তাকে ভালোবাসিয়েছে। কিছুটা গীতিধর্মী এই রচনাগুলো,—যাদের সঙ্গে যোগ করা যায় সেই একই লেখকের গান্ধীর উপরে লেখাটিও,—রোমান্টিক ধারার রচনা। তাদের কল্যাণে, আমার মতে, রম্যাঁ রলাঁ সমকালীন ফরাসী লেখকদের সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক লেখক হিশেবে ভারতবর্ষে পরিচিত হতে পেরেছেন। যাই হোক না কেন, এটাই দাঁড়ায় যে তিনিই, আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোর ভিত্তির উপরে, *ভারতবর্ষ ও ফ্রান্সের মধ্যে সৌহার্দের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে সেরা কারিগর।*"[৩৭]

মিস ম্যাকলাউডের,—বিবেকানন্দের "জো"-র, ছিল ভক্তি ও কর্মের সাধনা। ভক্তি তাঁকে পরিচালিত করেছিল নিরলস নিরবচ্ছিন্ন কর্মযোগের পথে। "*বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর জগতের কেন্দ্র; দীর্ঘায়ু জীবনে তিনি গোটা পৃথিবী ঘুরেছেন, যেন তাঁর পূজার বিগ্রহের পরিক্রমা করেছেন। জগতটাকে যতোটা নিজের করেছেন, ততোটাই করেছেন বিবেকানন্দের।*"[৩৮]

রম্যাঁ রলাঁর ভারত-তীর্থযাত্রার পথে বহুদূর পর্যন্ত মিস ম্যাকলাউডকে অন্যতম সঙ্গিনীর মর্যাদা না-দিলে অবিচার করা হবে। কিন্তু ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের পর রলাঁর সঙ্গে তাঁর আর সাক্ষাৎ হয়নি; কোনো প্রসঙ্গেই রলাঁর দিনলিপিতে তাঁর কিংবা তাঁর লেখা অবিশ্রান্ত চিঠির কোনো একটিতে রলাঁর উল্লেখমাত্র নেই। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার !

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে, রম্যাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণকে "আমার শিয়রের ঠাকুর" (Le saint de mom chevet.) ঘোষণা করলেও মৃত্যুকালে , আক্ষরিক অর্থে, তাঁর শিয়রের ঠাকুর যিনি ছিলেন তিনি রামকৃষ্ণ নন, তিনি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।[৩৯]

***